

চোখের বালি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

২ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট । কলিকাতা

৭ : বৈশাখ ১৩৫৮ - কার্তিক ১৩৬২

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬২

১৩১০, ১৩১৩, ১৩১৭, ১৩২৭, ১৩৩০

মাঘ ১৩৪৪, চৈত্র ১৩৪১

সংস্করণ : চৈত্র ১৩৫৪

পুনরুৎপাদন : আষাঢ় ১৩৫৮

শেষ ১৩৬১

প্রকাশক ত্রিপুরাশ্রমবিহারী সেন
দিবসভারতী । ৬৩ বারকানাথ ঠাকুর লেন । কলিকাতা ৭

মুদ্রক শ্রীগোপালচন্দ্র বায়
মাসানা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ লিমিটেড
৪৭ গুপ্তচন্দ্র স্মারকলিপি । কলিকাতা ১৩

চোখের বালি

বিনোদিনীর মাতা হরিমতি মহেন্দ্রের মাতা রাজলক্ষীর কাছে আসিয়া ধন্না দিয়া পড়িল। দুইজনেই এক গ্রামের মেয়ে, বাল্যকালে একত্রে খেলা করিয়াছেন।

রাজলক্ষী মহেন্দ্রকে ধরিয়া পড়িলেন, “বাবা মহিন, গরিবের মেয়েটিকে উদ্ধার করিতে হইবে। শুনিয়াছি মেয়েটি বড়ো সুন্দরী, আবার মেনের কাছে পড়াশুনাও করিয়াছে— তোদের আজকালকার পছন্দের সঙ্গে মিলিবে।”

মহেন্দ্র কহিল, “মা, আজকালকার ছেলে তো আমি ছাড়াও আরও ঢের আছে।”

রাজলক্ষী। মহিন, ওই তোমর দোষ, তোমর কাছে বিয়ের কথাটি পাড়িবার জো নাই।

মহেন্দ্র। মা, ও কথাটা বাদ দিয়াও সংসারে কথার অভাব হয় না। অতএব ওটা মারাত্মক দোষ নয়।

মহেন্দ্র শৈশবেই দিহীন। মা সর্বদে তাহার ব্যবহার সাধারণ লোকের মতো ছিল না। বয়স প্রায় বাইশ হইল, এম-এ পাশ করিয়া ডাক্তারি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে; তবু মাকে লইয়া তাহার প্রতিদিন মান-অভিমান আদর-আবদারের অন্ত ছিল না। কাঙাল-গাংড়ের মতো মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াও মাতার বহির্গর্ভের থলিটির মধ্যে আবৃত থাকাই তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। মার সাহায্য ব্যতীত তাহার আহার-বিহার আরাম-বিরাম কিছুই সম্পন্ন হইবার জো ছিল না।

এবারে মা যখন বিনোদিনীর দৃষ্টি তাহাকে অভ্যস্ত ধরিয়া পড়িলেন তখন মহেন্দ্র বলিল, “দাদা, কতটা একবার দেখিয়া আসি।”

সেখানে মাইবার দিন বলিল, “দেখিয়া আর ফী হইবে। তোমাকে শূণি করিবার জন্য দিবাহ করিতেছি, ভালোমন্দ বিচার করা মিথ্যা।”

কথাটার মধ্যে একটু রাগের উত্তাপ ছিল, কিন্তু মা ভাবিলেন, শুধু-দৃষ্টির সময়ে তাহার পছন্দের সহিত যখন পুত্রের পছন্দের নিশ্চয় মিল হইবে, তখন মহেন্দ্রের কতি স্থর কোমল হইয়া আসিবে।

রাঙ্গলক্ষী নিশ্চিন্তচিত্তে বিবাহের দিন স্থির করিলেন। দিন যত নিকটে আসিতে লাগিল মহেন্দ্রের মন ততই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল; অবশেষে ছই-চার দিন আগে সে বলিয়া বলিল, “না মা, আমি কিছুতেই পারিব না।”

বাল্যকাল হইতে মহেন্দ্র দেবতা ও মানবের কাছে সর্বপ্রকারে প্রার্থ্য পাইয়াছে, এইজন্য তাহার ইচ্ছার বেগ উজ্জ্বল। পনের ইচ্ছার চাপ সে সহিতে পারে না। তাহাকে নিজের প্রতিজ্ঞা এবং পনের অচরোধ একান্ত বাধ্য করিয়া তুলিয়াছে বলিয়াই বিবাহপ্রস্তাবের প্রতি তাহার অস্বাভাবিক বিতর্ক। অভ্যস্ত ব্যক্তি উঠিল এবং আসন্নকালে সে একেবারেই বিমূখ হইয়া গেল।

মহেন্দ্রের পদম বড় ছিল বিহারী; সে মহেন্দ্রকে দাদা এবং মহেন্দ্রের মাকে না বলিত। মা তাহাকে সীমাবোর্ডের পশ্চাতে আবদ্ধ গাধাবোর্ডের মতো মহেন্দ্রের একটি আবদ্ধ ভারবহ আসবাবের স্বরূপ দেখিতেন ও সেই হিসাবে নমতাগ্ন করিতেন। রাঙ্গলক্ষী তাহাকে বলিলেন, “বাবা, এ কাল তো তোমাকেই করিতে হয়, নহিলে গরিবের মেয়ে—”

বিহারী মোড়হাত করিয়া কহিল, “মা, গইটে পারিব না। যে মেঠাই তোমার মহেন্দ্র ভালো লাগিল না বলিয়া দাখিয়া দেয়, সে মেঠাই

তোমার অহরোধে পড়িয়া আমি অনেক পাইয়াছি ; কিন্তু কন্ডার বোলায় সেটা সহিবে না ।”

রাজলক্ষ্মী ভাবিলেন, “বিহারী আবার বিয়ে করিবে ! ও কেবল মনিনকে লইয়াই আছে, বউ আনিবার কথা মনেও স্থান দেয় না ।”

এই ভাবিয়া বিহারীর প্রতি তাঁহার কৃপামিশ্রিত মমতা আর-একটুখানি বাড়িল ।

বিনোদিনীর বাপ বিশেষ ধনী ছিল না, কিন্তু তাহার একমাত্র কন্যাকে সে মিশনারি মেম রাখিয়া বহু যত্নে পড়াশুনা ও কারুকার্য শিখাইয়াছিল । কন্ডার বিবাহের বয়স ক্রমেই বহিয়া যাইতেছিল, তবু তাহার হঁশ ছিল না । অবশেষে তাহার মৃত্যুর পরে বিধবা মাতা পাত্র খুঁজিয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছে ; টাকাকড়িও নাই, কন্ডার বয়সও অধিক ।

তখন রাজলক্ষ্মী তাঁহার ভ্রাতৃভূমি বারাণসীতে গ্রামসম্পর্কীয় এক ব্রাহ্মপুত্রের সহিত উক্ত কন্যা বিনোদিনীর বিবাহ দেওয়াইলেন ।

অনতিকাল পরে কন্যা বিধবা হইল । মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, “ভাগ্যে বিবাহ করি নাই, স্ত্রী বিধবা হইলে তো এক দণ্ড টিকিতে পারিতাম না ।”

বহু তিনেক পরে আর-একদিন মাতাপুত্রের কথা হইতেছিল ।

“বাবা, লোকে যে আমাকেই নিন্দা করে ।”

“কেন মা, লোকের ভূমি কী সর্বনাশ করিয়াছে ।”

“পাছে বউ আগিলে ছেলে পর হইয়া যায়, এই ভয়ে তোমার বিবাহ দিতেছি না, লোকে এইরূপ বলাবলি করে ।”

মহেন্দ্র কহিল, “ভয় তো হওয়াই উচিত । আমি মা হইলে প্রাণ দরিয়া ছেলের বিবাহ দিতে পারিতাম না । লোকের নিন্দা মাথা পাতিয়া লইতাম ।”

না আসিয়া কহিলেন, “গোনো একবার ছেলের কথা শোনো।”

মহেন্দ্র কহিল, “বউ আসিয়া তো ছেলেকে ছুড়িয়া বসেই। তখন এত কষ্টের এত মেহের না কোথায় সরিষা যায়, এ যদি বা তোমার ভালো লাগে, আমার ভালো লাগে না।”

ব্রাহ্মস্বামী মনে মনে পুণ্ডিত হইয়া তাঁহার সত্যসন্ধানতা বিদ্যা জ্ঞানকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “গোনো ভাই মেজবউ, মহিম কী বলে শোনো। বউ পাচে মাকে ভাড়াইয়া উঠে, এই ভয়ে ও বিয়ে করিতে চায় না। এমন হরিদ্রাড়া কথা কখনো শুনিয়াছ ?”

সাকী কহিলেন, “এ তোমার বাছা, বাড়াবাড়ি। যখনকার বা তখনই তাই শোভা পায়। এখন নার ঝাটল ছাড়িয়া বউ লইয়া ঘরকন্না করিবার সময় আসিয়াছে, এখন ভোটো ছেলের মতো ব্যবহার দেখিলে লজ্জা বেশ হয়।”

এ কথা ব্রাহ্মস্বামীর ঠিক মন্থর লাগিল না এবং এই প্রসঙ্গে তিনি যে-কটি কথা বলিলেন তাহা সফল হইতে পারে, কিন্তু নতুনাতা নহে। কহিলেন, “আমার ছেলে যদি আমার ছেলেরের চেয়ে মাকে বেশি ভালো-দাসে, তোমার তাতে লজ্জা করে কেন, মেজবউ। ছেলে থাকিলে ছেলের মর্ম বুঝিতে।”

ব্রাহ্মস্বামী মনে করিলেন, পুত্রসৌভাগ্যদাতাকে পুত্রহীনা ঐশ্য করিতেছে।

মেজবউ কহিলেন, “তুমিই বউ আনিবার কথা পাড়িলে যদিও কথাটা উঠিল, নহিলে আমার অধিকার কী।”

ব্রাহ্মস্বামী কহিলেন, “আমার ছেলে যদি বউ না আনে, তোমার বুকে তাতে শেল বেঁধে কেন। বেশ হে, এতদিন যদি ছেলেকে নাড়ব করিয়া আসিতে পারি, এখনও উরাকে তেজিতে শুনিতে পারিব, আর-কাহারও ব্যবহার হইবে না।”

মেজবউ অশ্রুপাত করিয়া নীরবে চলিয়া গেলেন। মহেন্দ্র মনে মনে আঘাত পাইল এবং কালেছ হইতে সকাল সকাল ফিরিয়াই তাহার কাকীর ঘরে উপস্থিত হইল।

কাকী তাহাকে বাহা বলিয়াছিলেন তাহার মধ্যে স্নেহ ছাড়া আর কিছুই ছিল না, ইহা সে নিশ্চয়ই জানিত। এবং ইহাও তাহার জানা ছিল, কাকীর একটি পিতৃমাতৃহীনা বোনঝি আছে, এবং মহেন্দ্রের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া গম্ভানহীনা বিধবা কোনো সূত্রে আপনাপ ভগিনীর মেয়েটিকে কাছে আনিয়া স্থায়ী দেখিতে চান। যদিচ বিবাহে সে নাবান্ন, তবু কাকীর এই মনোগত ইচ্ছাটি তাহার কাছে স্বাভাবিক এবং অত্যন্ত করুণাবহ বলিয়া মনে হইত।

মহেন্দ্র তাঁহার ঘরে যখন গেল তখন বেলা আর বড়ো বাকি নাই। কাকী অন্নপূর্ণা তাঁহার ঘরের কাটা জানালার গরমের উপর মাথা রাখিয়া শুক বিমর্ষমুখে বসিয়া ছিলেন। পাশের ঘরে ভাত ঢাকা পড়িয়া আছে, এখনও স্পর্শ করেন নাই।

অন্ন কারণেই মহেন্দ্রের চোপে জল আসিত। কাকীকে দেখিয়া তাহার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। কাছে আসিয়া স্নিগ্ধস্বরে ডাকিল, “কাকীমা।”

অন্নপূর্ণা হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, “আমি মহিম, বোম্।”

মহেন্দ্র কহিল, “ভারি কুখা গাইয়াছে, প্রসাদ খাইতে চাই।”

অন্নপূর্ণা মহেন্দ্রের কৌশল বুঝিয়া উচ্ছ্বসিত অশ্রু কণ্ঠে সম্বরণ করিলেন এবং নিজে পাইয়া মহেন্দ্রকে খাওয়াইলেন।

মহেন্দ্রের হৃদয় তখন করুণায় আর্দ্র ছিল। কাকীকে লায়না দিবার ব্রত আহায়াতে হঠাৎ মনের খোঁকে বলিয়া বসিল, “কাকী, তোমার সেই যে বোনঝির কথা বলিয়াছিলে, তাহাকে একবার দেখাইবে না?”

কথাটা উচ্চারণ করিয়াই সে ভীত হইয়া পড়িল।

অন্নপূর্ণা হাসিয়া কহিলেন, “তোমার আবার বিবাহে দান গেল নাকি নহিন ?”

মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি কহিল, “না, আমার ভ্রত নয় কাঁচী, আমি বিহারীকে দ্বাদি করিয়াছি। তুমি বেগিবার দিন ঠিক করিয়া পাও।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “আহা, তাহার কি এমন ভাগ্য হইবে। বিহারীর মতো ছেলে কি তাহার কপালে আছে।”

কাঁচীর ঘর হঠাৎ বাহির হইয়া মহেন্দ্র দ্বারের কাছে আসিতেই মার সঙ্গে দেখা হইল। দ্বারলক্ষী বিজ্ঞাসা করিলেন, “কী মহেন্দ্র, এতদূর ভ্রমের কী পরামর্শ হইতেছিল।”

মহেন্দ্র কহিল, “পরামর্শ কিছুই না, পান লইতে আসিয়াছি।”

স্বা কহিলেন, “তোমার পান তো আমার ঘরে সাজা আছে।”

মহেন্দ্র উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল।

দ্বারলক্ষী ঘরে ঢুকিয়া অন্নপূর্ণার সোমনস্কীত চক্ষু দেখিয়া মাত্র অনেক কথা কল্পনা করিয়া গইলেন। যৌস করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “কী গো মেচ্ছাক্ষন, ছেলের কাছে লাগালানি করিতেছিলে বুঝি ?”

বলিয়া উত্তরনাম না তুমি দ্বা দ্রুত বেগে চলিয়া গেলেন।

২

মেয়ে দেখিবার কথা মহেন্দ্র প্রায় কল্পিয়াছিল, অন্নপূর্ণা ভ্রমেন নাই। তিনি জানবাম্বারে মেয়ের অভিভাবক ঘোঁর দাড়িতে গয় লিখিয়া দেখিতে দাঁড়াইয়া দিন দ্বিধ করিয়া পাঠাইলেন।

দিন দ্বিধ হইয়াছে তুমি দ্বাই মহেন্দ্র কহিল, “এত তাড়াতাড়ি কান্টা করিলে কেন কাঁচী। এখনও বিহারীকে বনাই হয় নাই।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “সে কি হুচ নহিন। এখন, না দেখিতে গেলে তাহার কী মনে করিবে।”

মহেন্দ্র বিহারীকে ডাকিয়া সকল কথা বলিল। কহিল, “চলো তো, পছন্দ না হইলে তো তোমার উপর জোর চলিবে না।”

বিহারী কহিল, “সে কথা বলিতে পারি না। কাকীর বোনঝিকে বলিতে গিয়া ‘পছন্দ হইল না’ বলা আমার মুখ দিয়া আসিবে না।”

মহেন্দ্র কহিল, “সে তো উত্তম কথা।”

বিহারী কহিল, “কিছু তোমার পক্ষে অজ্ঞায় কাজ হইয়াছে, মহিন্দা। জরুরে হালকা রাখিয়া পরের স্বত্বে একরূপ ভার চাপানো তোমার উচিত নাই। এখন কাকীর মনে আঘাত দেওয়া আমার পক্ষে বড়োই হইবে।”

মহেন্দ্র একটু লজ্জিত ও কষ্ট হইয়া কহিল, “তবে কী করিতে চাও।”

বিহারী কহিল, “যখন তুমি আমার নাম করিয়া তাঁহাকে আশা দিয়াছ, তখন আমি বিবাহ করিব— দেখিতে যাইবার ভাং করিবার প্রবার নাই।”

অন্নপূর্ণাকে বিহারী দেবীর মতো ভক্তি করিত।

অবশেষে অন্নপূর্ণা বিহারীকে নিজে ডাকিয়া কহিলেন, “সে কি হয়, যাছ। না দেখিয়া বিবাহ করিবে, সে কিছুতেই হইবে না। যদি পছন্দ না হয় তবে বিবাহে সম্মতি দিতে পারিবে না, এই আমার শপথ রহিল।”

নির্ধারিত দিনে মহেন্দ্র কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া মাকে কহিল, “আমার সেই রেশমের জামা এবং ঢাকাই ধুতিটা বাহির করিয়া দাও।”

মা কহিলেন, “কেন, কোথায় যাবি।”

মহেন্দ্র কহিল, “দরকার আছে না, তুমি দাও-না, আমি পরে বলিব।”

মহেন্দ্র একটু সাজ না করিয়া থাকিতে পারিল না। পরের জন্ত হইলেও কত। দেখিবার প্রসন্নমুখেই যৌবনধর্ম আপনি চুলটা একটু ফিরাইয়া নয়, চাদরে কিছু গন্ধ ঢালে।

হুই বন্ধু কত। দেখিতে বাহির হইল।

১০৭ জানবাজারের অশ্রুস্রাব নিজে উপাধিত ধন
দ্বারা তাঁহার বাগান-সমত তিনতলা বাড়িটাকে পাতার মাধ্যমে উ
তুলিয়াছেন।

দরিদ্র জাতীয় মুক্তার পর পিতৃমাতৃহীনা আত্মশ্রুতীকে তিনি নিজ
বাড়িতে আনিয়া রাখিয়াছেন। মাসি অল্পপূর্ণা বলিয়াছিলেন, 'আমার
কাছে থাক'; তাহাতে ব্যঙ্গাচরণের স্থিতি ছিল বটে, কিন্তু গৌরবশালার
ভয়ে অশ্রুস্রাব রাক্ষস হইলেন না। এমনকি, দেবশাস্ত্র কথার স্বতঃ
কথাকে কোনো মাসির বাড়ি পাঠাইতেন না, নিজেদের মধ্যম ন্যে
তিনি এতই কড়া ছিলেন।

কথাতির বিবাহ-ভাঙ্গার সময় আসিল, কিন্তু আশ্চর্যকর দিনে
কথার বিবাহ সম্বন্ধে 'দাদু' ভাবনা যত সিদ্ধির্ভবতি তাদুই' কথাটা
পাঠে না। ভাঙ্গার সবে খরচও চাই। কিন্তু পণের কথা উঠিলেই অশ্রুস্রাব
বলেন, 'আমার তো নিজের নেয়ে আছে, আমি একা আর কত পারিমা
উঠিব।' এমনি করিয়া দিন বহিয়া থাকিতেছিল। এমন সময় মাসিমা-
উজ্জ্বল গড় মাখিয়া বহুদিনে বহুকে লইয়া মহোৎসব প্রবেশ করিলেন।

তখন চৈতন্যসর নিম্নাঙ্গে বহু অস্তিত্ব। সোভানার দক্ষিণ-
বাহিন্যে ডিহিত ডিহিত চীনের টানি গাথা; তাহারই প্রাচীরে ই
অভাগতের দৃষ্ট রূপার বেকানি বসন্তমিষ্ট্রোয়ে শোভমান এবং বরফ-দল-
পূর্ণ রূপার মাস গীতল শিশিরবিন্দু-মাগে বস্তিত। নরহর বিহারীকে
লইয়া আশ্রিতভাবে থাকিতে বসিয়াছেন। নীচে বাগানে মাদী শুক-
কারিত করিয়া গাছে গাছে লস নিতেছিল। সেই মিত্র বস্তিকার শিউ
গন্ধ বহন করিয়া গাছে গাছে লস নিতেছিল। সেই মিত্র বস্তিকার শিউ
চানদের প্রাচীরে হৃদয় করিয়া স্থগিতছিল। আশ্রিতের দ্বার-
বানালার হিহাভবাস হইতে এতই-আত্ম চালা হাসি, বিস্ময় কথা,
টা-একটা বহনাব টুটাং বেন প্রাচীর।

আহারের পর অহুকুলবাবু ভিতরের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “চুনি, পান নিয়ে আয় তো রে।”

কিছুক্ষণ পরে সংকোচের ভাবে পশ্চাতে একটা মরছা খুলিয়া গেল এবং একটি বালিকা কোথা হইতে সর্বদে রাস্তার লজ্জা জড়াইয়া আনিয়া পানের বাটা হাতে অহুকুলবাবুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি কহিলেন, “লজ্জা কী, না। বাটা ওই ঠুংদের সামনে রাখো।”

বালিকা মত হইয়া কম্পিত হস্তে পানের বাটা অতিথিদের আসন-পার্শ্বে ভূমিতে রাখিয়া দিল। বারান্দার পশ্চিমপ্রান্ত হইতে স্বর্গান্ত-আভা তাহার লজ্জিত মুখকে মণ্ডিত করিয়া গেল। সেই অবকাশে মহেন্দ্র সেই কম্পাদিতা বালিকার করুণ মুখচ্ছবি দেখিয়া লইল।

বালিকা তখন চলিয়া যাইতে উদ্ভত হইলে অহুকুলবাবু কহিলেন, “একটু দাঁড়া, চুনি। বিহারীলাল, এইটি আমার ছোটো ভাই অপূর্বর কন্যা। সে তো চলিয়া গেছে, এখন আমি ছাড়া ইহার আর কেহ নাই।”

বলিয়া তিনি দীর্ঘনিশ্বাস কেলিলেন।

মহেন্দ্রের হৃদয়ে দয়ার আঘাত লাগিল। অনাথার দিকে আর-একবার চাহিয়া দেখিল।

কেহ তাহার বদন স্পষ্ট করিয়া বলিত না। আত্মীয়েরা বলিত, ‘এই বারো-তেরো হইবে।’ অর্থাৎ চোদ্দ-পনেরো হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। কিন্তু অহুগ্রহপালিত বলিয়া একটি কৃত্তিত ভীক ভাবে তাহার নব-যৌবনারম্ভকে সংযত সম্বৃত করিয়া রাখিয়াছে।

আর্দ্রচিত্ত মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার নাম কী?”

অহুকুলবাবু উৎসাহ দিয়া কহিলেন, “বলো না, তোমার নাম বলো।”

বালিকা তাহার অভ্যন্ত আদেশপালনের ভাবে নতমুখে বলিল, “আমার নাম আশালতা।”

আশা! মহেন্দ্ৰের মনে হইল নামটি বড়ো করুন এবং কষ্টটি বড়ো
কোনল। অনাথা আশা!

হুই বন্ধু পথে বাহির হইয়া আসিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিল। মহেন্দ্র
কহিল, “বিহারী, এ মেয়েটিকে তুমি ছাড়িয়া না।”

বিহারী তাহার স্পষ্ট উত্তর না করিয়া কহিল, “মেয়েটিকে যে
উহার মামিনাকে মনে পড়ে; বোধ হয় অমনি লক্ষী হইবে।”

মহেন্দ্র কহিল, “তোমার স্বপ্নে যে বোকা চাশাইলাম, এখন বোধ
তাহার ভাগ্য তত গুরুতর বোধ হইতেছে না।”

বিহারী কহিল, “না, বোধ হয় সদ্য কহিতে পারিব।”

মহেন্দ্র কহিল, “কাজ কী এত কষ্ট করিয়া। তোমার বোকা নাম
স্মরণে মনে তুলিয়া লই। কী বল।”

বিহারী গম্ভীর ভাবে মহেন্দ্ৰের মুখের দিকে চাহিল। কহিল
“মহিননা, সত্য বলিতেছ? এখনও ঠিক করিয়া বলো। তুমি বিবাহ
করিলে কাকী চের বেশি খুশি হইবেন— তাহা হইলে তিনি মেয়েটিকে
সর্বদাই কাছে রাখিতে পারিবেন।”

মহেন্দ্র কহিল, “তুমি পাগল হইয়াছ? সে হইলে অনেক কাল আগে
হইয়া বাইত।”

বিহারী অধিক আশঙ্কিত না করিয়া চলিয়া গেল, মহেন্দ্রও মোজা পর
ছাড়িয়া দীর্ঘ পথ ধরিয়া বহু বিলম্বে দীঘে দীঘে বাড়ি গিয়া পৌছিল।

না তখন লুচি-ভাণা ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন, কাকী তখনও তাহার
বোনটির নিকট হইতে ফেরেন নাই।

মহেন্দ্র একা নির্জন হালের উপর গিয়া বাতর পাতিয়া শুইল।
কমিকোত্তর চন্দ্রাবিসমুদ্রের উপর শুভ্রসন্ধ্যার অশ্রুত নিঃশব্দে আপন
অশ্রুত নামানয় বিকীর্ণ করিতেছিল। না যখন দাবার পদ্য দিলেন,
মহেন্দ্র অঙ্গস্বপ্নে কহিল, “বেশ আছি, এখন মাত্র ঠিকিতে পারি না।”

মা कहিলেন, “এইখানেই আনিয়া দিই-না?”

মহেন্দ্ৰ कहিল, “আজ আর থাইব না, আমি থাইয়া আসিয়াছি।”

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথায় থাইতে গিয়াছিলি।”

মহেন্দ্ৰ कहিল, “মে অনেক কথা, পরে বলিব।”

মহেন্দ্ৰের এই অভূতপূর্ব ব্যবহারে অভিমানিনী মাতা কোনো উত্তর না করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্বৃত্ত হইলেন।

তখন মুহূর্তেব মধ্যে আত্মসম্বরণ করিয়া অতন্তপ্ত মহেন্দ্ৰ कहিল, “মা, আমার থাবার এইখানেই আনো।”

মা कहিলেন, “সুখা না থাকে তো দবকার কী।”

এই লইয়া ছেলেতে মায়েতে কিয়ৎজন মান-অভিমানের পর মহেন্দ্ৰকে পুনশ্চ আহারে বসিতে হইল।

৩

যাে মহেন্দ্ৰের ভালো নিদ্রা হইল না। প্রভাতেই সে বিহারীর বাসায় গানিয়া উপস্থিত। कहিল, “ভাই, ভাবিয়া দেখিলাম, কাকীমার মনোগত ইচ্ছা, আমিই তাঁহার বোনঝিকে বিবাহ করি।”

বিহারী कहিল, “সেজ্ঞাত তো হঠাৎ নূতন করিয়া ভাবিবার কোনো প্রকার ছিল না। তিনি তো ইচ্ছা নানা প্রকারেই ব্যক্ত করিয়াছেন।”

মহেন্দ্ৰ कहিল, “তাই বলিতেছি, আমার মনে হয়, আশাকে আমি বিবাহ না করিলে তাঁহার মনে একটা খেদ থাকিয়া যাইবে।”

বিহারী कहিল, “সম্ভব বটে।”

মহেন্দ্ৰ कहিল, “আমার মনে হয়, সেটা আমার পক্ষে নিতান্ত অস্বাভাবিক হইবে।”

বিহারী কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক উৎসাহের সহিত कहিল, “বেশ কথা, সে তো ভালো কথা, তুমি রাজি হইলে তো আর কোনো কথাই

থাকে না। এ কর্তব্যবুদ্ধি কাল তোমার মাথার আগিলেই তো ভালো
হইত।”

মহেন্দ্র। এক দিন বেড়িতে আসিয়া কী এমন কতি হইল।

যেই দিনাছের প্রস্থানে মহেন্দ্র মনকে লাগান ছাড়িয়া দিল, সেই
তাহার পক্ষে দৈর্ঘ্য বক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে
লাগিল, ‘আর অধিক কথামাঠা না হইয়া কাজটা সম্পন্ন হইয়া গেলেই
ভালো হয়।’

মাকে গিয়া কহিল, “মাঝা না, তোমার অনুরোধ গ্রাহিব। বিবাহ
করিতে রাতি হইলান।”

মা মনে মনে কহিলেন, ‘বুন্দিয়াছি, সেদিন মেঘবউ কেন হঠাৎ
তাহার বোনকিকে লেনিতে চলিয়া গেল এবং মহেন্দ্র সাজিয়া বাহির
হইল।’

তাঁহার মাথার ‘অনুরোধ’ অপেক্ষা ‘অঙ্গপূর্ণার চর্যাস্ব’ যে সফল হইল,
ইহাতে তিনি সমস্ত বিশ্ববিধানের উপর অঙ্গবৃষ্ট হইয়া উঠিলেন। বুঝিলেন,
“একটি ভালো মেয়ে নতুন করিতেছি।”

মহেন্দ্র ‘মাথার উল্লেখ’ করিয়া কহিল, “কত্যা তো পাওয়া গেছে।”

স্বামলক্ষ্মী কহিলেন, “সে কত্যা হইবে না বাচা, তাহা আমি বলিয়া
রাখিতেছি।”

মহেন্দ্র ব্যপক সংখত ভাষায় কহিল, “কেন না, বেয়েটি তো মন্দ নয়।”

স্বামলক্ষ্মী। তাহার তিন কুলে কেহ নাট, তাহার সহিত বিবাহ দিয়া
আমার কুটুম্বের স্থপ কী চইবে।

মহেন্দ্র। কুটুম্বের স্থপ না চইলেও আমি চম্বিত চইব না, কিন্তু
মেরটিক আমার বেশ পছন্দ চইয়াছে, না।

কেমের জেত দেখিয়া স্বামলক্ষ্মীর চিত্ত আরও কঠিন হইয়া উঠিল।
অঙ্গপূর্ণাকে গিয়া কহিলেন, “বাগ-বা-বরা অলক্ষণ্য কত্য়ার সহিত আমার

এক ছেলের বিবাহ দিয়া তুমি আমার ছেলেকে আমার কাছ হইতে ভাঙাইয়া লইতে চাও? এত বড়ো শয়তানি?”

অন্নপূর্ণা বাঁদিয়া কহিলেন, মহিনের সঙ্গে বিবাহের কোনো কথাই হয় নাই, সে আপন ইচ্ছামত তোনাকে কী বলিয়াছে, আমিও জানি না।”

মহেন্দের মা সে কথা কিছুমাত্র বিশ্বাস করিলেন না।

তখন অন্নপূর্ণা বিহারীকে ডাকাইয়া সাক্ষাৎ কহিলেন, “তোমার সঙ্গেই তো সব ঠিক হইয়াছিল, আবাব কেন উন্টাইয়া দিলে। আবাব তোমাকেই মত দিতে হইবে। তুমি উকার না করিলে আমাকে বড়ো লজ্জার পড়িতে হইবে। মেয়েটি বড়ো লম্বী, তোমার অযোগ্য হইবে না।”

বিহারী কহিল, “কাকীমা, সে কথা আমাকে বলা বাহুল্য। তোমার বোনঝি যখন, তখন আমার অমতের কোনো কথাই নাই। কিন্তু মহেন্দ্র—”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “না বাছা, মহেন্দের সঙ্গে তাহার কোনোমতেই নিবাহ হইবার নয়। আমি তোমাকে সত্য কথাই বলিতেছি, তোমার সঙ্গে বিবাহ হইলেই আমি সব চেয়ে নিশ্চিন্ত হই। মহিনের সঙ্গে নয়ন্ডে আমার মত নাই।”

বিহারী কহিল, “কাকী, তোমার যদি মত না থাকে, তাহা হইলে কোনো কথাই নাই।”

এই বলিয়া সে রাজলক্ষ্মীর নিকটে গিয়া কহিল, “মা, কাকীর বোনঝির সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হইয়া গেছে, আশ্বীয স্ত্রীলোক কেহ কাছে নাই— কাজেই লজ্জার মাথা থাইয়া নিজেই পদবটা দিতে হইল।”

রাজলক্ষ্মী। বলিল কী, বিহারী। বড়ো খুশি হইলাম। মেয়েটি লম্বী মেয়ে, তোম উপযুক্ত। এ মেয়ে কিছুতেই হাতছাড়া করিস নে।

বিদায়ী। হাতছাড়া কেন হয়েছে। মহিন্দা নিজে পছন্দ করিয়া আমার সঙ্গে সংস্কৃত করিয়া দিয়াছেন।

এই সকল বাতাবিত্তে মহেন্দ্র বিগ্ন উদ্বেজিত হইয়া উঠিল। সে মা ও কাকীর উপর রাগ করিয়া একটা দীনহীন ছাত্রাবাসে গিয়া আশ্রয় লইল।

ব্রাহ্মলক্ষ্মী বাগিয়া অন্নপূর্ণার ঘরে উপস্থিত হইলেন; কহিলেন, “মেঘ-বউ, আমার চেলে বৃষ্টি উঠান হইয়া ঘর চাড়িল, তাহাকে বন্ধা করে।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “নিশি, একটু সৈধ্য পরিমা পাকো— দু দিন বাতাই তাহার রাগ পড়িয়া যাইবে।”

ব্রাহ্মলক্ষ্মী কহিলেন, “তুমি তাহাকে জান না। সে বাহা চাদ, না পাইলে বাহা-খুশি করিতে পারে। তোমার বোনটির সঙ্গে যেমন করিয়া হউক তার—”

অন্নপূর্ণা। নিশি, সে কী করিয়া হয়— বিদায়ীর সঙ্গে কথাবার্তা একপ্রকার পাকা হইয়াছে।

ব্রাহ্মলক্ষ্মী কহিলেন, “সে ডাঙিতে কতকণ।”

বলিয়া বিদায়ীকে ডাকিয়া কহিলেন, “বাবা, তোমার অল্প ভালো পাত্রী লেগিয়া গিতেছি, এই কড়াটি ছাড়িয়া দিতে হইবে, এ তোমার যোগ্যই নয়।”

বিদায়ী কহিল, “না মা, সে হয় না। সে সমস্তই ঠিক হইয়া গেছে।”

তখন ব্রাহ্মলক্ষ্মী অন্নপূর্ণাকে গিয়া কহিলেন, “আমার মাথা পাণ মেঘবউ, তোমার পায়ে ধরি, তুমি বিদায়ীকে বলিলেই সব ঠিক হইবে।”

অন্নপূর্ণা বিদায়ীকে কহিলেন, “বিদায়ী, তোমাকে বলিতে আমার মূখ সন্নিবেশে না, কিছু কী করি যলো। মাথা তোমার হাতে পড়িলেই আমি বড়ো নিশ্চিন্ত হই-তাম, কিছু সব তো জানিতেছই—”

বিদায়ী। বৃত্তিযাচি, কাকী। তুমি যেমন আদেশ করিলে, তাহার

হইবে। কিন্তু আমাকে আর কখনও কাহারও সঙ্গে বিবাহের জন্য
অনুরোধ করিয়ো না।

বলিয়া বিহারী চলিয়া গেল। অন্নপূর্ণার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল,
মহেন্দ্রের অবল্যপ-আশঙ্কায় মুছিয়া কেলিলেন। বার বার মনকে
বুঝাইলেন—বাহা হইল তাহা ভালোই হইল।

এইরূপে রাজলক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা এবং মহেন্দ্রের মধ্যে নিষ্ঠুর নিগূঢ় নীরব
যাত-প্রতিযাত চলিতে চলিতে বিবাহের দিন সমাগত হইল। বাতি
উজ্জ্বল হইয়া জলিল, শানাই মধুর হইয়া বাজিল, মিষ্টান্নে মিষ্টের ভাগ
লেশমাত্র কম পড়িল না।

আশা সজ্জিত হৃদয় দেখে, লজ্জিত মুগ্ধ মুখে, আপন নূতন সংসারে
প্রথম পদার্পণ করিল; তাহার এই দুলায়ের মধ্যে কোথাও যে কোনো
কটক আছে, তাহা তাহার কল্পিত কোমল হৃদয় অনুভব করিল না;
বরঞ্চ স্বগতে তাহার একমাত্র মাতৃহানীয়া অন্নপূর্ণার কাছে আনিতেছে
বলিয়া আশ্বাসে ও আনন্দে তাহার সর্বপ্রকার ভয় সংশয় দূর হইয়া গেল।

বিবাহের পর রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রকে ডাকিয়া কহিলেন, “আমি বলি,
এখন বউমা কিছুদিন তাঁব জেঠার বাড়ি গিয়াই থাকুন।”

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, “কেন, মা।”

মা কহিলেন, “এবারে তোমার একজামিন আছে, পড়াশুনার ব্যাঘাত
হইতে পারে।”

মহেন্দ্র। আমি কি ছেলেমানুষ। নিম্নের ভালোমন বৃদ্ধে চলিতে
পারি না?

রাজলক্ষ্মী। তা হোক-না বাপু, আর একটা বৎসর বৈ তো নয়।

মহেন্দ্র কহিল, “বউএর বাপ না যদি কেহ থাকিতেন, তাঁহার কাছে
পাঠাইতে পারিতি ছিল না—কিন্তু জেঠার বাড়িতে আমি উহাকে
স্বাধিতে পারিব না।”

রাজলক্ষী । (আশ্চর্য) ওরে বাস্ রে ! উনিই কর্তা, শাস্ত্রী দেব
নয় ! কান দিয়ে কবিয়া আচ্ছই এত মরদ ! কর্তারা তো আনামের
একদিন দিবাহ কবিয়াছিলেন, কিন্তু এমন শৈশবতা, এমন বেহায়াপনা তো
তখন ছিল না ।

মহেন্দ্র খুব ভোরের সহিত কহিল, “কিছু ভাবিছো না, মা । এক-
ব্রাহ্মিনের কোনো ক্ষতি হইবে না ।”

৪

রাজলক্ষী তখন হঠাৎ অপরিচিত উৎসাহে বধূকে মরকটার কাছ শিখাইতে
প্রবৃত্ত হইলেন । ডাঁড়ামর, বালামর, ঠাকুরঘরেই আশার দিনগুলি
কাটিল ; রাগে রাজলক্ষী তাহাকে নিজের বিচানায় শোয়াইয়া তাহার
আত্মীয়বিরুদ্ধের কতিপূরণ করিতে লাগিলেন ।

অমপূর্ণা অনেক বিবেচনা করিয়া বোনটির নিকট হইতে ঘুরেই
ধাকিতেন ।

যখন কোনো প্রবল অভিভাবক একটা ইচ্ছামণ্ডল সমস্ত রস প্রায়
নিঃশেষপূর্বক চর্বণ করিতে থাকে তখন হঠাৎ লোক বালকের কোঁড়
উত্তরোত্তর যেমন অসহ্য বাড়িয়া উঠে, মহেন্দ্রের সেই মণা হইল । ঠিক
তাহার চোখের মধুগুণেই নবমৌলনা নববধূর সমস্ত মিলি রস যে কেবল
মরকটার দ্বারা পিষ্ট হইতে থাকিলে, ইহা কি মণ হইবে ।

মহেন্দ্র অমপূর্ণাকে গিয়া কহিল, “কাকী, মা বউকে দেহরপ পাঠাইয়া
নারিতেছেন, আমি তো তাহা দেখিতে পারি না ।”

অমপূর্ণা জানিতেন, রাজলক্ষী ব্যাভাষা করিতেছেন ; কিন্তু বলিলেন,
“সেন মনি, বউকে ঘরের কাছ দেখানো হইতেছে, ডালোই হইতেছে ।
এখনকার বেহায়াপনা মতো মনে পড়িয়া, কার্শট বুনিয়া, বাবু হইয়া
থাকা কি ভালো ।”

মহেন্দ্র উত্তেজিত হইয়া বলিল, “এখনকার মেয়ে এখনকার মেয়ের মতোই হইবে, তা ভালোই হউক আর মন্দই হউক। আমার স্ত্রী যদি আমারই মতো নভেল পড়িয়া রস গ্রহণ করিতে পারে, তবে তাহাতে প্রতিপাপ বা পরিহাসের বিষয় কিছুই দেখি না।”

অন্নপূর্ণার ঘরে পুত্রের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া রাজলক্ষ্মী সব কর্ন ফেলিয়া চলিয়া আসিলেন। তীব্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কী! তোমাদের কিসের পরামর্শ চলিতেছে।”

মহেন্দ্র উত্তেজিত ভাবেই বলিল, “পরামর্শ কিছু নয় মা, বউকে ঘরের কাজে আমি দাসীরা মতো অত পাটিতে দিতে পারিব না।”

মা তাঁহার উদ্দীপ্ত জালা দমন করিয়া অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ধীর ভাবে কহিলেন, “তাঁহাকে লইয়া কী করিতে হইবে।”

মহেন্দ্র কহিল, “তাঁহাকে আমি লেখাপড়া শেপাইব।”

রাজলক্ষ্মী কিছু না কহিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন ও মুহূর্তপরে বধূর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া মহেন্দ্রের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া কহিলেন, “এই লও, তোমার বধূকে তুমি লেখাপড়া শেপাও।”

এই বলিয়া অন্নপূর্ণার দিকে ফিরিয়া গলবস্ত্র ছোড়করে কহিলেন, “মাপ করো মেজগিষ্টি, মাপ করো। তোমার বোনঝির মর্যাদা আমি বুঝিতে পারি নাই; উহার কোমল হাতে আমি হলুদের দাগ লাগাইয়াছি, এখন তুমি উহাকে ধুইয়া-মুছিয়া বিনি সাজাইয়া মহিনের হাতে দাও—উনি পায়ের উপর পা দিয়া লেখাপড়া শিখুন, দাসীবৃত্তি আমি করিব।”

এই বলিয়া রাজলক্ষ্মী নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া মশকদে অর্গল বদ্ধ করিলেন।

অন্নপূর্ণা মোড়ে মাটির উপরে বসিয়া পড়িলেন। আশা এই আকস্মিক গৃহবিপ্লবের কোনো তাৎপর্য না বুঝিয়া লক্ষ্যায় ভয়ে, ছঃখে বিবর্ণ হইয়া গেল। মহেন্দ্র অত্যন্ত রাগিয়া মনে মনে কহিল, “আর নয়, নিজের স্ত্রীর

তার নিজের হাতে লইতেই হইবে, নহিলে অন্ডার হইবে।'
টোম্বার সহিত কর্তব্যবুদ্ধি মিশিত হইতেই, হাওয়ার সঙ্গে আশ্রয়
লাগিয়া গেল। কোথায় গেল কালেক্টর, এক্সামিন, বন্ধুত্ব, সামাজিকতা;
খীর উন্নতি সাধন করিতে নব্বই তাহাকে লইয়া ঘরে ঢুকিল—কালের
প্রতি দৃকপাত বা লোকের প্রতি কক্ষনায়ও করিল না।

অভিমানিনী বাহুল্য্যী মনে মনে করিলেন, 'নব্বই যদি এখন তার
বটকে লইয়া আমার ঘারে হত্যা দিয়া পড়ে, তবু আমি তাকাইব না,
তেনি সে তার মাকে বাব দিয়া খুঁকে লইয়া কেমন করিয়া কাটিব।'

দিন যায়—বারের কাছে কোনো অশ্রুতপ্তের পক্ষপাত শুনা গেল না।
বাহুল্য্যী স্থির করিলেন, কখন চাচিতে আসিলে কখন করিলেন—
নহিলে নব্বইকে অত্যন্ত ব্যথা দেওয়া হইবে।

কমার আবেশন আসিয়া পৌছিল না। তখন বাহুল্য্যী স্থির
করিলেন, তিনি নিজে গিয়াই কখন করিয়া আসিলেন। তেলে অভিমান
করিয়া আছে বলিয়া কি নাও অভিমান করিয়া থাকিলে।

হেতুলায় চালের এক কোণে একটি বৃহৎ নব্বইয়ের গলম এবং
অধ্যায়নের স্থান। এ কয়দিন মা তাহার কাপড় গোছানো, বিছানা
তৈরি, ঘরদ্বার পরিষ্কার করার সম্পূর্ণ অবসরলা করিয়াছিলেন। কয়দিন
মাটমেন্টের চিরাতার কর্তব্যগুলি পালন না করিয়া তাহার চক্ষু
স্বতন্ত্রতাব্যবস্থার গলমের দ্বারা অথবা অথবা ব্যক্তি 'টোম্বা' উঠিয়াছিল।
সেদিন বিক্রেতার ডায়ালিস, 'নব্বই' এর সঙ্গে কালেক্টর গেছে, এই অবকাশে
তাহার ঘর দিক করিয়া আসি—কালের হইতে দিবিয়া আসিলেই সে
কবিতা পুস্তিকে পারিলে, তাহার ঘরে নান্দন্য পরিচালিত।

বাহুল্য্যী সিঁচি করিয়া উপরে উঠিলেন। নব্বইয়ের গলমটোয় একটি
বার থোলা ছিল, তাহার সম্মুখে আসি—হাঁসেন চাইতে বাঁটা দিছিল,
চলিয়া গিয়াছিল। দেখিলেন নীচের বিছানায় নব্বই নিহিত এবং

ঘাৱেৰ দিকে পশ্চাৎ কৰিয়া বধু ধীৰে ধীৰে তাহাৰ পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে। মধ্যাহ্নেৰ প্ৰথৰ আলোকে উন্মুক্ত ঘাৱে দাম্পত্যনীনাৰ এই অভিনয় দেখিয়া ৰাজলক্ষ্মী লজ্জাৰ বিক্কাৰে সংকুচিত হইয়া নিঃশব্দে নীচে নামিয়া আসিলেন।

৫

কিছুকাল অনাবৃষ্টিতে যে শস্তদল শুষ্ক পীতবৰ্ণ হইয়া আসে, বৃষ্টি পাইবা-
মাত্ৰ সে আৰ বিলম্ব কৰে না; হঠাৎ বাডিয়া উঠিয়া দীৰ্ঘ কালেন্দ্ৰ
উপবাসদৈন্ত্য দূৰ কৰিয়া দেয়, দুৰ্বল নত ভাব ত্যাগ কৰিয়া শান্তক্ষেত্ৰেৰ
মধ্যে অসংকোচে অসংশয়ে আপনাৰ অধিকাৰ উন্নত ও উজ্জল কৰিয়া
তোলে—আশাৰ সেইৰূপ হইল। যেখানে তাহাৰ বক্তেৰ সঞ্চদ ছিল,
সেখানে সে কখনও আত্মীয়তাৰ দাবি কৰিতে পায় নাই; আজ পৱেৰ
ঘৰে আসিয়া সে যখন বিনা প্ৰাৰ্থনায় এক নিকটতম সঞ্চদ এবং নিঃসন্দেহ
অধিকাৰ প্ৰাপ্ত হইল, যখন সেই অধৰলালিতা অনাধাৰ মন্তকে স্বামী
স্বহস্তে লক্ষ্মীৰ মুহূৰ্ত পৰাইয়া দিলেন, তখন সে আপন গৌৰবপদ গ্ৰহণ
কৰিতে লেশমাত্ৰ বিলম্ব কৰিল না; নববধুযোগ্য লজ্জাভয় দূৰ কৰিয়া
দিয়া সৌভাগ্যবতী ত্ৰীৰ মহিমায় নুহৰ্তেৰ মথ্যেই স্বামীৰ পদপ্ৰান্তে
অসংকোচে আপন সিংহাসন অধিকাৰ কৰিল।

ৰাজলক্ষ্মী সেদিন মধ্যাহ্নে সেই সিংহাসনে এই নূতন-আগত পৱেৰ
মেয়েকে এমন চিৰাভ্যন্তৰণ স্পৰ্শৰ সহিত বসিয়া থাকিতে দেখিয়া হৃৎসহ
বিশ্বয়ে নীচে নামিয়া আসিলেন। নিজেৰ চিন্তদাহে অধপূৰ্ণাকৈ দম্ব
কৰিতে গেলেন। কহিলেন, “ওগো, দেখা গে, তোনাৰ নবাবেৰ পুত্ৰী
নবাবেৰ ঘৰ হইতে কী শিক্ষা লইয়া আসিগাছেন। কৰ্ত্তাৰা থাকিলে
আম্—”

অন্নপূর্ণা কাতর হইয়া কহিলেন, “বিলি, তোমার বউকে তুমি শিক্ষা দিবে, শাসন করিবে, আমাকে কেন বলিতেছ।”

রাজলক্ষী ধনুঃকায়ের ন্যস্তা বাহিয়া উঠিলেন, “আমার বউ! তুমি নথী থাকিতে সে আমাকে আশ্রয় করিবে।”

তখন অন্নপূর্ণা সমস্ত পরামর্শে লক্ষ্যতিকে সূচকিত সূচতন করিয়া মহেশ্বরের শয়নগৃহে উপস্থিত হইলেন। আশাকে কহিলেন, “তুই এমন করিয়া আমার মাথা টেট করিবি, পোড়ারমুখী? লক্ষ্য নাই, শয়ন নাই, সময় নাই, অসময় নাই, কৃতা পাতঙ্গীর উপর সমস্ত ঘরকরা চাপাইয়া তুমি এখানে আশ্রয় করিতেছ? আমার পোড়াকপাল, আমি তোমাকে এ ঘরে আনিয়াছিলাম।”

বলিতে বলিতে তাঁহার চোখ দিয়া জল করিয়া পড়িল, আশাও মতদুখে বহ্নাকস খুঁটিতে খুঁটিতে নিশবৎ পাড়াইয়া বাঁচিতে লাগিল।

মহেশ্বর কহিল, “কাকী, তুমি বউকে কেন অশ্রয় ভৎসনা করিতেছ। আনিই তো উমাকে ধরিয়া রাখিয়াছি।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “সে কি ভাগ্যে কাত করিয়াছ। ও বামিকা, অনাথা, মায় কাচ হইতে কোনোহিন কোনো শিক্ষা পায় নাই, ও ভাগ্যামন্দের কী জানে তুমি উমাকে কী শিক্ষা দিবেছ।”

মহেশ্বর কহিল, “এই সন্ধ্যা, উমার গুহে রেট, খাতা, নই কিনিয়া আনিয়াছি। আমি বউকে দেখাপড়া শিক্ষাইব, তা লোকে নিন্দাই করুক আর তোমরা হাসিষ্ট কর।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “তাঁই কি সমস্ত নিমিষ্ট শিক্ষাইতে হইবে। সভ্যদ পর এক-মাস খটী পড়ালেই তো তের বয়।”

মহেশ্বর। “অত সমস্ত নয়, কাকী, পড়াশুনায় একটু সময়ের ব্যবহার হয়।

অন্নপূর্ণা বিবরু হইয়া সব হইতে বারি হইয়া গেলেন। আশাও খীত

ধীরে তাঁহার অস্থিরতার উপক্রম করিল; মহেন্দ্র দ্বার রোধ করিয়া পাড়াইল, আশার করুণ সম্মল নেত্রের কাতর অশ্রুস্রাব মানিল না। কহিল, “বোসো, ঘুমাইয়া সময় নষ্ট করিয়াছি, মেটা পোষাইয়া লইতে হইবে।”

এমন গম্ভীরপ্রকৃতি শ্রদ্ধেয় মূঢ় থাকিতেও পারেন যিনি মনে করিবেন, মহেন্দ্র নিদ্রাবেশে পড়াইবার সময় নষ্ট করিয়াছে। বিশেষরূপে তাঁহাদের অবগতির জ্ঞাত বলা আবশ্যক যে, মহেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে অধ্যাপন-কার্য যেরূপে নির্বাহ হয়, কোনো স্থলের ইন্স্পেক্টর তাহার অহুমোদন করিবেন না।

আশা তাহার স্বামীকে বিশ্বাস করিয়াছিল; সে বস্তুতই মনে করিয়াছিল, লেখাপড়া শেখা তাহার পক্ষে নানা কারণে সহজ নহে বটে, কিন্তু স্বামীর আদেশবশত নিতান্তই কর্তব্য। এইজন্য সে প্রাণপণে অশাস্ত বিক্ষিপ্ত মনকে সংযত করিয়া আনিত, শয়নগৃহের মেঝের উপর ঢালা বিছানার এক পার্শ্বে অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বসিত, এবং পুঁথিপত্রের দিকে একেবারে ঝুঁকিয়া পড়িয়া মাথা ছুলাইয়া মুগ্ধ করিতে আরম্ভ করিত। শয়নগৃহের অপর প্রান্তে ছোটো টেবিলের উপর ডাক্তারি বই খুলিয়া মাস্টারমশায় চোঁকিতে বসিয়া আছেন, মাঝে মাঝে কটাক্ষপাতে ছাত্রীর মনোযোগ লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছেন। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ ডাক্তারি বই বন্ধ করিয়া মহেন্দ্র আশার ডাক-নাম ধরিয়া ডাকিল, “চুনি।”

চকিত আশা মুগ্ধ তুলিয়া চাহিল। মহেন্দ্র কহিল, “বইটা আনো দেখি—দেখি কোন্‌খানটা পড়িতেছ।”

আশার ভয় উপস্থিত হইল, পাছে মহেন্দ্র পরীক্ষা করে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার আশা অল্পই ছিল। কারণ, চাকুপাঠের চাকুস-প্রলোভনে তাহার অবাধ্য মন কিছুতেই বশ মানে না; বন্ধীক সম্বন্ধে সে যতই জ্ঞানভান্ডার চেষ্টা করে, অক্ষরজ্ঞতা ততই তাহার দৃষ্টিপথের উপর দিয়া কালো পিপীলিকার মতো সার বাদিয়া চলিয়া যায়।

পত্নীম্বকের হাত তুলিয়া অপরদীর মতো আশা হয়ে হয়ে বইখানি ধরে। মহেন্দ্রের চোকির পাশে আনিয়া উপস্থিত হয়। মহেন্দ্র এক হাতে কটিদেশ বেঁটেনপূর্বক তাহাকে দৃঢ়রূপে বন্দী করিয়া অপর হাতে বই ধরিয়া বলে, “আজ কতটা পড়িলে বেবি।”

আশা হতওলা লাইনে চোখ বুজাইয়াছিল, সেখানিয়া দেখ। মহেন্দ্র ক্রমবশত বলে, “উঃ! এতটা পড়িতে পারিয়াছ? আমি কতটা পড়িয়াছি দেখিলে?”

বলিয়া তাহার ভাঙারি বইয়ের কোনো-একটা অধ্যায়ের শিরোনামটিই মাত্র দেখাইয়া দেয়। আশা শিরিয়ে চোখদুটা ভাগবত করিয়া বলে, “তবে এত কণ কী করিতেছিলে।”

মহেন্দ্র তাহার চিস্তুক পড়িয়া বলে, “আমি এক জনের কথা ভাবিতে-ছিলাম, কিন্তু তাহার কথা ভাবিতেছিলাম সেই নিষ্ঠুর তখন চারুপাঠে উঠপোকার অত্যন্ত মনোহর নিদ্রণ লইয়া হুনিয়া ছিল।”

আশা এই অনুলল অতিযোগের বিরুদ্ধে উপযুক্ত জবাব দিতে পারিত, কিন্তু হাত, কেশলমার লজ্জার খাতিরে প্রেমের প্রতিযোগিতায় অত্যন্ত পরাজয় মীড়নে মানিয়া লইতে হয়।

ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রমাণ হইবে, মহেন্দ্রের এই পাঠ্যপোলাটি সবকাবি না বেশকবি কোনো বিদ্যালয়ের কোনো শ্রমিক মানিয়া চলে না।

হঠাৎ একদিন মহেন্দ্র উপস্থিত নাই—সেই সন্ধ্যোগে আশা পাঠে মন দিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় কোথা হইতে মহেন্দ্র আনিয়া চোখ চিপিয়া ধরিল, পরে তাহার বই কাড়িয়া লইল, কহিল, “নিষ্ঠুর, আমি না থাকিলে তুমি আমার কথা ভাব না, পরা লইয়া থাক?”

আশা কহিল, “তুমি আমারে বৃথ করিয়া রাখিলে?”

মহেন্দ্র কহিল, “তোমার কল্যাণে আমারই বা বিড়া এমন কী যথাসর হইতেছে।”

কথাটা আশাকে হঠাৎ বাজিল ; তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইবার উপক্রম করিয়া কহিল, “আমি তোমার পড়ার কী বাধা দিয়াছি।”

মহেন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া কহিল, “তুমি তাহার কী বুঝিবে। আমাকে ছাড়িয়া তুমি যত সহজে পড়া করিতে পার, তোমাকে ছাড়িয়া তত সহজে আমি আমার পড়া করিতে পারি না।”

গুরুতর দোষারোপ। ইহার পরে স্বভাবতই শরতের এক পসনার মতো এক দশা কালার সৃষ্টি হয় এবং অনতিকালমধ্যেই কেবল একটি মঙ্গল উজ্জলতা রাখিয়া সোহাগের সূর্যালোকে তাহা বিলীন হইয়া যায়।

শিক্ষক যদি শিক্ষার সর্বপ্রধান অন্তরায় হন, তবে অবলা ছাত্রীর সাধ্য কী বিচারণ্যের মধ্যে পথ করিয়া চলে। মাঝে মাঝে মাগিমার তীব্র ভৎসনা মনে পড়িয়া চিত্ত বিচলিত হয়—বুঝিতে পারে, লেখাপড়া একটা ছুতা মাত্র ; শান্তডীকে দেখিলে লজ্জায় মরিয়া যায়। কিন্তু শান্তডী তাহাকে কোনো কাজ করিতে বলেন না, কোনো উপদেশ দেন না ; অনাদিষ্ট হইয়া আশা শান্তডীর গৃহকাৰ্যে সাহায্য করিতে গেলে, তিনি ব্যতসমস্ত হইয়া বলেন, “কর কী, কর কী, শোবার ঘরে যাও, তোমার পড়া কামাই যাইতেছে।”

অবশেষে অন্নপূর্ণা আশাকে কহিলেন, “তোমার যা শিক্ষা হইতেছে সে তো দেখিতেছি, এখন মহিনকেও কি ডাক্তারি দিতে দিবি না।”

শুনিয়া আশা মনকে খুব শক্ত করিল ; মহেন্দ্রকে বলিল, “তোমার একজ্ঞানিনের পড়া হইতেছে না, আজ হইতে আমি নীচে মাসিমার ঘরে গিয়া থাকিব।”

এ বয়সে এত বড়ো কঠিন সন্ন্যাসব্রত ! শয়নালয় হইতে একেবারে মাসিমার ঘরে আত্মনির্বাসন ! এই কঠোর প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করিতে তাহার চোখের প্রান্ত্রে ভল আসিয়া পড়িল, তাহার অবস্থা ক্ষুদ্র অদ্বন্দ্ব দাঁপিরা উঠিল এবং কর্তব্যর রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল।

পদীককের ডাক শুনিয়া অপরাধীর নতো আশা ভয়ে ভয়ে বইখানি লইয়া মহেশ্বরের চৌকির পাশে আসিয়া উপস্থিত হয়। মহেশ্বর এক হাতে কটিদেশ বেহীনপূর্বক তাহাকে দৃঢ়রূপে বন্দী করিয়া অপর হাতে বটে ধরিয়া কহে, “মাজ কতটা পড়িলে দেখি।”

আশা যতজলা মাইনে চোখ বুলাইয়াছিল, দেখাইয়া দেয়। মহেশ্বর ক্রোধের বলে, “উঃ ! এতটা পড়িতে পারিয়াছ ? আমি কতটা পড়িয়াছি দেখিলে ?”

ধরিয়া তাহার ডাক্তারি বইয়ের কোনো-একটা অধ্যায়ের শিরোনামটুকু নাম দেখাইয়া দেয়। আশা বিষয়ে চোখছটা ভাগর করিয়া বলে, “তবে এত গণ কী করিতেছিলে।”

মহেশ্বর তাহার চিবুক ধরিয়া বলে, “আমি এক জনের কথা ভাবিতে-ছিলাম, কিন্তু যাহার কথা ভাবিতেছিলাম সেই নিহুঁর তখন চারপাটে উইপোকার অত্যন্ত মনোহর বিসরণ লইয়া ফুগিয়া ছিল।”

আশা এই অনুকম অভিযোগের বিরুদ্ধে উপযুক্ত চবাব দিতে পারিত, কিন্তু হায়, কেন্দলনার লম্ফার খাতিরে প্রেমের প্রতিবোধিতায় অস্বাভাবিকভাবে নীরবে মানিয়া লইতে হয়।

ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রমাণ হইবে, মহেশ্বরের এই পাঠাশাস্যটি সবকারি বা বেসবকারি কোনো বিচালুদের কোনো নিষেধ মানিয়া চলে না।

হঠাৎ একদিন মহেশ্বর উপস্থিত নাট—সেই হুমোংগে আশা পাঠে মন দিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় কোথা হইতে মহেশ্বর আসিয়া চোপ টিপিয়া ধরিল, পরে তাহার বই কাড়িয়া লইল, কহিল, “নিহুঁর, আমি না থাকিলে তুমি আমার কথা ভাব না, পড়া লইয়া থাক ?”

আশা কহিল, “তুমি আমাকে মূৰ্খ করিয়া থাকিলে ?”

মহেশ্বর কহিল, “তোমার কথ্যে আমায়ই বা বিদ্যা এমনি কী মনসের হইতেছে।”

কথাটা আশাকে হঠাৎ বাজিল ; তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইবার উপক্রম করিয়া কহিল, “আমি তোমার পড়ায় কী বাধা দিয়াছি ।”

মহেন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া কহিল, “তুমি তাহার কী বুঝিবে । আমাকে ছাড়িয়া তুমি যত সহজে পড়া করিতে পার, তোমাকে ছাড়িয়া তত সহজে আমি আমার পড়া করিতে পারি না ।”

গুরুতর দোষারোপ । ইহার পরে স্বভাবতই শরৎের এক পদনার মতো এক দফা কান্নার সৃষ্টি হয় এবং অনতিকালমধ্যেই কেবল একটি মঙ্গল উজ্জলতা রাখিয়া সোহাগের স্বর্ধালোকে তাহা বিনীন হইয়া যায় ।

শিক্ষক যদি শিক্ষার সর্বপ্রধান অন্তরায় হন, তবে অবলা ছাত্রীর সাধ্য কী বিদ্যারণ্যের মধ্যে পথ করিয়া চল । মাকে মাকে মাসিমার তীব্র ভৎসনা মনে পড়িয়া চিত্ত বিচলিত হই—বুঝিতে পারে, লেখাপড়া একটা ছুতা মাত্র ; শাণ্ডীকে দেখিলে লজ্জায় মরিয়া যায় । কিন্তু শাণ্ডী তাহাকে কোনো কাজ করিতে বলেন না, কোনো উপদেশ দেন না ; অনাদিষ্ট হইয়া আশা শাণ্ডীর গৃহকর্মে সাহায্য করিতে গেলে, তিনি ব্যতুলমত হইয়া বলেন, “কর কী, কর কী, শোবার ঘরে যাও, তোমার পড়া কামাই যাইতেছে ।”

অবশেষে অল্পপূর্ণা আশাকে কহিলেন, “তোমার যা শিক্ষা হইতেছে সে তো দেখিতেছি, এখন মহিনকেও কি ডাক্তারি দিতে দিবি না ।”

তিনিয়া আশা মনকে খুব শঙ্ক করিল ; মহেন্দ্রকে বলিল, “তোমার এক্সামিনের পড়া হইতেছে না, যাও হইতে আমি নীচে মাসিমার ঘরে গিয়া থাকিব ।”

এ ব্যসে এত বড়ো কঠিন সন্ন্যাসব্রত ! শমনানয় হইতে একেবারে মাসিমার ঘরে আত্মনির্বাসন ! এই কঠোর প্রতিজ্ঞা উদ্ধারণ করিতে তাহার চোখের প্রান্তে জল আসিয়া পড়িল, তাহার অবাধ্য হৃদ অদৃষ্ট কাপিয়া উঠিল এবং কর্তব্যর ক্লেশপ্রায় হইয়া আসিল ।

মহেন্দ্র কহিল, “তবে তাই চলো, কালীর ঘরেই থাকিয়া থাক—কিছু তাহা হইলে তাহাকে উপরে আনানের ঘরে আশ্রিতে দিবে।”

মাণা এত বড়ো উদার গহ্বীর প্রভাবে পরিহাস প্রাপ্ত হইয়া হাস কহিল। মহেন্দ্র কহিল, “তার চেয়ে তুমি স্বয়ং গিন্ধারি আমাকে চোখে চোখে রাখিয়া পাহারা পাও, দেখা আমি একদা দিনের পড়া মুখ কবি কি না।”

অতি সহজেই সেট কথার গুরু হইল। চোখে চোখে পাহারার কার্য বিকল্প ভাবে নির্বাহ হইত, তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক। কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সে বঙ্গের মহেন্দ্র পরীক্ষার ফল করিল এবং চাকরপাঠের বিস্তারিত বর্ণনা সবেও পুরাতন সখকে আশার অনতিদূরত্ব দূর হইল না।

এইরূপ অপূর্ব পঠন-পাঠন-ব্যাপার যে সম্পূর্ণ নিবিড় সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। বিদারী নামে নামে আসিয়া অত্যন্ত গোল বাধাইয়া দিত। “মহিন্দ্র মহিন্দ্র” করিয়া সে পাড়া মাথা কহিয়া তুলিত। মহেন্দ্রকে তাহার পঠনপুস্তকের বিষয় চেষ্টে টানিয়া না বাধিত করিয়া সে কোনোমতেই ছাড়িত না। পড়ার শৈথিল্য করিতেছে বলিয়া সে মহেন্দ্রকে বিরত ভৎসনা করিত। “আশাকে বলিত “বটগান, গিলিয়া খাইলে হজর হয় না, চিবাইয়া খাইতে হয়। এখন সমস্ত অন্ন এক গ্রাসে গিলিতেছ, ইহার পরে হজরিত্ব গিলিয়া খাইবে না।”

মহেন্দ্র বলিত, “তুমি, ও কথা বলিয়া না—বিদারী আনানের হাংসি কহিতেছে।”

বিদারী বলিত, “হুগ বখন হোমার হাতেই আছে, তখন এমন করিয়া ভোগ করো যাহাতে পদের দিগ্গা না হয়।”

মহেন্দ্র উত্তর করিত, “পদের দিগ্গা পাইতে যে হুগ আছে। তুমি,

আর-একটু হইলেই আমি গর্ভভের মতো তোমাকে বিহারীর হাতে সমর্পণ করিতেছিলাম।”

বিহারী ব্রতবর্ণ হইয়া বলিয়া উঠিত, “চুপ!”

এই-সকল ব্যাপারে আশা মনে মনে বিহারীর উপরে ভারি বিরক্ত হইত। একসময় তাহার সহিত বিহারীর বিবাহ-প্রস্তাব হইয়াছিল বলিয়াই বিহারীর প্রতি তাহার একপ্রকার বিমুখভাব ছিল, বিহারী তাহা বুঝিত এবং মহেন্দ্র তাহা লইয়া আনন্দ করিত।

রাজলক্ষ্মী বিহারীকে ডাকিয়া দুঃখ করিতেন। বিহারী কহিত, “মা, পোকা যখন গুটি বাঁধে তখন তত বেশি ভয় নয়; কিন্তু যখন কাটিয়া উড়িয়া যায় তখন ফোনো শক্ত। কে মনে করিয়াছিল, ও তোমার বন্ধন এমন করিয়া কাটিবে।”

মহেন্দ্রের ফেল-করা সংবাদে রাজলক্ষ্মী গ্রীষ্মকালের আকস্মিক অগ্নি-কাণ্ডের মতো দাউদাউ করিয়া জলিয়া উঠিলেন, কিন্তু তাহার গর্ভন এবং মাহনটা সম্পূর্ণ ভোগ করিলেন অম্পূর্ণ। তাহার আহাননিরা দূর হইল।

৬

একদিন নববর্ষীয় বর্ণনমুখরিত বেলাজ্বর সায়াছে গায়ে একখানি সুবাসিত ফুলদুখে চাদর এবং গলায় একগাছি জুইফুলের গোড়ে মালা পরিয়া মহেন্দ্র আনন্দমনে শয়নগৃহে প্রবেশ করিল। হঠাৎ আশাকে বিন্দু চকিত করিবে বলিয়া ছুতার শব্দ করিল না। ঘরে উকি দিয়া দেখিল, পুন্ডিকের শোলা ডানালা দিয়া প্রবল বাতাস বৃষ্টির ছাঁট লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, বাতাসে দীপ নিবিড়া গেছে এবং আশা নীচের বিছানার উপরে পড়িয়া অব্যক্তদণ্ডে ঝুপিতেছে।

মহেন্দ্র দ্রুত পলে কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কী হইয়াছে।”

বালিকা বিড়গ্ন আবেগে ঝুপিয়া উঠিল। অনেক বয়স পরে মহেন্দ্র

কোন উত্তর পাইল যে মাগিনা আর স্তব্ধ করিতে না পারিয়া তাঁহার
পিসতুত ভাবের বাগায় চলিয়া গেলেন ।

মহেন্দ্র মাগিনা মনে করিল, 'গেলেন যদি, এমন বাস্তব সত্যটি
নাটি করিয়া গেলেন !'

শেষকালে সমস্ত বাগ মাতার উপরে পড়িল । তিনিই তো সব
অশান্তির মূল ।

মহেন্দ্র কহিল, "কাকী যেখানে গেলেন আমবাও সেখানে বাইব ।
সেই, না কাহাকে লইয়া অগড়া করেন ।"

বলিয়া অনাবশ্যক পোদগোল করিয়া ভিনিসপহ-বাধাবাদি মুটে-
ভাকাতাকি চক করিয়া দিল ।

বাসলমতী সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিলেন । ধীরে ধীরে মহেন্দ্রের কাছে
মাগিনা শাস্ত খবর দিচ্চায়া করিলেন, "কোথায় বাইতেছিস ।"

মহেন্দ্র প্রথমে কোনো উত্তর করিল না । ছই-তিনবার প্রহরের পর
উত্তর করিল, "কাকীর কাছে বাইব ।"

বাসলমতী কহিলেন, "তোমার কোথাও বাইতে হইবে না, আমিই
তোমার কাকীকে আনিয়া দিতেছি ।"

বলিয়া তৎক্ষণাত্ পালাকি চড়িয়া অন্নপূর্ণার বাগায় গেলেন । গলায়
কাপড় দিয়া গোড়হাত করিয়া কহিলেন, "প্রণব হও মেজবউ, আপ
মহো ।"

অন্নপূর্ণা শশব্যস্ত হইয়া বাসলমতীর পাবের দুলা লইয়া দাতার খবর
কহিলেন, "দাদি, কেন আমাকে অপরাধী করিতেছ ? তুমি কেন আমা
করিতে তাই করিব ।"

বাসলমতী কহিলেন, "তুমি চলিয়া আসিয়াছ বলিয়া আমার হেসে
বউ দর ছাড়িয়া আসিতেছে ।"

বলিতে বলিতে অতিবাস্তব রোমে বিছায়ে তিনি আঁরিয়া ফেলিলেন ।

তুই জা বাড়ি কিরিয়া আসিলেন। তখনও বৃষ্টি পড়িতেছে। অন্নপূর্ণা মহেন্দ্রের ঘরে যখন গেলেন তখন আশার রোদন শাস্ত হইয়াছে, এবং মহেন্দ্র নানা কথাই ছলে তাহাকে হাসাইবার চেষ্টা করিতেছে। লক্ষণ দেখিয়া বোধ হয়, বাদলার সন্ধ্যাটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ না যাইতেও পারে।

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “চুনি, তুই আমাকে ঘরেও থাকিতে দিবি না, অত্ন কোথাও গেলেও সঙ্গে লাগিবি? আমার কি কোথাও শান্তি নাই।”

আশা অকস্মাৎ বিদ্ধ মুগীর মতো চকিত হইয়া উঠিল।

মহেন্দ্র একান্ত বিরক্ত হইয়া কহিল, “কেন কাকী, চুনি তোমার কী করিয়াছে।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “বউনাহুকের এত বেহায়াপনা দেখিতে পারি না বলিয়াই চলিয়া গিয়াছিলাম, আবার শান্তডীকে বাদাইয়া কেন আমাকে ধরিয়া আনিল পোড়ারমুখী।”

জীবনের কবিত্ব-অধ্যায়ে মা-খুড়ী যে এমন বিষ, তাহা মহেন্দ্র জানিত না।

পরদিন রাজলক্ষ্মী বিহারীকে ডাকাইয়া কহিলেন, “বাছা, তুমি একবার মহিনকে বলো, অনেক দিন দেখে যাই নাই, আমি বারাগতে যাইতে চাই।”

বিহারী কহিল, “অনেক দিনই যখন যান নাই তখন আর নাই গেলেন। আচ্ছা, আমি মহিনদাকে বলিয়া দেপি, কিন্তু সে যে কিছুতেই রাগি হইবে, তা বোধ হয় না।”

মহেন্দ্র কহিল, “তা, জন্মস্থান দেখিতে ইচ্ছা হয় বটে। কিন্তু বেশি দিন তার সেখানে না থাকাই ভালো—দরবার সময় ছাদগাটা ভালো নয়।”

মহেন্দ্র মহজেই সম্মতি দিল যেখান বিহারী বিরক্ত হইল। কহিল, “না একলা যাইবেন, কে তাঁহাকে দেখিবে। ঘোঠানকেও সঙ্গে পাঠাইয়া দাও-না।”

বিনোদিনীর পরিচয় প্রথমেই দেওয়া হইয়াছে। এক সময়ে মহেন্দ্র এবং তন্মত্রেয় বিহারীর সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল। বিবিনিবন্ধে তাহার সহিত তাহার ভ্রূণবিবাহ হত, সে লোকটির সমস্ত অশুভিচ্ছিন্নের মধ্যে প্রীতাই ছিল সমালোচনা প্রবল। প্রীতার অতিভায়েই সে দীর্ঘ কাল জীবনধারণ করিতে পারিল না।

তাহার মৃত্যুর পর হইতে বিনোদিনী, ভগ্নলব্ধ মধ্যে একটিমাত্র উচ্চানন্দতার মধ্যে, নিম্নানন্দ পর্যায়ে মধ্যে দুঃখানন্দ ভাবে জীবনধারণ করিতেছিল। অতঃপর অন্যথা আসিয়া তাহার ব্রাহ্মলক্ষী-পিসুপাণ-ঠাকরুনকে ভক্তিভরে প্রণাম করিল এবং তাহার সেবার আত্মসমর্পণ করিয়া দিল।

সেবা টহাকেই বলে। মৃত্যুর চতুর্থাংশ নাই। কেমন পদিপাতি দাত, কেমন ব্রহ্মের দাতা, কেমন হুমিষ্ট কথাবার্তা।

ব্রাহ্মলক্ষী বলেন, "বেলা চাইল মা, তুমি দুটি খাও গে যাও।"

সে কি শোনে। পাখা করিয়া পিসিনাকে ধুম না পাড়াইয়া সে উঠে না।

ব্রাহ্মলক্ষী বলেন, "এমন করিলে যে তোমার অগ্রন্য করিলে, মা।"

বিনোদিনী নিঃশব্দে প্রতি নিবর্তিত হইয়া প্রকাশ করিয়া বলে, "মামাতার হৃদয়ের শব্দে অগ্রন্য করে না, পিসিনা। আচ্ছা, কত দিন পরে চন্দ্রকুমারে আসিয়াছে! এখানে কী আছে, কী জিনিস তোমাকে আশ্রয় করিয়া।"

বিহারী দুই দিনে পাড়ার কথা হইয়া উঠিল। কেহ তাহার কাছে ঘোলের ঐশ্বর্য, কেহ বা মোহন্যার পরামর্শ কইতে আসে। সেহ বা নিঃশব্দে ঘোলের কথা আসিলে কাণ দুটাইয়া নিজের মত প্রত্যয়ে করে, কেহ বা তাহার কাছে চন্দ্রকুমার সিংহাইয়া করে। মৃত্যুর তৎকালীন বৈশিষ্ট্য হইতে বাস্তবিকের আভিমানসহ পঞ্চ মনঃ সে তাহার মনোবৃত্ত

কৌতূহল এবং স্বাভাবিক দৃঢ়তা লইয়া যাতায়াত করিত—কেহ তাহাকে দূর মনে করিত না, অথচ সকলেই তাহাকে সম্মান করিত ।

বিনোদিনী এই অস্থানে-পতিত কলিকাতার ছেলেটির নির্বাসনদণ্ড যথাসাধ্য লঘু করিবার জন্য অন্তঃপুরের অন্তরাল হইতে চেষ্টা করিত । বিহারী প্রত্যেক বার পাড়া পর্যটন করিয়া আসিয়া দেখিত, কে তাহার ঘরটিকে প্রত্যেক বার পরিপাটি পরিচ্ছন্ন করিয়াছে, একটি বাঁসার গ্রাসে দু-চারটি ফুল এবং পাতার তোড়া সাজাইয়াছে এবং তাহার গদির এক ধারে বকিম ঃ দীনবন্ধুর গ্রন্থাবলী শুছাইয়া রাখিয়াছে । গ্রন্থের ভিতরের মলাটে মেয়েলি অথচ পাকা অংকে বিনোদিনীর নাম লেখা ।

পল্লীগ্রামের প্রচলিত আতিথ্যের সহিত ইহার একটু প্রভেদ ছিল । বিহারী তাহারই উল্লেখ করিয়া প্রশংসাবাদ করিলে রাজলক্ষ্মী কহিতেন, “এই মেয়েকে কিনা তোরা অগ্রাহ করিলি ।”

বিহারী হাসিয়া কহিত, “ভালো করি নাই না, ঠকিয়াছি । কিন্তু বিবাহ না করিয়া ঠকা ভালো, বিবাহ করিয়া ঠকিলেই নুশকিল ।”

রাজলক্ষ্মী কেবলই মনে করিতে লাগিলেন, “আহা, এই মেয়েই তো আমার বধূ হইতে পারিত । কেন হইল না !”

রাজলক্ষ্মী কলিকাতায় ফিরিবার প্রসঙ্গমাত্র উত্থাপন করিলে বিনোদিনীর চোখ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিত । সে বলিত, “পিসিমা, তুমি দুদিনের ভ্রম্ভে কেন এলে । যখন তোমাকে জানিতাম না, দিন তো এক যখন করিয়া কাটিত । এখন তোমাকে ছাড়িয়া কেনন করিয়া থাকিব ।”

রাজলক্ষ্মী মনের আবেগে বলিয়া ফেলিতেন, “না, তুই আমার ঘরের নউ হবি নে কেন, তা হইলে তোকে বুকের মধ্যে করিয়া রাখিতাম ।”

সে কথা শুনিয়া বিনোদিনী কোনো ছুতায় লজ্জায় সেধান হইতে উঠিয়া যাইত ।

কিন্তু তাহা কৌতুকরস নহে। বার বার কবিয়া পড়িতে পড়িতে তাহার
হৃদে চক্ষু মধ্যান্তের বাসুকার মতো জলিতে লাগিল, তাহার নিখাস
মস্তকুমির বাতাসের মতো উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।

মহেশ্বর কেনন, আশা কেনন, মহেশ্বর-আশার প্রথম কেনন, ইহাই
তাহার মনের মধ্যে কেবলই পাক খাইতে লাগিল। চিঠিখানা কোমের
উপর চাপিয়া ধরিয়া, পা ছড়াইয়া, চেহালের উপর হেলান দিয়া,
অনেকক্ষণ সম্মুখে চাহিয়া বসিয়া বহিল।

মহেশ্বরের সে চিঠি বিহারী আর খুঁজিয়া পাইল না।

সেইদিন মধ্যাহ্নে হঠাৎ অসুপূর্ণা আগিয়া উপস্থিত। ক্রাসংবাসের
আশঙ্কা কবিয়া রাজলক্ষীর বুকটা হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল। কোনো এক
কহিতে তিনি শান্ত করিলেন না, অসুপূর্ণার দিকে পাণ্ডুবর্ণমুখে চাহিয়া
বহিলেন।

অসুপূর্ণা কহিলেন, “দ্বিধি, কলিকাতার খবর সব ভালো।”

রাজলক্ষী কহিলেন, “তবে তুমি এখানে যে!”

অসুপূর্ণা কহিলেন, “দ্বিধি, তোমার যতকলার জার তুমি লওসে।
আমার আর সংসারে বন নাই। আমি কাণী বাঁচিব বলিয়া দ্বারা কবিয়া
যািব হইয়াছি। তাই তোমাকে প্রণাম কহিতে আসিলাম। জানে
অজ্ঞানে অনেক অপরাধ কহিয়াছি, মাগ করিছো। আর তোমার বট—”
(খলিতে বলিতে চোখ ডরিয়া উঠিয়া অল পড়িতে লাগিল) “সে
চেলেনাহু, তার আ নাই, সে বোম্বী হোক নির্দোষ হোক, সে তোমার।”

স্বাধ বলিতে পারিলেন না।

রাজলক্ষী তার হেঁচা তাহার আনাহাতের ব্যস্ততা কহিতে গেলেন।
বিহারী খবর পাঠিয়া দ্বাইখোতে চতীমণ্ডল হইতে ছুটিয়া আসিল।
অসুপূর্ণাকে প্রণাম কবিয়া কহিল, “শাকীনা, সে নি হু। আমাদের তুমি
নির্মম হইয়া গেলিয়া যাঁবে।”

অন্নপূর্ণা অশ্রু দমন করিয়া কহিলেন, “আমাকে আর কিরাইবার চেষ্টা করিস নে, বেহারি—তোরা সব স্বখে থাক, আমার ক্ষণে কিছুই আটকাইবে না।”

বিহারী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তার পরে কহিল, “মহেন্দ্রের ভাগ্য মন্দ, তোমাকে সে বিদায় করিয়া দিন।”

অন্নপূর্ণা চকিত হইয়া কহিলেন, “অমন কথা বলিস নে। আমি মহিনের উপর কিছুই রাগ করি নাই। আমি না গেলে সংসারের মন্দল হইবে না।”

বিহারী দূরের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। অন্নপূর্ণা অকল হইতে এক জোড়া মোটা সোনার বালা খুলিয়া কহিলেন, “বাবা, এই বালাজোড়া তুমি রাখো—বউমা যখন আসিবেন, আমার আশীর্বাদ দিয়া তাঁহাকে পরাইয়া দিয়ো।”

বিহারী বালাজোড়া মাথায় ঠেকাইয়া অশ্রুসম্বরণ করিতে পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

বিদায়কালে অন্নপূর্ণা কহিলেন, “বেহারি, আমার মহিনকে আর আমার আশাকে দেখিস।”

ব্রাহ্মলক্ষ্মীর হস্তে একখানি কাগজ দিয়া বলিলেন, “বস্তুরের সম্পত্তিতে আমার যে অংশ আছে, তাহা এই দানপত্রে মহেন্দ্রকে লিখিয়া দিলাম। আমাকে কেবল নামে নামে পনেরোটি করিয়া টাকা পাঠাইয়া দিয়ো।”

বলিয়া হুতলে পড়িয়া ব্রাহ্মলক্ষ্মীর পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইলেন এবং বিদায় হইয়া তীর্থোদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

৮

আশা কেনন ভয় পাইয়া গেল। এ কী হইল। না চলিয়া যান, মাসিনা চলিয়া যান। তাহাদের স্বপ্ন যেন সকলকেই তাড়াইতেছে, এবার যেন

তাড়াতাড়ি তাড়াইবার পালা। পবিত্রাঙ্ক শূত্র বৃহস্পতির নামধানে
সম্প্রদায়ের নতুন প্রেমসীমা তাহার কাছে কেমন অসংগত মৌলিক
লাগিল।

সংসারের কঠিন কর্তব্য হইতে প্রেমকে চূড়ান্ত মত্তা ছিঁড়িয়া বহু
কথিয়া গাইলে তাহা কেবল আপনার সঙ্গে আপনাকে সম্মিল্য রাখিতে
পারে না, তাহা ক্রমেই বিবৰ্ণ ও বিকৃত হইয়া আসে। আশাও মনে
মনে লেগিতে লাগিল, তাহারের অবিশ্রাম নিশ্চেষ্ট মত্তা একটা শ্রান্তি
ও দুর্বলতা আছে। সে দিনের মেন থাকিয়া থাকিয়া কেবলই দুষ্কৃত
পড়ে—সংসারের শূত্র ও প্রপঞ্চ আশ্রয়ের অভাবে তাহাকে টানিয়া থাকা
স্বাধাই কঠিন হইল। কামের মত্তাই প্রেমের মূল না থাকিলে, ভোগের
নিকাশ পরিপূর্ণ এবং স্বাধী হইয়া।

মহেশ্বর আপনার বিদ্যুৎ সংসারের বিকল্পে বিদ্রোহ করিয়া আপন
প্রেমোৎসবের সকল আতিথেয়্যাই একসঙ্গে আলাইয়া খুব সমাদরোহে
সদিত শূত্রবৃহদের অবলম্বনের মতো নিশ্চেষ্ট আনন্দ সমাধা করিতে চেষ্টা
করিল। আশার মনে সে একটুখানি খোঁজা চিয়াই করিল, “চুমি, তোমার
আশ্রয়াল কী হইয়াছে সত্যি সত্যি। আমি গেছেন, তা গাইয়া অমন মন
হাব করিয়া আছি কেন। আশারের চ-কনার ভালোবাসাতেই কি সকল
ভালোবাসাব অসম্ভব নয়।”

আশা ক্রুদ্ধিত হইয়া আনিত, “তবে তো আমার ভালোবাসায় একটা
কী অসম্পূর্ণতা আছে। আমি তো বাসিন্দা কথা প্রায়ই আদি, পাশ্চাতী
চলিয়া গেছেন বলিয়া তো আমার চ-ক হয়।”

তখন সে প্রাণপণে এই-সকল প্রেমের মলমল কালম করিতে চেষ্টা
করে।

এমন দুঃকর্ম ভাঙ্গা করিয়া চল না—চাকর-বাকরেরা তাকে মিত
আশ্রয় করিয়াছে। এখন কি অশ্রয় করিয়াছে বলিয়া আসিল না।

বান্ধনঠাকুর মদ পাইয়া নিরুদ্দেশ হইয়া বহিল। মহেন্দ্র আশাকে কহিল,
 “বেশ মজা হইয়াছে, আজ আমরা নিছেরা বন্ধনের কাছ সাঝিয়া লইব।”

মহেন্দ্র গাড়ি করিয়া নিউ মার্কেটে বাজার করিতে গেল। কোন
 জিনিসটা কী পরিমাণে দরকার, তাহা তাহার কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না—
 কতক গুলা বোঝা লইয়া আনন্দে ঘরে ফিরিয়া আসিল। সেগুলো লইয়া যে
 কী করিতে হইবে, আশাও তাহা ভালোরূপ জানে না। পরীক্ষায় বেলা
 দুটা-তিনটা হইয়া গেল এবং নানাবিধ অভূতপূর্ব অশান্ত উদ্ভাবন করিয়া
 মহেন্দ্র অত্যন্ত অমোদ বোধ করিল। আশা মহেন্দ্রের আনোদে যোগ
 দিতে পারিল না, আপন অজ্ঞতা ও অক্ষমতায় মনে মনে অত্যন্ত লজ্জা
 ও ক্ষোভ পাইল।

ঘরে ঘরে জিনিসপত্রের এমনি বিশৃঙ্খলা ঘটয়াছে যে, আবহকের
 সময়ে কোনো জিনিস খুঁজিয়া পাওয়াই কঠিন। মহেন্দ্রের চিকিৎসার অল্প
 একদিন তরকারি কুটিবার কার্যে নিযুক্ত হইয়া আর্বর্জনার মধ্যে অজ্ঞাতবাস
 গ্রহণ করিল এবং তাহার নোটের খাতা হাতপাখার অ্যাক্টিনি করিয়া
 রান্নাঘরের উদ্দেশ্য্যায় বিক্রাম করিতে লাগিল।

এই-সকল অভাৱনীয় ব্যবস্থা-বিপর্যয়ে মহেন্দ্রের কৌতূকের সীমা বহিল
 না, কিন্তু আশা ব্যথিত হইতে থাকিল। উচ্ছৃঙ্খল যথেষ্টাচারের স্রোতে
 সমস্ত ঘরকরা ভাসাইয়া হাশ্বনুখে ভাসিয়া চলা বালিকার কাছে
 দিভীদিকাভ্রমক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় দুই জনে ঢাকা-মাদানায় বিছানা করিয়া
 বসিয়াছে। সমুখে খোলা ছাদ। সূর্যের পরে কলিকাতার দিগন্তব্যাপী
 সৌধশিখরশ্রেণী স্রোত্ময় প্রাবিত। বাগান হইতে বান্ধনরূত ভিজা
 বকুল সংগ্রহ করিয়া আশা নতশিরে মালা গাঁথিতেছে। মহেন্দ্র তাহা
 লষ্টয়া টানাটানি করিয়া, বাধা ঘটাইয়া, প্রতিভুল সমালোচনা করিয়া
 অনর্থক একটা কলহ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্য্য করিতেছিল। আশা

এই-সকল অকাঙ্ক্ষা উৎখাৎ লইয়া তাহাকে ভৎসনা করিবার উপক্রম করিয়া নার নহেস্ত কোনো একটি কৃত্রিম উপায়ে আশার মূখ বন্ধ করিয়া শাসনব্যতী অকৃত্রিমই বিনাশ করিতেছিল।

এমন সময় প্রতিবেশীর বাড়ির গিরহের ন্যা হইতে পোয়া কোকিল হুহু করিয়া জাকিয়া উঠিল। তখনই নহেস্ত এবং আশা তাহাদের নাকার উপরে দোহলামান খাঁচার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। তাহাদের কোকিল প্রতিবেশী কোকিলের দৃষ্টান্তি কখনও নীরবে গহ করে নাই, আত সে ছবাব বেহ না কেন।

আশা উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিল, "পাখির আত কী হইল।"

নহেস্ত কহিল, "তোমার কণ্ঠ কুনিদা লক্ষ্যাবোধ করিতেছে।"

আশা সাহসের পরে কহিল, "না ঠাট্টা নহ, দেখো-না উহার কী হইয়াছে।"

নহেস্ত খাঁচা পাড়িয়া নামাইল। খাঁচার উপরের আশ্রয় খুনিদা লেগিল, পাখি নরিয়া সেড়ে। অকল্পণী ধাক্কাড়ার পর বেহারা ছুটি লইয়া গিয়াছিল, পাখিকে সেহ লেখে নাই।

দেখিতে লেগিলে আশার মূখ রান হইয়া গেল। তাহার আতুল চলিল না—তুল পড়িয়া রহিল। নহেস্তের মনে আশাত লাগিলেও, অকালে কসভার আশঙ্কায় বাশাওটা সে হাঙ্গিরা উচ্চাইবার চেষ্টা করিল। কহিল, "ভালোই হইয়াছে। আনি ভাকাবি করিতে খাইখায়, আর ওটা দৃষ্টান্তে লোমাকে ভালোইয়া মারিত।"

এই বলিয়া নহেস্ত আশাকে বাৎপালে বেতন করিয়া কাছে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল।

আশা আশে আশে আপনাকে ছাড়াইয়া লইয়া খেচল দৃষ্ট করিয়া বেহাওলা লেগিল। কহিল, "আত কেন। হি হি। কুখি গির মাণ, মন্থে জিয়াইয়া আনো সে।"

এমন সময় দোতলা হইতে “মহিন্দা মহিন্দা” রব উঠিল। “আরে কে হে, এসো এসো” বলিয়া মহেন্দ্র জবাব দিল। বিহারীর সাড়া পাইয়া মহেন্দ্রের চিত্ত উদ্ভুল হইয়া উঠিল। বিবাহের পর বিহারী মাঝে মাঝে তাহাদের স্বথের বাধাবরূপ আসিয়াছে—আজ সেই বাধাই স্বথের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইল।

আশাও বিহারীর আগমনে আশ্রয় বোধ করিল। মাথায় কাপড় দিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল দেখিয়া মহেন্দ্র কহিল, “বাও কোথায়। আর তো কেহ নয়, বিহারী আসিতেছে।”

আশা কহিল, “ঠাকুরপোয় জলখাবারের বন্দোবস্ত করিয়া দিই গে।”

একটা কিছু কর্ম করিবার উপলক্ষ্য আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে আশার অবসাদ কতকটা লঘু হইয়া গেল।

আশা শাশুড়ীর সংবাদ জানিবার জন্ত মাথায় কাপড় দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিহারীর সহিত এখনও সে কথা কয় না।

বিহারী প্রবেশ করিয়াই কহিল, “মা সর্বনাশ। কী কবিদের মারু-খানেই পা ফেলিলাম। ভয় নাই বোঠান, তুমি বোসো, আমি পালাই।”

আশা মহেন্দ্রের নুখে চাহিল। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, “বিহারী, মায় কী খবর।”

বিহারী কহিল, “মা-খুড়ীর কথা আজ কেন, ভাই। সে ঢের সময় আছে। Such a night was not made for sleep, nor for mothers and aunts!”

বলিয়া বিহারী ঘিরিতে উত্তত হইলে, মহেন্দ্র তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া আনিয়া বসাইল। বিহারী কহিল, “বোঠান, দেখো, আনার অপরাধ নাই—আনাকে জোর করিয়া আনিব—পাপ করিল মহিন্দা, তাহার অভিযোগটা আনার উপরে যেন না পড়ে।”

কোনো প্রণয় স্তিতে পারে না বলিয়াই এই-সব কথাই আশা অত্যন্ত বিবর্ত হয় ; বিহারী ইচ্ছা করিয়া তাহাকে আশ্বাসন করে ।

বিহারী কহিল, “বাড়ির ট্রী তো দেখিতেছি—বাকি এখনও জানাটবার কি সম্ভব হয় নাই ।”

মহেন্দ্র কহিল, “বিসম্বৎ । আমরা তো তাঁর তথ্যই অপেক্ষা করিয়া আছি ।”

বিহারী কহিল, “সেই কথাটি তাঁহাতে জানাইয়া পর নিশ্চিত হোনার সময়ে সময় লাগিলে, কিন্তু তাঁহার স্বপ্নের সীমা থাকিলে না । বোঠান, মহিন্দ্রকে সেই দু-মিনিট ছুটি নিতে হইবে, হোনার কাছে আমার এই আবেদন ।”

আশা রাগিয়া চলিয়া গেল—তাঁহার চোখ দিয়া ছল পড়িতে লাগিল ।

মহেন্দ্র কহিল, “কী শুভকস্মেই যে হোমাসের দেখা হইয়াছিল । বিচ্ছিন্নই যদি হইল না—কেবলই টুকটাক চলিতেছে ।”

বিহারী কহিল, “হোমাকে হোমার মা তো নষ্ট করিয়াছেন, আবার স্ত্রীও নষ্ট করিতে বসিয়াছে । সেইটে দেখিতে পারি না বলিয়াই সমস্ত পার্শ্বের দুই-এক কথা বলি ।”

মহেন্দ্র । তাহাতে ফল কী হয় ।

বিহারী । ফল হোমার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই হয় না, আমার সম্বন্ধে বিকিৎ হয় ।

১০

বিহারী নিম্নে বসিয়া মহেন্দ্রকে নিম্নে চিঠি লিখাইয়া গেল এবং সে চিঠি লইয়া পরদিনই দ্বারলক্ষীরে আনিয়া দিল । দ্বারলক্ষী কৃষ্ণকল, এ চিঠি বিহারীই লিখাইয়াছে—কিন্তু অল্প আবেগ থাকিলে পাঠ্যোক্ত না । শেষে বিহারীনিী কহিল ।

গৃহিণী ফিরিয়া আসিয়া গৃহের যেকোন দূরবস্থা দেখিলেন—সমস্ত অমার্জিত, মলিন, বিপর্যস্ত—ভাহাতে বধূর প্রতি তাঁহার মন আরও যেন বক্র হইয়া উঠিল।

কিন্তু বধূর এ কী পরিবর্তন। সে যে ছাযার মতো তাঁহার অহসরণ করে। আদেশ না পাইলেও তাঁহার কর্মে সহায়তা করিতে অগ্রসর হয়। তিনি শশব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠেন, “রাখো রাখো, ও তুমি নষ্ট করিয়া ফেলিবে। জ্ঞান না যে কাজ সে কাজে কেন হাত দেওয়া।”

রাজলক্ষ্মী স্থির করিলেন, অন্নপূর্ণা চলিয়া যাওয়াতেই বধূর এত উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু তিনি ভাবিলেন, ‘মহেন্দ্র মনে করিবে, খুড়ী যখন ছিল তখন বধূকে লইয়া আমি বেশ নিষ্কটকে স্থগে ছিলাম—আর মা আনিতেই আমার বিরহদুঃখ আরম্ভ হইল। ইহাতে অন্নপূর্ণা যে তাহার হিতৈষী এবং মা যে তাহার স্থগের অন্বেষণ, ইহাই প্রমাণ হইবে। কাজ কী।’

আজকাল দিনের বেলা মহেন্দ্র ডাকিয়া পাঠাইলে, নধু যাইতে ইতস্তত করিত—কিন্তু রাজলক্ষ্মী ভৎসনা করিয়া বলিতেন, “মহিন ডাকিতেছে, সে বুঝি আর কানে তুলিতে নাই? বেশি আদর পাইলে শেষকালে এমনই ঘটিয়া থাকে। যাও, তোমার আর তরকারিতে হাত দিতে হইবে না।”

আবার সেই স্টেট-পেন্সিল চাকুপাঠ লইয়া মিথ্যা খেলা। ভালো-বাসার অমূলক অভিযোগ লইয়া পরস্পরকে অপরাধী করা। উভয়ের মধ্যে কাহার গ্রেনের গজন বেশি, তাহা লইয়া বিনা যুক্তিমূলে তুড়ন তর্কবিতর্ক। বর্গার দিনকে রাত্রি করা এবং জ্যোৎস্নারাত্রিকে দিন করিয়া তোলা। শান্তি এবং অবসাদকে গায়ের জোরে দূর করিয়া দেওয়া। পরস্পরকে এমনি করিয়া অভ্যাস করা যে, মদ্র বধন অসাড় চিত্তে আনন্দ দিতেছে না তখনও বর্ণকালের দস্ত দিননপাশ হইতে নৃত্তি

ভয়াবহ মনে হয়—সংস্কারগুলি তথ্যসমূহ, অথচ কর্মীশ্রেণী দাঁড়িয়ে না
একই না। ভোগস্বাদের এই ভয়ংকর অভিশাপ যে, শ্রম অধিক মিল
পাচ্ছে না, কিন্তু বন্ধন চূড়ান্ত হয়ে যাচ্ছে।

এমন সময় বিনোদিনী একদিন আসিয়া আপনার গলা গুঁড়িয়ে বলিয়া
কহিল, “জাই, তোমার সৌভাগ্য চিরকাল অক্ষয় হোক, কিন্তু আমি
জানিনা বলিয়া কি আমার দিকে একবার তাকাতো না?”

আত্মীয়গৃহে বাসাকাল হইতে শরের মতো জালিত হইয়াছিল
বলিয়া, লোকসাধারণের নিকট আপার একপ্রকার আশ্চর্য কীর্তি ভাব
ছিল। হয় হইত, পাছে কেহ প্রত্যাখ্যান করে। বিনোদিনী যখন
তাহার জোড়া বুক ও তীব্র ধৃষ্ট, তাহার নির্মূলত্ব দুঃ ও নিঃশীল মৌল
মটো উপস্থিত হইল, তখন আপা অগ্রসর হইয়া তাহার পরিচয় লইতে
সাহস করিল না।

আপা সেহিল, শান্তী হারানবীর নিকট বিনোদিনীর কোনোপ্রকার
সংস্পর্শ নাই। বাসগৃহীও যেন আপাকে বিবেক করিয়া গুণাইয়া
বেখাইয়া বিনোদিনীকে বহমান জিতোছেন, সময়ে সময়ে আপাকে বিবেক
করিয়া গুণাইয়া গুণাইয়া বিনোদিনীর প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ হইয়া
উঠিতোছেন। আপা সেহিল, বিনোদিনী সবপ্রকার দুরত্বের অনিষ্ট—
প্রভু যেন তাহার পক্ষে নিত্যই সহজ, বহুবলিষ্ঠ—সংস্কারগণকে
কর্ম নিয়োগ করিতে, ভৎসনা করিতে ও আক্রমণ করিতে সে বেশমাত্র
কৃষ্টিত নহে। এই সময় সেহিল আপা বিনোদিনীর কাছে নিত্যক
নিত্যক ঘুর মনে করিল।

সেই সবকল্যাণিনী বিনোদিনী যখন অগ্রসর হইয়া আপার প্রায়
প্রাণনা করিল, তখন সংস্কারের সাধারণ প্রেরণাই বালিকার আত্ম
স্বাধীন প্রাপ্তি উৎসাহিত করিল। আত্মস্বাদের মারাত্মক মতো তাহার
পদধীরে এই নিম্নে অধুনিহ পদবির ও পুষ্টি হইয়া উঠিল।

আশা কহিল, “এসো ভাই, তোমার সঙ্গে একটা-কিছু পাতাই।”

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, “কী পাতাইবে।”

আশা গম্বাছল বকুলফুল প্রভৃতি অনেকগুলি ভালো ভালো দ্বিনিসের নাম করিল।

বিনোদিনী কহিল, “ও-সব পুরানো হইয়া গেছে ; আদরের নামের আর আদর নাই।”

আশা কহিল, “তোমার কোন্টা পছন্দ।”

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, “চোখের বালি।”

ঋতিনধুর নামের দিকেই আশার ঝোঁক ছিল, কিন্তু বিনোদিনীর পরামর্শে আদরের গালিটিই গ্রহণ করিল। বিনোদিনীর গলা ধরিয়া বলিল, “চোখের বালি।”

বলিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

১১

আশার পক্ষে মদিনীর বড়ো দরকার হইয়াছিল। ভালোবাসার উৎসবও কেবলমাত্র দুটি লোকের দ্বারা সম্পন্ন হয় না—স্বখালাপের মিষ্টান্ন বিতরণের জন্ত বাজে লোকের দরকার হয়।

কুণ্ঠিতহৃদয়া বিনোদিনীও নববধূর নবপ্রেমের ইতিহাস মাতামের জ্বালানয় মনের মতো কান পাতিয়া পান করিতে লাগিল। তাহার মস্তিষ্ক মাতিয়া শরীরের রক্ত জলিয়া উঠিল।

নিতরু মধ্যাহ্নে যা যখন ঘুমাইতেছেন, পাগলাসীরা এক তলার বিশ্রামশালায় অন্ধ, মহেশ্বর বিহারীর তাড়নার কণকালের জন্ত কালেছে গেছে এবং রৌদ্রতপ্ত নীলিনার শেষ প্রান্ত হইতে চিলের তীব্র কণ্ঠ অতিক্রম করে কদাচিত্ত শূন্য বাইতেছে, তখন নির্জন শয়নগৃহে নীচের বিজানার বালিশের উপর আশা তাহার খোলা চুল ছড়াইয়া শুইত

এক দিনাশিনী বুকব নীচে বালিশ টানিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া
 গুণ্‌গুণ-গুণ্‌গুণ করিবার মধ্যে আঁকিট হইয়া বহিত, তাহার কর্ণমূল
 আবদ্ধ হইয়া উঠিত, নিবাস বেগে প্রসারিত হইতে থাকিত ।

দিনাশিনী প্রে কথিয়া কথিয়া তুচ্ছতম কথাটি পর্য্যন্ত বাহিত করিত,
 এক কথা বার বার কথিয়া শুনিত, যটনা নিঃশেষ হইয়া গেলে কন্মনার
 অবতারণা করিত—কহিত, “আজ্ঞা হাই, যদি এমন হইত হো নী
 হইত, যদি এমন হইত হো নী করিত।” সেট-সকল অসম্ভাবিত
 কন্মনার পথে প্রথালোচনাকে স্থলীত করিয়া টানিয়া লইয়া চলিত
 আশাবঞ্চিত ভালা লাগিত ।

দিনাশিনী কহিত, “আজ্ঞা হাই চোখের আলি, হোর সঙ্গে যদি
 বিলাসীবাচুর বিবাহ হইত।”

আশা । না জাই, ও কথা তুমি বলিয়া না—ছি ছি, আমার মতা
 মতন করে । কির তোমার সঙ্গে হইলে বেশ হইত, তোমার সঙ্গে
 হো কথা হইতামি ।

দিনাশিনী । আমার সঙ্গে হো দেব লোকের দেব কথা হইয়াছিল ।
 না হইয়াছে, বেশ হইয়াছে—আমি বা আছি, বেশ আছি ।

আশা । তাহার প্রতিবাদ করে । দিনাশিনীর পক্ষা যে তাহার
 অবস্থার চেয়ে ভালো, ও কথা সে কখন কথিয়া শীকার করিলে ।

“একবার মনে করিয়া দেখো দেখি হাই আলি, যদি আমার আলীর
 সঙ্গে তোমার বিবাহ হইয়া হাটত । আর একটু চলেই হো হইত ।”

হা হো হইত । না হইল কেন । আলার হো বিহানা, এই খাট
 হো একদিন তাহারই গল্প অঙ্গনা কথিয়া ছিল । দিনাশিনী এই
 হাস্যকর শব্দমধুর শিখর চাহে, আর সে কথা ভিত্তরেই কুণ্ডিত
 পারে না । ও চাহে আর সে অতিশয়—আজ কাল পাইয়াছে, কাল
 আমার উঠিয়া থাকিতে হইবে ।

অপরাজে কিনোদিনী নিজে উদ্যোগী হইয়া অপরূপ নৈপুণ্যের সহিত আশার চুল বাঁধিয়া সাজাইয়া তাহাকে স্বামিসম্মিলনে পাঠাইয়া দিত। তাহার কল্লনা যেন অবগুষ্ঠিতা হইয়া এই সজ্জিতা বধূর পশ্চাৎ পশ্চাৎ নুগ্ন যুবকের অভিসারে জনহীন রূপে গমন করিত। আবার এক-একদিন কিছুতেই আশাকে ছাড়িয়া দিত না। বলিত, “আঃ, আর-একটু বোসোই-না। তোমার স্বামী তো পালাইতেছেন না। তিনি তো বনের মায়ায়ুগ নন, তিনি অঞ্চলের পোষা হরিণ।”

এই বলিয়া নানা ছলে ধরিয়া রাগিয়া দেপি করাইবার চেষ্টা করিত।

মহেন্দ্র অত্যন্ত রাগ করিয়া বলিত, “তোমার সখী যে নড়িবার নাম করেন না—তিনি বাড়ি ফিরিলেন কবে।”

আশা ব্যগ্র হইয়া বলিত, “না, তুমি আমার চোখের বালির উপর রাগ করিছো না। তুমি জান না, সে তোমার কথা শুনিতে কত ভালোবাসে—কত যত্ন করিয়া সাজাইয়া আমাকে তোমার কাছে পাঠাইয়া দেয়।”

রাজলক্ষ্মী আশাকে কাজ করিতে দিতেন না। কিনোদিনী বধূর পক্ষ লইয়া তাহাকে কাছে প্রবৃত্ত করাইল। প্রায় সবস্ত দিনই কিনোদিনীর কাছে আলস্ত নাই, সেই সঙ্গে আশাকেও সে আর ছুটি দিতে চায় না। কিনোদিনী পরে পরে এমনি কাজের শৃঙ্খল বানাইতেছিল যে, তাহার মধ্যে ঠাক পাওয়া আশার পক্ষে ভারি কঠিন হইয়া উঠিল। আশার স্বামী ছাদের উপরকার শূণ্য ঘরের কোণে বসিয়া আক্রোশে ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, ইহা কল্লনা করিয়া কিনোদিনী মনে মনে তীব্র কঠিন হাসি হাসিত। আশা উদ্‌বিগ্ন হইয়া বলিত, “এবার বাই ভাই চোখের বালি, তিনি আবার রাগ করিবেন।”

কিনোদিনী তাড়াতাড়ি বলিত, “বোসো, এইটুকু শেষ করিয়া যাও। আর বেশি দেপি হইবে না।”

মানিক বাপে আশা আশার চুইখুই করিয়া বলিয়া উঠিত, “না ভাই, এবার তিনি মত্ত মত্তই বাগ করিলেন—আমাকে ছাড়া, আমি ঘাই।”

দিনোদিনী বলিত, “আহা, একটু বাগ করিলই বা। মোহাম্মদের মত বাগ না বিশিলে ভালোবাসার খাব থাকে না—তবকাবিত্তে মজানবিত্তের মতো।”

কিছু মজানবিত্তের বাগটা যে কী, তাহা দিনোদিনীই বুঝিতেছিল—কেবল মগে তাহার তবকাবি ছিল না। তাহার শিষ্য শিষ্য যেন আগুন ধরিয়া গেল। সে যে চিলে চাদ, তাহার চোখে যেন সূন্যবর্ষণ হইতে থাকে।—‘এমন স্তম্ভের বহকরা! এমন মোহাম্মদের বামী! এ ঘরকে যে আমি বাগার বাবর, এ বামীকে যে আমি পাথের দাঁদ করিয়া রাখিতে পারিলাম। তখন কি এ ঘরের এই পলা, এ মাতৃঘর এই চিড়ি থাকিত। আমার মাদগায় কিনা এট কটি গুতি, এট খেলাব গুহুগ।’ (‘আশার গলা জড়াটয়া’) “ভাই চোখের বাসি, ফোলা-না ভাই, বাগ হোমামের কী কথা চৌল ভাই। আমি তোমাকে বাহা দিখাইয়া দিয়াছিলাম তাহা বলিয়াছিলে? হোমামের ভালোবাসার কথা শুনিলে অনিহি কথা হুকা থাকে না ভাই।”

১২

আবদুল একদিন বিকল হইয়া তাহার ঘরকে ডাকিয়া কহিল, “এ কি তোমার হইবে? শরের ঘরের দুইখী নিম্নাংকে আমিহা একটা গাছ বাগে করিগার মতগার কী। আমার হো হোমামের মত ভাই—কী আমি, ‘তখন কী মাতৃ হইবে পাথর।’”

আবদুল কহিলেন, “এ যে আমামের বিশিষ্টের বই, তাহাকে আমি হো শর পদে করি না।”

১৩

মহেন্দ্র কহিল, “না মা, ভালো হইতেছে না। আমার মতে উহাকে রাখা উচিত হয় না।”

রাজলক্ষ্মী বেশ ছানিতেন, মহেন্দ্রের মত অগ্রাহ্য করা সহজ নহে। তিনি বিহারীকে ডাকিয়া কহিলেন, “ও বেহানি, তুই একবার মহিনকে বুঝাইয়া বল। বিপিনের বউ আছে বলিয়াই এই বৃদ্ধবয়সে আমি একটু বিক্রম করিতে পাই। পর হউক বা হউক, আপন লোকের কাছ হইতে এমন সেবা তো কখনও পাই নাই।”

বিহারী রাজলক্ষ্মীকে কোনো উত্তর না করিয়া মহেন্দ্রের কাছে গেল—কহিল, “মহিনমা, বিনোদিনীর কথা কিছু ভাবিতেছ?”

মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, “ভাবিয়া রাগে ঘুম হয় না। তোমার বোঠানকে দ্বিজ্ঞাসা করো-না, আম্রকাল বিনোদিনীর ধ্যানে আমার আর-সকল ধ্যানই ভঙ্গ হইয়াছে।”

আশা ঘোমটার ভিতর হইতে মহেন্দ্রকে নীরবে তর্জন করিল।

বিহারী কহিল, “বল কী। দ্বিতীয় বিষয়ক।”

মহেন্দ্র। ঠিক তাই। এখন উহাকে বিদায় করিবার জন্ত চুনি ছটফট করিতেছে।

ঘোমটার ভিতর হইতে আশার দুই চক্ষু আবার ভংগনা বর্ষণ করিল।

বিহারী কহিল, “বিদায় করিলেও ফিরিতে কতক্ষণ। বিদায় বিবাহ দিয়া দাও—বিদায় একেবারে ভাঙিবে।”

মহেন্দ্র। সুন্দরও তো বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল।

বিহারী কহিল, “খাস, ও উপমাটা এখন রাখো। বিনোদিনীর কথা আমি মাঝে মাঝে ভাবি। তোমার এখানে উনি তো চিরদিন থাকিতে পারেন না। তাহার পরে, যে বন বেছিরা আসিয়াছি সেখানে উহাকে যাবজ্জীবন বনবাসে পাঠানো, সেও বড় কঠিন হুঁ।”

মহাজ্ঞানী মহাপ্রভু এ পর্যন্ত বিনোদিনী ব্যক্তি হ'ল না, কিন্তু বিদ্যাপী
তাহাকে লেখিয়েছে। বিদ্যাপী এঁকে বুঝিয়েছে, এ নারী অত্যন্ত মেলিয়া
বাহিয়ার নর। কিন্তু শিখা এক সালে ঘরের প্রাণীপত্তন হ'ল, যা-এক
সালে ঘরে আসেন পরাইয়া দে—সে মাগড়াও বিদ্যাপীর মনে ছিল।

মহাজ্ঞানী বিদ্যাপীকে এঁকে কথা কইয়া অনেক পরিচয় করিল। বিদ্যাপীও
তাঁহার মতামত গিল। কিন্তু তাহার মন বুদ্ধিমান, এ নারী যেমত
করিবার নর, ইহাকে উল্লেখ করিয়া দায় না।

মহাপ্রভু বিনোদিনীকে সাবধান করিয়া গেলেন। কহিলেন, "সেখা
বাহা, পট্টক কইয়া তুমি অহ তাঁলাগিনি কহিয়ে না। তুমি পাড়াগায়ে
পুংস-গায়ের চিত্ত—আত্মকামের চ'ল চ'লন ত'ল না। তুমি বুঝিয়ে
'ভালো করিয়া বুঝিয়া চলিছ।'"

ইহার পর বিনোদিনী অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসে আপনাকে ঘুরে ঘুরে
বাহিয়া। কহিল, "আমি ভাই কে। আমার বাহা অদ্বৈত লোক আপন
মান গাড়াইয়া চলিছে না জানিলে, কোন্ মিন দী গটে, বাস দায় বি।"

আশা সাধনাদি কাহালাগি করিয়া নর-বিনোদিনী বৃদ্ধপ্রিয়।
মহাপ্রভু তাহার আশা আকর্ষণ করিয়া উঠিল, কিন্তু বিনোদিনী আমন
গিল না।

এ মিকে মহাজ্ঞানী সাবধান দিলেন যে তাহার ঘর ঘুরে ঘুরে
জানিয়ে আনুহ হইয়া অস্বাভাবিক। পূর্বে যে-কোন অস্বাভাবিকতা
আজ্ঞার দ্বারা কৌতুকজনক হইত, এখন তাহা অস্বাভাবিক
কীভবন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আশার সাংসারিক অপটুতায় সে
আশা পূর্বে বিচল হ'ল, কিন্তু প্রকৃত করিয়া গেল না। প্রকৃত না করিলে
আশা অস্বাভাবিক হইয়া কহিয়াছে, নিরর্থক হইয়া গেলেন মহাপ্রভু
হ'ল হইয়া বাইয়াছে। মহাপ্রভু কোহায়ে মহাপ্রভু জাগ্রতচিত্ত—
কহিয়া দিখায় পাড়াগায়ে, কহিয়া আত্মপ্রকাশ।

এ সময়ে পলায়ন ছাড়া পরিজ্ঞান নাই, বিচ্ছেদ ছাড়া ঔষধ নাই। শ্রীলোকের স্বভাবসিদ্ধ সংস্কারবশে আশা আত্মকাল মহেন্দ্রকে ফেলিয়া যাইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু বিনোদিনী ছাড়া তাহার যাইবার স্থান কোথায়।

মহেন্দ্র প্রণয়ের উত্তপ্ত বাসবশস্যার মধ্যে চক্ষু উন্মীলন করিয়া ধীরে ধীরে সংসারের কাছকর্ম পড়াশনার প্রতি একটু সজাগ হইয়া পাশ ফিরিল। ডাক্তারি বইগুলোকে নানা অসম্ভব স্থান হইতে উদ্ধার করিয়া ধূলি ঝাড়িতে লাগিল এবং চাপকান প্যাণ্টালুন কয়টা রৌদ্রে দিবার উপক্রম করিল।

১৩

বিনোদিনী যখন নিতান্তই ধরা দিল না তখন আশার মাথায় একটা ফন্দি আসিল। সে বিনোদিনীকে কহিল, “ভাই বালি, তুমি আমার স্বামীর সম্মুখে বাহির হও না কেন। পালাইয়া বেড়াও কী জন্ত।”

বিনোদিনী অতি সংক্ষেপে এবং সতেজে উত্তর করিল, “ছি ছি!”

আশা কহিল, “কেন। মার কাছে শুনিয়াছি, তুমি তো আমাদের পর নও।”

বিনোদিনী গম্ভীরনুখে কহিল, “সংসারে আপন-পর কেহই নাই। যে আপন মনে করে সেই আপন—যে পর বলিয়া জানে সে আপন হইলেও পর।”

আশা মনে মনে ভাবিল, এ কথাই তার উত্তর নাই। বাস্তবিকই তাহার স্বামী বিনোদিনীর প্রতি অত্যাচার করেন, বাস্তবিকই তাহাকে পর ভাবেন এবং তাহার প্রতি অকাব্যে বিরক্ত হন।

গেটিন সন্ধ্যাবেলায় আশা স্বামীকে অত্যন্ত আবশ্যক করিয়া ধরিল, “স্বামীর চোখের বালির সঙ্গে তোমাকে আলোপ করিতে হইবে।”

মহেশ্ব হামিয়া করিল, “তোমার সাহস তো কম নয়।”

আশা হিজলী করিল, “কেন, ভয় কিসের।”

মহেশ্ব। তোমার সখীর যেসকল রূপের বর্ণনা শুধ, সে তো কল
নিয়োগে ভাবনা নয়।

আশা করিল, “আজ্ঞা, সে আমি সামলাইতে পারিব। তুমি ঠিক
বাখিয়া দাও—তার সঙ্গে আশাপ করিয়ে কি না যোগ্য।”

বিনোদিনীকে দেখিলে বলিয়া মহেশ্বের যে কোহুৎস ছিল না, তাহা
নহে। এমনকি, আশকাল তাহাকে দেখিবার বহু রাতে রাতে আগ্রহ
যয়ে। সেই অনাবশ্যক আগ্রহে তাহার নিজের কাছ উচিত বলিয়া
ঠেকে নাট।

হৃদয়ের সম্পর্ক সখ্যে মহেশ্বের উচিত-অচিহ্নের আশ্রয় সাধনায়
অপেক্ষা কিছু করা। পাছে মাতার অবিকার দেখনার দ্বারা হে, এইটুকু
ইতিপূর্বে সে বিবাহের প্রসবনার সনে আশ্রিত না। আশকাল, আশার
সচিত্র সখ্যকে সে এমনভাবে বলা করিতে চাহ যে, অত স্বীকারের
প্রতি সমাজ কোহুৎসকে সে মনে স্থান দিতে চাহ না। প্রেমের বিবাহ
সে যে বড়ো পুঁথুতে এক অত্যাশ্রয়ী, এটুকু তাহার মনে যেটা
থাক ছিল। এমনকি, বিবাহের সে বহু বলিত বলিয়া অত কাচাকে
বহু বলিয়া প্রকাশ করিতেই চাহিত না। অত সেরে যদি তাহার মিত্র
কাচকে ইটো আশ্রিত, তবে মহেশ্ব যেন তাহাকে সাথে পড়িয়া উপকার
দেখাইত, এক বিবাহের নিমিত্ত সেই হৃদয়কে সখ্যে উপহারদাতার
অবস্থা প্রকাশ করিয়া ইতরসংসারের প্রতি নিমেষে একান্ত বিন্দীত
দেখা করিত। বিবাহী ইবাহের আশ্রিত করিলে মহেশ্ব করিলে, “তুমি
পাছ দিয়ারী, যেখানে বর্ণ প্রকাশের বহু প্রকাশ কর না, আমি নিম
বাহে সখ্যে বহু বলিয়া উপহারিত করিতে পারি না।”

সেই মহেশ্বের মন আশকাল হৃদয় হৃদয় হৃদয় অশ্রিত কাচকে, এ

কৌতূহলের সহিত এই অপরিচিতার প্রতি আপনি ধাবিত হইতে থাকিত তখন সে নিজের আদর্শের কাছে যেন থাটো হইয়া পড়িত। অবশেষে বিরক্ত হইয়া বিনোদিনীকে বাটী হইতে বিদায় করিয়া দিবার ক্ষণ সে তাহার নাকে পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করিল।

মহেন্দ্র কহিল, “থাক্ চুনি। তোমাব চোখেব বালির সঙ্গে আলাপ করিবার সময় কই। পড়িবার সময় ডাক্তারি বই পড়িব, অবকাশের সময় তুমি আছ, ইহার মধ্যে সখীকে কোথায় আনিবে।”

আশা কহিল, “আচ্ছা, তোমার ডাক্তারিতে ভাগ বসাইব না, আমারই অংশ আমি বালিকে দিব।”

মহেন্দ্র কহিল, “তুমি তো দিবে, আমি দিতে দিব কেন।”

আশা যে বিনোদিনীকে ভালোবাসিতে পারে, মহেন্দ্র বলে, ইহাতে তাহার স্বামীব প্রতি প্রেমের গর্বতা প্রতিপন্ন হয়। মহেন্দ্র অহংকার করিয়া বলিত, ‘আমার মতো অনন্তনিষ্ঠ প্রেম তোমার নহে।’ আশা তাহা কিছুতেই মানিত না—ইহা লইয়া ঝগড়া করিত, কাঁদিত, কিন্তু তর্কে জিতিতে পারিত না।

মহেন্দ্র তাহাদের ছুজনের মাঝখানে বিনোদিনীকে দৃঢ়তা স্বান ছাড়িয়া দিতে চায় না, ইহাই তাহার গর্বের বিষয় হইয়া উঠিল। মহেন্দ্রের এই গর্ব আশার সহ্য হইত না, কিন্তু আজ সে পরাভব স্বীকার করিয়া কহিল, “আচ্ছা বেশ, আমার পাতিবেই তুমি আমার বালির সঙ্গে আলাপ করো।”

আশার নিকট মহেন্দ্র নিজের ভালোবাসার দৃঢ়তা ও শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিয়া অবশেষে বিনোদিনীর সঙ্গে আলাপ করিবার ক্ষণ অহংগ্রহপূর্বক রাগি হইল। বলিয়া রাগিল, “কিন্তু তাই বলিয়া যখন-তখন উৎপাত করিলে বাচিব না।”

পরদিন প্রত্যুষে, বিনোদিনীকে আশা তাহার বিছানায় গিয়া অড়াইয়া

ବିନାଶିନୀ କହିଲା, “ଏ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ! ଚାକାରୀ ସେ ଆମ ଟାଏକ
ଢାଳିଲା ଯେତେବେଳେ ।”

ଆମା କହିଲା, “ହୋମାର ଏ-ସବୁ ବରିହାସ ବଦା ଆମାର ଆମେ ନା
କଟି, କେନ ଦେନା-ଦେନେ ହୁଜା ଚଢ଼ାମୋ । ସେ ହୋମାର ବଦାର ମଦାଏ ମିତେ
ମାହିଲ, ଏକଦାର ଆହାର କାତେ ବଦା ଦେନା-ଏକେ ।”

ବିନାଶିନୀ କହିଲା, “ସେ ବନ୍ଧିକ କୋକଟି କେ ।”

ଆମା କହିଲା, “ହୋମାର ଦେବେ, ଆମାର ସାମି । ନା ଛାଟି, ମାମି ନା—
ତିନି ହୋମାର ବଦ ଆମାମ କବିହାର ଚକ୍ତ ମିଜାମିଜି କବିହାତେନ ।”

ବିନାଶିନୀ ଗଲେ ଗଲେ କହିଲା, “ହୋମାର ଆମାର ଶ୍ରାନ୍ତି ଓଷା
ମଜିହାତେ, ଆମି ନମିମି ହୁଜା ମାଟିନ, ଆମାକେ ହେନେ ମାଟି ନାହିଁ ।”

ବିନାଶିନୀ କୋଳେକୋଳି ବାରି ହୋଇଲା । ଆମା ହେନେ ସାମି
ମାଟି ବଦା ବଢ଼ିବି ହୋଇଲା ।

ଆମେ ଗଲେ ଗଲେ ବଦା ବାମ କହିଲା । ଆହାର ବାଟେ ବାହିବ ଦୈବ
ଆମାକି ! ଆମାକେ ଅଳ୍ପ ଆହାର ମୁକାବେଲେ ହୋଇ ଗଲେ ବଦା ! ଆମେ-ବଦା
ହୋଇ ହୋଇ ଏକ ମିନେ ବଢ଼ିବି ହୋଇଲା ନାମା ଦୈବେ ବିନାଶିନୀର ବଦ
ଦେନା-ଦେନା ଆମାମ-ମଜିହାତେ କବିହାତେ । ଆମେ ସେ ଆହାର ଶ୍ରୋମାହାର ବଦ
ନାହିଁ, ହୋମାକି କି ବିନାଶିନୀ ଆହାର ମଜିହାତେ ମାଟି ନାହିଁ ! ବିନାଶିନୀ
ସମି ଏକଦାର ହୁଜା କବିହାତେ ବଦା ହୋଇ ଅଳ୍ପ ମୁକାବେଲେ ଆମେ-ବଦା
ବଢ଼ିବି ମାଟି ।

ବିନାଶିନୀ ଏକ ମିନେ ବଢ଼ିବି ଆମେ-ବଦା କବିହାତେ ଗଲେ ଗଲେ ବିନାଶିନୀ,
ଆମେ ବଦା ମଜିହାତେ ଆମି, ଆମେ-ବଦା ସେ ଏକଦାର ଆମାକେ କେବିହାତେ ଦୈବେ
ବଦା ନା । ବଦା ମଜିହାତେ ବଦା ବାଟି ବଦା ଦେନା ହୁଜା କବିହାତେ ସେ ବଦା
ବଦା ଆମେ ନା । ଏକ ଦୈବେ ବିନାଶିନୀ । ଆମି କି ବଢ଼ିବି ମାଟି ! ଆମି କି
ବଦା ନା ! ଆମି କି ଦୈବେ ନା ! ଏକଦାର ବି ଆମାକେ ବଢ଼ିବି ମାଟି ।
ବଦା ଆମେ-ବଦା ବଢ଼ିବି ବଦା ବିନାଶିନୀର ବଦା ବଢ଼ିବି ମାଟି ।

আশা খানীর কাছে প্রস্তাব করিল, “তুমি কালেক্সে গেছ বলিয়া চোখের বালিকে আমাদের ঘরে আনিব, তাহার পরে বাহির হইতে তুমি হঠাৎ আনিয়া পড়িবে—তা হইলেই সে জন্ম হইবে।”

মহেন্দ্র কহিল, “কী অপরাধে তাহাকে এত কাজ কঠিন শাসনের আঘোড়ন।”

আশা কহিল, “না, সত্যই আমার ভারি রাগ হইয়াছে। তোমার সঙ্গে দেখা করিতে ও তার আপত্তি! প্রতিজ্ঞা ভাঙিব তবে ছাড়িব।”

মহেন্দ্র কহিল, “তোমার প্রিয়সখীর দর্শনাত্মক আমি মনিয়া দাইতেছি না। আমি অমন চুরি করিয়া দেখা করিতে চাই না।”

আশা শান্তনয়ে মহেন্দ্রের হাত ধরিয়া কহিল, “নাথ! থাও, একটি বার তোমাকে এ কাজ করিতেই হইবে। একবার যে করিয়া হোক, তাহার গুমর ভাঙিতে চাই, তার পর তোমাদের যেমন ইচ্ছা তাই করিবে।”

মহেন্দ্র নিরুত্তর হইয়া রহিল। আশা কহিল, “লক্ষীটি, আমার অন্তরোধ রাখো।”

মহেন্দ্রের আগ্রহ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল—সেইদ্রব্য অতিরিক্ত মাত্রায় ঐদামীয় প্রকাশ করিয়া সম্মতি দিল।

শরৎকালের বহু নিমগ্ন নথ্যাফে বিনোদিনী মহেন্দ্রের নির্জন শয়ন-গৃহে বসিয়া আশাকে কার্পেটের ছতা বুনিতে শিখাইতেছিল। আশা অত্যন্তনন্দ হইয়া ঘন ঘন স্বরের নিকে চাহিয়া গগনায় ভুল করিয়া বিনোদিনীর নিকট নিজের অসাধ্য অপটুত্ব প্রকাশ করিতেছিল।

অবশেষে বিনোদিনী বিরক্ত হইয়া তাহার হাত হইতে কার্পেট টান দিয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, “ও তোমার হইবে না, আমার কাজ আছে, আমি দাই।”

আশা কহিল, “আর-একটু বোসো, এবার লেখো, আমি ভুল করিব না।”

କଳିକା ଆଦର ଶେଷେ ଯିବା ପଡ଼ିଲା ।

ବିଲୋଚିତ୍ରା ମିଳନ ପରେ ବିଲୋଚିତ୍ରାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯାଏର ମିଳନେ ଯାଏର
କାଳିକା ଯାଏର । ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଯିବା ନା ହୁଏନା ଆଜି ଯାଏର
କାଳିକା ଯାଏର ।

ବିଲୋଚିତ୍ରା କହିଲା, "ହୋଇ ଯାଏର କଥା କି କଥା କହିଲୁ ।"

ଆଜି ଆଜି ଯାଏର ପାରିଲ ନା । ଉତ୍ତରରେ ଯାଏର ଉଦ୍ଧାର କାଳିକା
ବିଲୋଚିତ୍ରାଙ୍କ ଯାଏର ଉଦ୍ଧାର ଯାଏର ବିଲୋଚିତ୍ରା କହିଲା, "କା କାଳିକା ଯାଏର
କାଳିକା ଯାଏର ।"

କଳିକା ବିଲୋଚିତ୍ରାଙ୍କ ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ।

କଳିକା ଯାଏର ବିଲୋଚିତ୍ରାଙ୍କ ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ।
କଳିକା ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ।
କଳିକା ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ।
କଳିକା ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ।

କଳିକା ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ।
କଳିକା ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ।

କଳିକା ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ।
କଳିକା ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ।

କଳିକା ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ।
କଳିକା ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ।

କଳିକା ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ।
କଳିକା ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ।
କଳିକା ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ।
କଳିକା ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ।

କଳିକା ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ।
କଳିକା ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ଯାଏର ।

বিনোদিনী কহিল, “সে অভিষাপকে আমি ভয় করি না। বেননা আপনার অনেক ক্ষণ খুব বেশি ক্ষণ হইবে না। বোধ হয়, সময় উত্তীর্ণ হইয়া আসিল।”

বলিয়া আবার সে উঠিবার চেষ্টা করিল। আশা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, “মাথা থাও, আর-একটু বোসো।”

১৪

আশা জিজ্ঞাসা করিল, “সত্য করিয়া বলো, আমার চোখের বালিকে কেমন লাগিল।”

মহেন্দ্র কহিল, “মন্দ নয়।”

আশা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া কহিল, “তোমার বাউকে আর পছন্দই হয় না।”

মহেন্দ্র : কেবল একটি লোক ছাড়া।

আশা কহিল, “আচ্ছা, ওর সঙ্গে আর-একটু ভালো করিয়া আলাপ হউক, তার পরে বুঝিব, পছন্দ হয় কি না।”

মহেন্দ্র কহিল, “আবার আলাপ! এখন বুঝি বন্ধাবরই এমনি চলিবে।”

আশা কহিল, “ভ্রত্নতার খাতিবেও তো মাথাসের সঙ্গে আলাপ করিতে হয়। একদিন পরিচয়ের পরেই যদি দেখাশুনা বন্ধ কর তবে চোখের বালি কী মনে করিবে নলো দোষ। তোমার কিন্তু সকলই আশ্চর্য। আর-কেউ হইলে এমন মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিবার স্বত্ত্ব নাথিয়া বেড়াইত; তোমার যেন একটা মস্ত বিপদ উপস্থিত হইল।”

মহা লোকের সঙ্গে তাহার এই প্রভেদের কথা শুনিয়া মহেন্দ্র ভারি খুশি হইল। কহিল, “আচ্ছা, বেশ তো। ব্যস্ত হইবার দরকার কী। আমার তো পালাইবার স্থান নাই, তোমার সখীদ্রও পালাইবার তাড়া

ଦେଖିଲା--ପ୍ରହରୀୟ ଲୋକା ନାମେ ନାମେ ହେଉଥିବେ, ଏବଂ ଲୋକା ହେଲେ ଲୋକା
ସଦା ଚାଲିବ, ଯୋଗୀର ବାଣୀର ଶେଷକୁ ନିଜା ଅଟକି ।

ନାହୁଁ ନାମ ସ୍ଥିର ଚାଲିବା ବାଧ୍ୟତାହୀନ, ଦିନୋଦିନୀ ଏବଂ ହେଉ
କୋଳୋ-ନା-କୋଳୋ ଛୁଆର ଲୋକା ଶିଖିବେ । ଦୁଇ ବୃତ୍ତିବାଦିନୀ । ଦିନୋଦିନୀ
କାହା ଲିପାଏ ବାଧିଲା, ଲେଖାଏ ବାଧ୍ୟତାହୀନର ସାଥେ ଲୋକା ହେଲା ।

ନାହୁଁ ବିଜୁନାଥ ବାହାଡ଼ା ପ୍ରକାଶ ହେଉଥିବା ହେଉଥିବା ଦିନୋଦିନୀର ପ୍ରକାଶ
ହେଉ ନାମେ ଉପାସନ କରିବେ ନାମେ ନାମେ ନାମେ ଦିନୋଦିନୀର
ନକ୍ସାବଦ୍ଧର ପ୍ରକାଶ ବାହାଡ଼ା ନାମେ ଉପାସନ ଏ ଲୋକା ଚାଲିବ
ନିଜା ନାହୁଁବିବା ବାହାଡ଼ା ଅଟକିବେ ଲୋକା ଉପାସନ ଏ ଲୋକା । ନାହୁଁବିବା
ଦିନୋଦିନୀର ଲୋକା ଲୋକା ଅଟକିବେ ଲୋକା ଉପାସନ ଏ ଲୋକା ।

ଦିନୋଦିନୀର ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା
ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା
ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା

ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା
ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା
ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା

ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା
ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା

ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା
ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା

ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା
ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା

ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା
ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା ଲୋକା

মহেন্দ্র কহিল, “দেখো তো ভাই, কুম্ভিনী না প্রমোদিনী না কার সঙ্গে তোমার বোঠান চুলের দড়ি না মাছের কাঁটা না কী-একটা পাতাইয়াছেন, কিন্তু আমাকে তাই বলিয়া তাঁর সঙ্গে চুরোটের ছাই কিংবা দেশলাইয়ের কাঠি পাতাইতে হইবে, এ হইলে তো বাঁচা যায় না।”

আশার ঘোমটার মধ্যে নীরবে ভুন্নল কলহ ঘনাইয়া উঠিল। বিহারী ক্ষণকাল নিরুত্তরে মহেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল; কহিল, “বোঠান, লক্ষণ ভালো নয়। এ-সব ভোলাইবার কথা। তোমার চোখের বালিকে আমি দেখিয়াছি। আরও যদি ঘন ঘন দেখিতে পাই, তবে সেটাকে ছুঁটনা বলিয়া নম্নে করিব না, সে আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি। কিন্তু মহিন্দ্র! যখন এত করিয়া বেকবুল যাইতেছেন তখন বড়ো সন্দেহের কথা।”

মহেন্দ্রের সঙ্গে বিহারীর যে অনেক প্রভেদ, আশা তাহার আর-একটি প্রমাণ পাইল।

হঠাৎ মহেন্দ্রের ফোটোগ্রাফ-অভ্যাসের পথ চাপিল। পূর্বে সে একবার ফোটোগ্রাফি শিখিতে আরম্ভ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। এখন আবার ক্যামেরা মেয়ামত করিয়া, আরক কিনিয়া, ছবি তুলিতে শুরু করিল। বাড়ির চাকর-বেহারাদের পর্বস্ব ছবি তুলিতে লাগিল।

আশা ধরিয়া পড়িল, চোখের বালির একটা ছবি লইতেই হইবে।

মহেন্দ্র অত্যন্ত সংশ্লিপ্ত বলিল, “হ্যাঁজা।”

চোখের বালি তদপেক্ষা সংশ্লিপ্ত বলিল, “না।”

আশাকে আবার একটা কৌশল করিতে হইল এবং সে কৌশল গোড়া হইতেই দিনাদিনীর অগোচর রহিল না।

বঙ্গব এই হইল, মধ্যাহ্নে আশা তাহাকে নিজের শোবার ঘরে অনিয়া কোনোমতে ঘুম পাড়াইবে এবং মহেন্দ্র সেই অবস্থায় ছবি তুলিয়া অব্যাহত সমীপে উপভুক্তরূপে ছবি করিবে।

"ଆନ୍ତର୍ବ ଏହି, ମିଳାମିଳି ଶୋଭାମାନ ମିଳେ କେବଳ ଦୁନାମ ନା । ବିଷ
 ଯାହାର ଘର ଆସିଲା କେବଳ ତାହାର ଘୋର ଚୁମିତା ଗଢିଲ । ଘାତ ଏହାମାନି
 କାଳ ନାମ ନିଆ, ଘୋରା ଜୀନାମାୟ ବିଷେ ହୁଏ କବିତା, ହାତେ ନାଦା ହାସିତା,
 ଏହିମି ହସ୍ତେ ଅବିଷ୍ଟେ ଦୁନାମିତା ଗଢିଲ ସେ ଗହସ୍ତ କବିତା, "ମିଳେ ହେଉ
 ହେଉଃଃଃ, ସେନ ହୁଏ ଘରୋର ଗହସ୍ତ ହେଉ । କବିତାରେ ଗହସ୍ତ ହେଉଃଃଃ ।"

ସହସ୍ର ନା ଚିନ୍ତିତା ଚିନ୍ତିତା କାହେଣୀ ଆସିଲା । ଦେଖୁ ଥିବ ଦୈତ୍ୟ ହସି
 ଶୈବ୍ୟ ହାତୀର ଦୈତ୍ୟ, ହାତୀ ଶିବ ବସିବାର ବସ୍ତ୍ର ଶିଳାଶିଳିତ କାନ୍ଥର ବସ
 ଶିଳା । ନାନା ଶିବ ଦୈତ୍ୟ ଦେଖ କଥାଟା ଶେଷିଆ ଶୈବ୍ୟ ଦୈତ୍ୟ । ଶରଣି,
 ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପାଟିରେ ଆସି ଅନ୍ଧାରରେ ଗିଫ୍ଟରେ ବାହା ଆସାର ଶୈବ୍ୟ ଦୈତ୍ୟ ଏକ
 କାହାଣୀର ଏକଟି ସମ୍ପାଦନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦୈତ୍ୟ, ଶରଣି ନା ବସିବାର ପୁନର୍ବାର ନାହା
 କାହାଣୀର କଥାଟା ଶୈବ୍ୟ ଦୈତ୍ୟ ଦୈତ୍ୟ ଦୈତ୍ୟ ଦୈତ୍ୟ ଦୈତ୍ୟ ଦୈତ୍ୟ ଦୈତ୍ୟ ଦୈତ୍ୟ
 କାହାଣୀର କଥାଟା ଶୈବ୍ୟ ଦୈତ୍ୟ ଦୈତ୍ୟ ଦୈତ୍ୟ ଦୈତ୍ୟ ଦୈତ୍ୟ ଦୈତ୍ୟ ଦୈତ୍ୟ ଦୈତ୍ୟ

ଦଳଟି ଯାଏନା କାଲି କାଲି ବଢ଼ିବ, "ଆମି ଗ୍ରିକ୍ ଜାତିର ଲା. ମୁଁ
 କ୍ରୀଷ୍ଣାବେଳା ଗିରି—ହରି-ବଦାବେଳା ଧାବ ।"

સા.પ્ર.મ. મહાનિલ (૧૦૫)

[illegible]

ହେଉଛି କବିତା, ଚିନ୍ତାଧାର, ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଶବ୍ଦର ଗାଥା । ବିଷୟ ବୃଦ୍ଧି
କବିତାରେ, କବ୍ୟର ଗୋଟିଏ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କା, ଯଦ୍ୟଦେ ସେ କବ୍ୟରେ ବିଷୟ
ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହୁଏ ତେବେ । ଅନ୍ତରାଳରେ ଶେଷ କବିତାରେ ବିଷୟ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ବଳ
ଦିଆଯାଏ ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

কিন্তু প্রথম ছবিটা খারাপ হইয়া গেল। স্ততরাং পরের দিন আবার একটা ছবি না লইয়া চিত্রকর ছাড়িল না। তার পরে আবার দুই মণীকে একত্র করিয়া বন্ধুত্বের চিত্রনিদর্শনস্বরূপ একখানি ছবি তোলায় প্রস্তাবে বিনোদিনী 'না' বলিতে পারিল না। কহিল, "কিন্তু এইটেই শেষ ছবি।"।

শুনিয়া মহেন্দ্র সে ছবিটাকে নষ্ট করিয়া ফেলিল। এমনি করিয়া ছবি তুলিতে তুলিতে আলাপ-পরিচয় বহু দূর অগ্রসর হইয়া গেল।

১৫

বাহির হইতে নাড়া পাইলে ছাই-চাপা আগুন আবার জলিয়া উঠে। নবদম্পতির প্রেমের উৎসাহ যেটুকু স্তন হইতেছিল, তৃতীয় পক্ষের ঘা পাইয়া সেটুকু আবার জাগিয়া উঠিল।

আশার হাত্তালাপ করিবার শক্তি ছিল না, কিন্তু বিনোদিনী তাহা অল্পশ্র জোগাইতে পারিত; এইজন্য বিনোদিনীর অন্তরালে আশা ভারি একটা আশ্রয় পাইল। মহেন্দ্রকে সর্বদাই আমোদের উত্তেজনায় রাপিতে তাহাকে আর অসাধ্যসাধন করিতে হইত না।

বিবাহের অল্প কালের মধ্যেই মহেন্দ্র এবং আশা পরস্পরের কাছে নিজেকে নিঃশেষ করিবার উপক্রম করিয়াছিল—প্রেমের সংগীত একেবারেই তারত্বরের নিধাদ হইতেই শুরু হইয়াছিল—হৃদ ভাঙিয়া না পাইয়া তাহারা একেবারে মূলধন উজাড় করিবার চেষ্টায় ছিল। এই গোপামির বন্ধাকে তাহারা প্রাত্যহিক সংসারের সহজ স্রোতে কেমন করিয়া পরিণত করিলে। নেশার পরেই নাকখানে যে অবসাদ আসে, সেটা দূর করিতে স্নায়ব আবার যে নেশা চায়, সে নেশা আশা কোথা হইতে জোগাইবে। এমন সময় বিনোদিনী নবীন বস্ত্রিন পাত্র ভরিয়া আশার হাতে আনিয়া দিল। আশা স্বামীকে প্রফুল্ল দেখিয়া আশ্রয় পাইল।

এমন আর তাহার নিয়ম চেষ্টা করিল না। মহেন্দ্র-বিনোদিনী যখন উপবাস-পরিহাস করিত, তখন সে কেবল প্রাণ ধুলিয়া হারিত হোয় গিয়া। হাস-বেলায় মহেন্দ্র যখন আশাকে অস্ত্রায় ব্যক্তি হিত তখন সে বিনোদিনীকে বিচ্যবক মানিয়া দরঙ্গ অধিবাসনের সমতাপনা করিত। মহেন্দ্র আশাকে মারি করিলে বা কোনো অসংগত কথা বলিলে সে প্রতাপনা করিত, বিনোদিনী তাহার হইয়া উপযুক্ত প্রত্যয় দিয়া গিয়া। এইভাবে দিন অনেক গড়া চলিয়া উঠিল।

কিছু তাই বলিয়া বিনোদিনীর কাছে শৈথিল্য ছিল না। একদিন, যখন সে, আসা-স্বীর সেবা করা, সময় সে নিজেসমুদয় সমাধা করিয়া বসে আশাকে বোম গিয়া। মহেন্দ্র অধির হইয়া বলিল, “চাকর-খানীগুলোকে না ভাঙ করিলে দিয়া তুমি মাটি করিলে তেথিত্তি।”

বিনোদিনী বলিল, “কিছু কাজ না করিয়া মাটি হওয়ার চেয়ে সে কাজ। যাক, তুমি আসলে যাক।”

মহেন্দ্র। আর আসবার দিনটোয়—

বিনোদিনী। না, সে হইবে না—সেবার পাতি হৈরি হইয়া আসে—
আসলে হইবে হইবে।

মহেন্দ্র। আমি সে পাতি খাণ করিয়া দিয়াছিলাম।

বিনোদিনী। আমি বলিয়া দিয়াছি।

বলিয়া মহেন্দ্রের আশাকে হাইবাহে মাপত আমিরা মদুর উপস্থিত করিল।

মহেন্দ্র। সেদিনে আসা-স্বীর যত চক্ৰাভা উঠিল ছিল, দুইকালে আসা-স্বীরে বসে পাইয়া গিয়া।

আশাকে প্রত্যেকদিন দুই কালে যত কাকি সেখানে বিনোদিনী আসা-স্বীরে বসে গিয়া গিয়া না। আসা-স্বীরে বসিলে দিনে দুইকাল মনোহর আসা-স্বীরে বসিয়া সে, এক হইয়া আসা-স্বীরে

অবকাশ মহেন্দ্রের কাছে অত্যন্ত রমণীয় নোভনীয় হইয়া উঠিল। তাহার দিনটা নিজের অবসানের জন্য যেন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত।

পূর্বে মাঝে মাঝে ঠিক সময়মত আহার প্রস্তুত হইত না এবং সেই ছুতা করিয়া মহেন্দ্র আনন্দে কালেজ কামাই করিত। এখন বিনোদিনী স্বয়ং বন্দোবস্ত করিয়া মহেন্দ্রের কালেজের খাওয়া সকাল-সকাল ঠিক করিয়া দেয় এবং খাওয়া হইলেই মহেন্দ্র খবর পায়—গাড়ি তৈয়ার। পূর্বে কাপড়গুলি প্রতিদিন এমন ভাঁজ-করা পরিপাটি অবস্থায় পাওয়া দূরে থাক, খোপার বাড়ি গেছে কি আলুয়ারির কোনো একটা অনির্দেশ স্থানে অগোচরে পড়িয়া আছে তাহা দীর্ঘকাল সন্ধান ব্যতীত জানা যাইত না।

প্রথম-প্রথম বিনোদিনী এই-সকল বিশৃঙ্খলা লইয়া মহেন্দ্রের সম্মুখে আশাকে সহাস্ত ভংগনা করিত—মহেন্দ্রও আশার নিরুপায় নৈপুণ্য-হীনতায় সন্মোহিত হইত। অবশেষে সখীবাৎসল্যবশে আশার হাত হইতে তাহার কর্তব্যভার বিনোদিনী নিজের হাতে কাড়িয়া লইল। ঘরের ঐ ফিরিয়া গেল।

চাপকানের বোতান ছিঁড়িয়া গেছে, আশা আশু তাহার কোনো উপায় করিতে পারিতেছে না—বিনোদিনী দ্রুত আসিয়া হতবৃদ্ধি আশার হাত হইতে চাপকান কাড়িয়া লইয়া চট্টপট সেলাই করিয়া দেয়। একদিন মহেন্দ্রের প্রস্তুত অয়ে বিড়ালে মুখ দিল—আশা ভাবিয়া অস্থির; বিনোদিনী তখনই রাসাঘরে গিয়া কোথা হইতে কী সংগ্রহ করিয়া শুছাইয়া কাজ চালাইয়া দিল। আশা আশ্চর্য হইয়া গেল।

মহেন্দ্র এইরূপে আহায়ে ও আচ্ছাদনে, কর্মে ও বিশ্রামে সর্বত্রই নানা আকারে বিনোদিনীর সেবাহস্ত অহঙ্কর করিতে লাগিল। বিনোদিনীর রচিত পশমের ছুতা তাহার পায়ে এবং বিনোদিনীর বোনা পশমের গলাবন্ধ তাহার কর্ণদেশে একটা যেন কোনও নানসিক সংস্পর্শের মতো বেঠেন করিল। আশা আশ্চর্য্যে সখীহস্তের প্রসাধনে পরিপাটি-পরিচ্ছন্ন

विनाशिनोऽसहाय्येन विनाशो भवेत् ।

ବିହାରୀ ମିତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ବଳେ କହିଲେ, "ଶୁଣ କନ୍ୟା । ସଦୃଶ ତିନିଘୋଷ ବଜାଇ କରିବେ । ଆଗରେ ଗାୟକ୍ୟାସ୍, ଆଗିଆଡ଼ିଆମ୍, ଆଗିରେ ଆମ୍ । ନେଇ ପଶିବା ତରିଆମ୍ । ଏତିକିଲାଲେ ଆଉ ବାଜେ ବଜେ କହିବେ ନା ।"

স্বপ্নের শিক্ত জাহিয়া করিল, "যোগেন্দ্র, চিত্তিঙ্গা করিয়া যোগ
সাহসেন্দ্র চেষ্টা যোগ না হইতে দেখাই তাহা।"

22

ନିହାଣୀ ଗ୍ରାସିଲ, 'ସାତ ହୁଏ ବାକିର ଚଳିଲେ ମା, ସେମାନେ କହିବା ହୁଏକ,
 ଟିକାଟିକା ମାତ୍ରଧାନେ କାମାତେକ ଓ ଏକଟି ସ୍ତମ୍ଭ କରୁଥିବେ ହୁଏକ । ଟିକାଟିକା କେହି
 କାମାତେକ ଗ୍ରାସିଲେ ମା, ତୁ କାମାତେ ବାକିର ଚଳିଲେ ।'

ବିଜାଣି ଆଜ୍ଞାନ-ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀର ଅନେକା କା ହାସିଯାହି ମନୋହର ବୁଦ୍ଧ
 ମନୋ ହାସ୍ୟ କରିବେ ଜାଣିଲ । ଦିଲୋସିଲୀତ କରିବ, ଦିଲୋସ-ହୋଇଲ,
 ଏହି ହେଲେଟିକେ ଶହାର କା କାହିଁ କରିବେ, ବହୁ କାହିଁ କରିବେ, ହୀ କାହିଁ
 କରିବେ—ହୁଲିକ ଶେଟି ଶହ କା କାହିଁ ଏକା ବୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେବେ—
 ହୋଇବେ ହୋଇବେ ।”

संख्या : १५४२-

বিঃদ্র:। অর্থাৎ অসংখ্য মাইক୍ରୋ-স্কোপ, বাই-স্কোপ, বের-স্কোপ, বার-
স্কোপ, ই-

[illegible][illegible]

ମିଳିତେ ବସିବ, 'ସିଦ୍ଧି'ରୁ ଯେ ବଞ୍ଚିବେକ ବଞ୍ଚିବେକ ତେବେ ମିଳିତେ ଯାବେ ।
ଏବେକ ଯାବେ ମିଳିତେ ଯାବେ ।"

বিনোদিনী। আগে হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিলে কিছু হয় না, অন্যদ্বান থাকিতে হয়। কী বল ভাই, চোখের বালি। তোমার এই দেওরের ডায় তুমিই লও-না, ভাই।

আশা তাহাকে দুই অঙ্গুলি দিয়া ঠেলিয়া দিল। বিহারীও এ ঠাট্টায় যোগ দিল না।

আশার সম্বন্ধে বিহারীর কোনো ঠাট্টা সহিবে না, এটুকু বিনোদিনীর কাছে এড়াইতে পারে নাই। বিহারী আশাকে প্রকা করে এবং বিনোদিনীকে হালকা করিতে চায়, ইহা বিনোদিনীকে বিধিল।

সে পুনরায় আশাকে কহিল, “তোমার এই ভিক্কু দেওরটি আমাকে উপলব্ধ করিয়া তোমারই কাছে আদর ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে—কিছু দে, ভাই।”

আশা অত্যন্ত বিরক্ত হইল। ক্ষণকালের জন্য বিহারীর মুখ লাল হইল, পরক্ষণেই হাসিয়া কহিল, “আমার বেলাতেই কি পরের উপর বরাত চালাইবে, আর মহিনদার সঙ্গেই নগদ কারবার।”

বিহারী যে সমস্ত মাটি করিতে আসিয়াছে, বিনোদিনীর ইহা বুঝিতে বাকি রহিল না। বুঝিল, বিহারীর সম্মুখে সশস্ত্র থাকিতে হইবে।

মহেন্দ্রও বিরক্ত হইল। ধোনসা কথায় কবিত্বের মাধুর্য নষ্ট হয়। সে ইংরাজী ভাষায় কহিল, “বিহারী, তোমার মহিনদা কোনো কারবারে যান না—হাতে যা আছে তাতেই তিনি সন্তুষ্ট।”

বিহারী। তিনি না যেতে পারেন, কিন্তু ভাগ্যে লেখা থাকিলে কারবারের ডেউ বাহির হইতে আসিয়াও লাগে।

বিনোদিনী। আপনার উপস্থিত হাতে কিছুই নাই, কিন্তু আপনার ডেউটা কোন্ দিক হইতে আসিতেছে!

বলিয়া সে সবটাক হস্তে আশাকে টিপিল। আশা বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল। বিহারী পরাভূত হইয়া কোণে নীরব হইল; উঠিবার

তখন সম্পর্কের যে জোর আছে। যেখানে দাবি করা চলে সেখানে ভিক্ষা করা কেন। আদর যে কাড়িয়া লইতে পারেন। কী বলেন, মহেন্দ্রবাবু।”

মহেন্দ্রবাবুর তখন বাক্যক্ষুণ্ণ হইতেছিল না।

বিনোদিনী। বিহারীবাবু, লজ্জা করিয়া খাইতেছেন না, না রাগ করিয়া? আর কাহাকেও ডাকিয়া আনিতে হইবে?

বিহারী। কোনো দয়কার নাই। যাহা পাইলাম তাহাই প্রচুর।

বিনোদিনী। ঠাট্টা? আপনার সঙ্গে পারিবার জো নাই। মিষ্টায় দিলেও মুখ বন্ধ হয় না।

রায়ে আশা মহেন্দ্রের নিকটে বিহারী সখেরে রাগ প্রকাশ করিল—
মহেন্দ্র অত্র দিনের মতো হাসিয়া উড়াইয়া দিল না, সম্পূর্ণ যোগ দিল।

প্রাতঃকালে উঠিয়াই মহেন্দ্র বিহারীর বাড়ি গেল। কহিল, “বিহারী, বিনোদিনী হাজার হউক ঠিক বাড়ির মেয়ে নয়—তুনি সামনে আসিলে সে যেন কিছু বিরক্ত হয়।”

বিহারী কহিল, “তাই না কি। তবে তো কাষটা ভালো হয় না। তিনি যদি আপত্তি করেন, তাঁর সামনে নাই গেলাম।”

মহেন্দ্র নিশ্চিন্ত হইল। এত সহজে এই অপরিষদ কার্য শেষ হইবে, তাহা সে মনে করে নাই। বিহারীকে মহেন্দ্র ভয় করে।

সেই দিনই বিহারী মহেন্দ্রের অলুপুয়ে গিয়া কহিল, “বিনোদ-বোঠান, মাপ করিতে হইবে।”

বিনোদিনী। কেন, বিহারীবাবু।

বিহারী। মহেন্দ্রের কাছে তুলিলাম, আমি অলুপুয়ে আপনার সামনে বাহির হই বলিয়া আপনি বিরক্ত হইয়াছেন। তাই কমা চাহিয়া বিদায় হইব।

বিনোদিনী। সে কি হয়, বিহারীবাবু। আমি আজ আছি কাল নাই,

বলিয়া ব্যাকুল চক্ষে একবার নহেন্দ্রের মুখেব দিকে চাহিল।

পরদিন বিহারী আসিয়া কহিল, “বিনোদ-বোঠান, যাবার কথা কেন বলিতেছেন। কিছু দোষ করিয়াছি কি—তাহাবই শাস্তি?”

বিনোদিনী একটু মুখ ফিরাইয়া কহিল, “দোষ আপনি কেন করিবেন, আমার অদৃষ্টের দোষ।”

বিহারী। আপনি যদি চলিয়া যান তো আমার কেবলই মনে হইবে, আমারই উপর রাগ করিয়া গেলেন।

বিনোদিনী করুণ চক্ষে মিনতি প্রকাশ করিয়া বিহারীর মুখের দিকে চাহিল; কহিল, “আমার কি থাকা উচিত হয়, আপনিই বলুন-না।”

বিহারী মুশকিলে পড়িল। থাকা উচিত, এ কথা সে কেমন করিয়া বলিবে। কহিল, “অবশ্য আপনাকে তো যাইতেই হইবে, নাহয় আর দু-চার দিন থাকিয়া গেলেন, তাহাতে কতি কী।”

বিনোদিনী হুই চক্ষু নত করিয়া কহিল, “আপনারা সকলেই আমাকে থাকিবার জন্য অহরোধ করিতেছেন, আপনাদের কথা এড়াইয়া যাওয়া আমার পক্ষে কঠিন, কিন্তু আপনাবা বড়ো অন্তায় করিতেছেন।”

বলিতে বলিতে তাহার ঘনদীর্ঘ চক্ষুপল্লবের নখা দিয়া মোটা মোটা অশ্রুর খোঁটা দ্রুত বেগে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

বিহারী এই নীরব অজস্র অশ্রুজলে ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, “কয় দিন মাত্র আসিয়া আপনার গুণে আপনি সকলকে বশ করিয়া লইয়াছেন, সেইজন্যই আপনাকে কেহ ছাড়িতে চান না—কিছু মনে করিবেন না বিনোদ-বোঠান, এমন লক্ষ্মীকে কে ইচ্ছা করিয়া বিদায় করিবে।”

আশা এক কোণে ঘোমটা দিয়া বসিয়া ছিল, সে আঁচল তুলিয়া ঘন ঘন চোপ মুছিতে লাগিল।

ইহার পরে বিনোদিনী আর যাইবার কথা উপাশন করিল না।

দেশের কথা বলুন।”

কণে কণে উষ্ণ মধ্যাহ্নের পাতাস তরুণলব্ধ মর্নব্রিত করিয়া চলিয়া গেল, কণে কণে দিঘির পাড়ে জাম গাছের ঘনপত্রের মধ্য হইতে কোকিল ডাকিয়া উঠিল। বিনোদিনী তাহার ছেলেবেলাকার কথা বলিতে লাগিল, তাহার বাপ-মায়েব কথা, তাহার বাল্যস্মৃতিব কথা। বলিতে বলিতে তাহার মাথা হইতে কাপড়টুকু খসিয়া পড়িল, বিনোদিনীর মুখে ধর-যৌবনের যে একটি দীপ্তি সর্বদাই বিরাজ করিত, বাল্যস্মৃতির ছায়া আসিয়া তাহাকে স্তম্ভ করিয়া দিল। বিনোদিনীও চক্ষে যে কোতুকতীত্ৰ কটাক দেখিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিহারীর মনে এ-পৰ্যন্ত নানাপ্রকার সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, সেই উজ্জলকৃষ্ণ জ্যোতি বধন একটি শাস্তসজল রেখায় ম্লান হইয়া আসিল তখন বিহারী যেন আর-একটি মানুষ দেখিতে পাইল। এই দীপ্তিমণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে কোমল হৃদয়টুকু এখনও হৃদাধারায় সরস হইয়া আছে, অপরিভৃষ্ট রত্নরস-কোতুকবিলাসের দহনজ্বালায় এখনও নানীপ্রকৃতি শুষ্ক হইয়া যায় নাই। বিনোদিনী সলজ্জ সতীন্দ্রী-ভাবে একান্ত-ভক্তিভরে পতিসেবা করিতেছে, কল্যাণপরিপূর্ণা জননীর নতো সন্তানকে কোলে ধরিয়া আছে, এ ছবি ইতিপূর্বে মূর্ত্তের জন্ত ও বিহারীর মনে উদ্ভিত হয় নাই—আজ যেন রত্নমঞ্চের পটপানা কণকালের জন্ত উড়িয়া গিয়া ঘরের ভিতরকার একটি মঙ্গলদৃশ্য তাহার চোখে পড়িল। বিহারী ভাবিল, ‘বিনোদিনী বাহিরে বিলাসিনী যুবতী বটে, কিন্তু তাহার অহরে একটি পূজারতা নারী নিরশনে তপস্বী করিতেছে।’ বিহারী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিল, ‘প্রকৃত আপনাকে মানুষ আপনিও জানিতে পারে না, অন্তর্ধামাই জানেন; অবস্থাবিপাকে যেটা বাহিরে গড়িয়া উঠে সংসারের কাছে সেইটেই সত্য।’ বিহারী কথাটাকে ধামিতে দিল না, প্রশ্ন করিয়া করিয়া জাগাইয়া রাখিতে লাগিল; বিনোদিনী এ-সকল কথা এ-পৰ্যন্ত এমন করিয়া শোনাইবার লোক পায় নাই—বিশেষত,

আশা জিজ্ঞাসা করিল, “কিসে তোমার এত ভালো লাগিল, ভাই।”

বিনোদিনী কহিল, “আমার মনে হইতেছে, আমি যেন মরিয়া গেছি, যেন পরলোকে আসিয়াছি, এখানে যেন আমার সমস্তই মিলিতে পারে।”

বিস্মিত আশা এ-সব কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে মৃত্যুর কথা শুনিয়া দুঃখিত হইয়া কহিল, “ছি ভাই চোখের বালি, অমন কথা বলিতে নাই।”

গাড়ি পাওয়া গেল। বিহারী পুনরায় কোচ্বাক্সে চড়িয়া বসিল। বিনোদিনী কোনো কথা না বলিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল, জ্যোৎস্নায় স্তম্ভিত তরুশ্রেণী ধাবমান নিবিড় ছায়াঘোড়ের মতো তাহার চোখের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। আশা গাড়ির কোণে ঘুমাইয়া পড়িল। মহেন্দ্র সুদীর্ঘ পথ নিতান্ত বিমর্ষ হইয়া বসিয়া থাকিল।

১৮

চড়িভাতির দুদিনের পরে মহেন্দ্র বিনোদিনীকে আর-একবার ভালো করিয়া আয়ত্ত করিয়া লইতে উৎসুক ছিল। কিন্তু তাহার পরদিনেই ব্রাহ্মলক্ষ্মী ইন্দ্ৰযেষ্ঠা-জরে পড়িলেন। রোগ শুরুর নহে, তবু তাহার অল্পপ ও দুর্বলতা যথেষ্ট। বিনোদিনী দিনরাত্রি তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইল।

মহেন্দ্র কহিল, “দিনরাত এমন করিয়া খাটিলে শেষকালে তুমিই যে অস্থির পড়িবে। মাত্র সেবার জন্যে আমি লোক ঠিক করিয়া দিতেছি।”

বিহারী কহিল, “মহিনন্দা, তুমি অত ব্যস্ত হইয়ো না। উনি সেবা করিতেছেন, করিতে হাও। এমন করিয়া কি আর কেহ করিতে পারিবে।”

মহেন্দ্র রোগীর ঘরে ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করিল। একটা লোক কোনো কাজ করিতেছে না, অথচ কাজের সনদ সর্বদাই সঙ্গে লাগিয়া আছে, ইহা কনিষ্ঠা বিনোদিনীর পক্ষে অসম্ভব। সে বিরক্ত হইয়া দুই-তিনবার

ঠিক করিয়া রাখিয়া দিবে—একদিনও তাহা হয় না। স্নানের পর বোতাম পরাইতে আর কাপড় খুঁজিয়া বেড়াইতে আমার দু ঘণ্টা যায়।”

অহুতপ্ত আশা লজ্জায় স্নান হইয়া বলে, “আমি বেহারাকে বলিয়া দিয়াছিলাম।”

“বেহারাকে বলিয়া দিয়াছিলে ! নিজেব হাতে করিতে দোষ কী। তোমার দ্বারা যদি কোনো কাজ পাওয়া যায়।”

ইহা আশার পক্ষে বজ্রাঘাত। এমন ভৎসনা সে কখনও পায় নাই। এ জবাব তাহার মুখে বা মনে আসিল না যে, ‘তুমিই তো আমার কর্ম-শিক্ষার ব্যাঘাত করিয়াছ।’ এ ধারণাই তাহার ছিল না যে, গৃহকর্ম-শিক্ষা নিয়ত অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ। সে মনে করিত, ‘আমার স্বাভাবিক অক্ষমতা ও নিব্বুদ্ধিতা -বশতই কোনো কাজ ঠিকমত করিয়া উঠিতে পাবি না।’ মহেন্দ্র যখন আশ্রয়বিহীন হইয়া বিনোদিনীর সহিত তুলনা দিয়া আশাকে দিক্‌কার দিয়াছে তখন সে তাহা বিনয়ে ও বিনা বিদ্বেষে গ্রহণ করিয়াছে।

আশা এক-একবার তাহার রূপ-শাশুড়ীর ঘরের আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়, এক-একবার লজ্জিত ভাবে ঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। সে নিজেকে সংসারের পক্ষে আবশ্যক করিয়া তুলিতে ইচ্ছা করে; সে কাজ দেখাইতে চায়, কিন্তু কেহ তাহার কাজ চাহে না। সে জানে না কেনন করিয়া কাজের মধ্যে প্রবেশ করা যায়, কেনন করিয়া সংসারের মধ্যে স্থান করিয়া লইতে হয়। সে নিজের অক্ষমতার সংকোচে বাহিরে বাহিরে দিবে। তাহার কী একটা মনোবেদনার কথা অহরে প্রতিদিন বাড়িতেছে; কিন্তু তাহার সেই অপরিষ্কৃত বেদনা, সেই অব্যক্ত আশঙ্কাকে সে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারে না। সে অহুতব বলে, তাহার চারি দিকের সমস্তই সে যেন নষ্ট করিতেছে—কিন্তু কেনন করিয়াই যে তাহা গড়িয়া উঠিয়াছিল, এবং কেনন করিয়াই যে তাহা নষ্ট হইতেছে, এবং কেনন

সেখানে কেহ তোমাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারিবে না ।”

তখন আশা দৃঢ়চিত্তে সর্বপ্রকার ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত হইয়া স্বামীস্বরূপ নিকট নিজেস্বরূপ একটিনাত্র শুল্ক দাবিদাখিল করিল । কহিল, “তুমি আমাকে বোঝ একখানি কবিতা চিঠি দিবে ?”

মহেন্দ্র কহিল, “তুমিও দিবে ?”

আশা কহিল, “আমি কি লিখিতে জানি ।”

মহেন্দ্র তাহার কানের কাছে অলঙ্ঘন্য টানিয়া দিয়া কহিল, “তুমি অক্ষরহুমার দস্তের চেয়ে ভালো লিখিতে পার—চারুপাঠ যাহাকে বলে ।”

আশা কহিল, “যাও, আমাকে আর ঠাট্টা করিও না ।”

যাইবার পূর্বে আশা যথাসাধ্য নিজের হাতে মহেন্দ্রের পোর্টম্যান্টো সাজাইতে বসিল । মহেন্দ্রের মোটা মোটা শ্বিভের কাপড় ঠিকমত ভাঁজ করা কঠিন, বায়ে ধরানো শক্ত—উভয়ে মিলিয়া কোনোমতে চাপাচাপি ঠাসাঠুসি করিয়া, যাহা এক বায়ে ধরিত তাহাতে দুই বায় বোঝাই করিয়া তুলিল । তবু যাহা ভুলক্রমে বাকি রহিল তাহাতে আরও অনেকগুলি পতন পুঁটুলির সৃষ্টি হইল । ইহা লইয়া আশা যদিও বারবার লজ্জাবোধ করিল, তবু তাহাদের কাড়াকাড়ি কোতুক ও পরস্পরের প্রতি সহ্য সোনারোপে পূর্বকার আনন্দের দিন বিবিতা আসিল । এ যে দিনায়ের আয়োজন হইতেছে তাহা আশা কণকালের জন্ত ভুলিয়া গেল । সহিল দশবার গাড়ি-ভৈয়্যার কথা মহেন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া দিল, মহেন্দ্র কানে তুলিল না—অবশেষে বিরক্ত হইয়া বলিল, “ঘোড়া খুলিয়া নাও ।”

সকাল ক্রমে বিকাল হইয়া গেল, বিকাল সন্ধ্যা হয় । তখন স্বাস্থ্যপালন করিতে পরস্পরকে সতর্ক করিয়া দিয়া এবং নিয়মিত চিঠি লেখা দেখিতে বারংবার প্রতিশ্রুত করাইয়া লইয়া ভাবাক্রান্তহৃদয়ে পরস্পরের দিচ্ছেন হইল ।

স্বাস্থ্যপালী আজ দুই দিন হইল উঠিয়া বসিয়াছেন । সন্ধ্যাবেলায় গায়ে

ছিল, সে কাজ গিয়া বিনোদিনী যেন এপাশ-ওপাশ করিতে লাগিল। বাড়ি হইতে তাহার সমস্ত নেশা চলিয়া গেল। মহেন্দ্রবর্জিত আশা তাহার কাছে নিতান্তই স্বাদহীন। আশার প্রতি মহেন্দ্রের সোহাগ-যত্ন বিনোদিনীর প্রণয়বঞ্চিত চিত্তকে সর্বদাই আলোড়িত করিয়া তুলিত— তাহাতে বিনোদিনীর বিরহিণী কল্পনাকে যে বেদনায় জাগরুক করিয়া রাখিত তাহার মধ্যে উগ্র উদ্বেজনা ছিল। যে মহেন্দ্র তাহাকে তাহার সমস্ত জীবনের সার্থকতা হইতে স্রষ্ট করিয়াছে, যে মহেন্দ্র তাহার মতো জীবনকে উপেক্ষা করিয়া আশার মতো ক্ষীণবুদ্ধি দীনপ্রকৃতি বালিকাকে বরণ করিয়াছে, তাহাকে বিনোদিনী ভালোবাসে কি বিবেচন করে, তাহাকে কঠিন শাস্তি দিবে না তাহাকে স্বনয়নমর্ষণ করিবে, তাহা বিনোদিনী ঠিক করিয়া বুঝিতে পারে নাই। একটা জালা মহেন্দ্র তাহার অন্তরে জালাইয়াছে; তাহা হিংসার না প্রেমের, না দুয়েরই মিশ্রণ, বিনোদিনী তাহা ভাবিয়া পায় না। মনে মনে তীব্র হাসি হাসিয়া বলে, 'কোনো নারীর কি আমার মতো এমন দশা হইয়াছে। আমি মরিতে চাই কি মারিতে চাই তাহা বুঝিতেই পারিলাম না।' কিন্তু যে কারণেই বল, দৃষ্ট হইতেই হউক বা দৃষ্ট করিতেই হউক, মহেন্দ্রকে তাহার একান্ত প্রয়োজন। সে তাহার নিষিদ্ধ অগ্নিবাণ জগতে কোথায় মোচন করিবে। ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বিনোদিনী কহিল, 'সে মাইবে কোথায়। সে ফিরিবেই। সে আমার।'

আশা ঘর পরিষ্কার করিবার ছুতা করিয়া সন্ধ্যার সময়ে মহেন্দ্রের বাহিরের ঘরে, মাথা-তেলে-মাগ-পড়া মহেন্দ্রের বসিবার বেদারা, কাগজ-পত্র-ছড়ানো চেস্ক, তাহার বই, তাহার ছবি প্রভৃতি জিনিসপত্র দারদার নাড়াচাড়া এবং অঞ্চল দিয়া কাড়পোচ করিতেছিল। এইরূপে মহেন্দ্রের সকল জিনিস নানা রূপে স্পর্শ করিয়া, একবার রাখিয়া, একবার তুলিয়া, আশার বিরহসন্ধ্যা কাটিতেছিল। বিনোদিনী দীয়ে দীয়ে তাহার কাছে

নাথ। চাপিয়া ধরিয়া ভাবিতে লাগিল, আশা কেন কাঁদিবে। যে মেয়ে স্বভাবতই বাহ্যরও কাছে লেশমাত্র অপরাধ করিতে অক্ষম, তাহাকেও কাঁদাইতে পারে এমন পামও জগতে কে আছে। তাব পরে বিনোদিনী খেমন করিয়া সাহসনা করিতেছিল তাহা মনে আনিয়া মনে মনে কহিল, 'বিনোদিনীকে ভারি ভুল বুঝিয়াছিলাম। সেবায়, সাহসনায়, নিঃস্বার্থ সখীপ্রেমে সে মর্তবাসিনী দেবী।'

বিহারী অনেকক্ষণ অন্ধকারে বসিয়া রহিল। অন্ধের গান থামিয়া গেলে বিহারী সশব্দে পা ফেলিয়া, কাশিয়া, মহেন্দ্রের ঘরের দিকে চলিল। ঘরের কাছে না যাইতেই ঘোমটা টানিয়া আশা ক্রান্ত পদে অন্তঃপুরের দিকে ছুটিয়া গেল।

ঘরে ঢুকিতেই বিনোদিনী বলিয়া উঠিল, "এ কী বিহাবীবাবু! আপনার কি অস্থখ করিয়াছে।"

বিহারী। কিছু না।

বিনোদিনী। চোখ চুটা অমন লাল কেন।

বিহারী তাহার উত্তর না দিয়া কহিল, "বিনোদ-বোঠান, মহেন্দ্র কোথায় গেল।"

বিনোদিনী মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, "তনিকাম, হাসপাতালে তাঁহার কাজ পড়িয়াছে বলিয়া কলেজের কাছে তিনি বাসা করিয়া আছেন। বিহারীবাবু একটু সরুন, আমি তবে আসি।"

অজ্ঞানস্ব নিহারী ঘরের কাছে বিনোদিনীর পথরোধ করিয়া পাড়াইয়াছিল। চকিত হইয়া তাড়াতাড়ি পথ ছাড়িয়া দিল। সন্ধ্যার সময় একলা বাহিরের ঘরে বিনোদিনীর সঙ্গে কথাবার্তা লোকের চক্ষে সন্দেহ নহ, সে কথা হঠাৎ মনে পড়িল। বিনোদিনী চলিয়া যাইবার সময় বিহারী তাড়াতাড়ি বলিয়া মইল, "বিনোদ-বোঠান, আশাকে তুমি দেখিছো। সে শয়লা, কাহাকেও আঘাত করিতেও জানে না, নিজেকে আঘাত

ভালোবাসার একটা পাখি তাহার বুকের নীড়ে বাসা করিয়া ঘুমাইয়া আছে। তাহাকে জাগাইয়া তুলিলেই তাহার সমস্ত কোমল কৃপন কানে ধ্বনিত হইয়া উঠিবে।

সন্ধ্যায় এক সময় মহেন্দ্র নির্জন ঘরে ল্যাম্পের আলোকে চৌকিতে বেষ করিয়া হেলান দিয়া আশ্রয় করিয়া বসিল। পকেট হইতে তাহার সেহতাপতপ্ত চিঠিখানি বাহির করিয়া লইল। অনেক গণ চিঠি না খুলিয়া লেফাফার উপরকার শিরোনামা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল। মহেন্দ্র জানিত, চিঠির মধ্যে বেশি কিছু কথা নাই। আশা নিজের মনের ভাব ঠিকমত ব্যক্ত করিয়া লিখিতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা ছিল না। কেবল তাহার কাঁচা অক্ষরে বাঁকা লাইনে তাহার মনের কোমল কথাগুলি কল্পনা করিয়া লইতে হইবে। আশার বাঁচা হাতে বহু যত্নে লেখা নিজের নামটি পড়িয়া মহেন্দ্র নিজের নামের সঙ্গে যেন একটা রাগিণী শুনিতে পাইল— তাহা সাক্ষীনারীন্দ্রদয়ের অতি নিভৃত বৈকুণ্ঠলোক হইতে একটি নির্মল প্রেমের সংগীত।

এই দুই-এক দিনের বিচ্ছেদে মহেন্দ্রের মন হইতে দীর্ঘ মিলনের সময় অবসাদ দূর হইয়া সরলা বধূর নবপ্রেনে উদ্ভাসিত সুখস্বভি আবাস উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। শেষাশেষি প্রাত্যহিক ঘরকন্নার খুঁটিনাটি অহবিধা তাহাকে উদ্ভাক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; সে-সমস্ত অপসারিত হইয়া, কেবলমাত্র কর্মহীন কারণহীন একটি বিস্তৃত প্রেমমানন্দের আলোকে আশার মানসী মূর্তি তাহার মনের মধ্যে প্রাণ পাইয়া উঠিয়াছে।

মহেন্দ্র অতি ধীরে ধীরে লেফাফা ছিঁড়িয়া, চিঠিখানা বাহির করিয়া, নিজের ললাটে কপোলে বুলাইয়া লইল ... দিন মহেন্দ্র যে এসেঙ্গ্ আপাকে উপহার দিয়াছিল সেই এসেঙ্গের গদ্য চিঠির কাগজ হইতে উত্তমা দীর্ঘনিবাসের মতো মহেন্দ্রের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিল।

ভাঁজ খুলিয়া মহেন্দ্র চিঠি পড়িল। কিন্তু এ কী। যেমন বাঁকাচোরা

বুঝিয়া লইলাম। ভক্ত যখন তার দেবতাকে ডাকে, তিনি কি মুখের
কথায় তাহার উত্তর দেন। দুঃখিনীর বিষপত্রখানি চরণতলে বোধ
করি স্থান পাইয়াছে।

কিন্তু ভক্তের পূজা নইতে গিয়া শিবের যদি তপোভঙ্গ হয়, তবে
তাহাতে রাগ করিয়া না, হৃদয়দেব। তুমি বর দাও বা না দাও,
চোখ মেলিয়া চাও বা না চাও, ছানিতে পার বা না পার, পূজা না
দিয়া ভক্তের আর গতি নাই। তাই আশ্রিও এই দু-ছত্র চিঠি
লিখিলাম—হে আমার পাশাণ-ঠাকুর, তুমি অবিচলিত হইয়া থাকো।

মহেন্দ্র আবার চিঠির উত্তর লিখিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু আশাকে
লিখিতে গিয়া বিনোদিনীর উত্তর কলমের মুখে আপনি আসিয়া পড়ে।
ঢাকিয়া লুকাইয়া কৌশল করিয়া লিখিতে পারে না। অনেকগুলি ছিঁড়িয়া,
স্বাক্ষরের অনেক প্রহর কাটাইয়া একটা যদি বা লিখিল, সেটা লেফাফায়
পুড়িয়া উপরে আশার নাম লিখিবার সময় হঠাৎ তাহার পিঠে যেন
কাহার চাবুক পড়িল; কে যেন বলিল, ‘পাষও, বিখন্ত বালিকার প্রতি
এখনি করিয়া প্রতারণা!’ চিঠি মহেন্দ্র সহস্র টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া
ফেলিল, এবং বাকি রাতটা টেবিলের উপর দুই হাতের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া
নিশ্চেষ্টে যেন নিজের দৃষ্টি হইতে লুকাইবার চেষ্টা করিল।

তৃতীয় পত্র।—যে একেবারেই অতিমান করিতে জানে না, সে
কি ভালোবাসে। নিজের ভালোবাসাকে যদি অনাকর্ষ-মশমান হইতে
বাচাইয়া রাগিতে না পারি, তবে সে ভালোবাসা তোমাকে দিব
কেনন করিয়া।

তোমার নন হয়তো ঠিক বুঝি নাট, তাই এত সাহস করিয়াছি।
তাই যখন ত্যাগ করিয়া গেলে, তখনও নিশ্চয় অশ্রুসর হইয়া চিঠি
লিখিয়াছি; যখন চুষ করিয়া ছিলে, তখনও ননের কথা বলিয়া

କେମିତିକି । ଦିବ୍ୟ କୋରାଳେ ବଡ଼ ଦୂର କରିବା କାନ୍ଦି, କେ ବି ଗାୟକଟି
 କୋଳ । ଏକଦା ଏକ ବଡ଼ିରେ କୋଳ ଗାୟକଟି କଥା ଯେନେ କେମିତି କୋଳ
 ଯାଏ, କାହା ଦୃଷ୍ଟିବାହିନୀରେ କେ କି ଦୃଷ୍ଟିରେ କୋରାଳ ଯାଏ ।

କେ ବାଟି କୋଳ, ଦୂର କୋଳ, କାହା କୋଳ, କାହା କିମିତିକି କେ
 କାହା ଦୃଷ୍ଟିରେ କା, କାହା କିମିତି କେ କାହା କିମିତିରେ କାହିଁ କା, କେ
 କାହାଳ । କି କି, ଏକଦା କୋରାଳ କୋରାଳ କୋଳ । ଦିବ୍ୟ ବାଟି
 କିମିତି କାହା କିମିତି କା, କାହା କେ କାହା କେ କିମିତି କିମିତିରେ କାହା
 କାହା କି କାହାଳ କିମିତି କାହା । କି କାହାଳ କିମିତି କାହାଳ କାହାଳ
 କିମିତି କା କିମିତିରେ କାହା କି କାହାଳ ।

କିମିତି କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ
 କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ
 କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ
 କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ

କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ
 କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ
 କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ
 କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ
 କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ
 କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ
 କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ

କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ
 କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ
 କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ
 କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ
 କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ କାହାଳ

বিহারী গম্ভীরমুখে কহিল, “এখনই সেখান হইতে আসিতেছি।”

মহেন্দ্র বিহারীর বেদনা কল্পনা করিয়া মনে মনে একটু কৌতুকবোধ করিল। মনে মনে কহিল, ‘হতভাগ্য বিহারী। স্বীলোকের ভালোবাসা হইতে বেচারী এবেবারে বঞ্চিত।’ বলিয়া নিজেই বুদ্ধের পকেটের কাছটায় একবার হাত দিয়া চাপ দিল—ভিতর হইতে তিনটে চিঠি গড়গড় করিয়া উঠিল।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, “সবাইকে কেনন দেগিলে।”

বিহারী তাহার উত্তর না করিয়া কহিল, “বাড়ি ছাড়িয়া তুমি যে এখানে?”

মহেন্দ্র কহিল, “আজকাল প্রায় নাইট-ডিউটি পড়ে, বাড়িতে অস্থিদিয়া হয়।”

বিহারী কহিল, “এর আগেও তো নাইট-ডিউটি পড়িয়াছে, কিন্তু তোমাকে তো বাড়ি ছাড়িতে দেখি নাই।”

মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, “মনে কোনো সন্দেহ জন্মিয়াছে নাকি।”

বিহারী কহিল, “না, ঠাট্টা নয়, এখনই বাড়ি চলে।”

মহেন্দ্র বাড়ি ফিরিবার জন্য উদ্যত হইয়াই ছিল, কিন্তু বিহারীর অত্যাশ্চর্য্য শ্রুতিয়া সে হঠাৎ নিজেকে ভুলাইল, যেন বাড়ি বাইবার জন্য তাহার কিছুমাত্র আগ্রহ নাই। কহিল, “সে কী হয়, বিহারী। তা হলে আমার সংসদটাট নষ্ট হইবে।”

বিহারী কহিল, “সেখো মহিন্দা, তোমাকে আমি এতটুকু বদস হইতে দেখিতেছি, আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিমো না। তুমি অত্যাশ্চর্য্য করিতেছ।”

মহেন্দ্র। তার পরে অত্যাশ্চর্য্য করিতেছি, স্বপ্নসাহস।

বিহারী রাগ করিয়া বলিল, “তুমি যে চিরকাল জগন্মের বড়াই করিয়া আসিয়াছ, তোমার হৃদয় গেল কোথায়, মহিন্দা!”

মহেশ । সন্ততি কালেশ্বর হামপাতালে ।

বিহারী । খানো মহিনবা, খানো । তুমি এখানে আমার সঙ্গে হামিয়া
ঠাট্টা করিয়া কথা বহিতছ, সেখানে আশা তোমার বাহিরের ঘরে,
অন্দরের ঘরে, কাছিয়া কাছিয়া দেড়াইতেছে ।

আশার কাছার কথা শুনিয়া হঠাৎ মহেশ্বরের মন একটা প্রতিফল
পাইল । অগতঃ আর সে কাছারও হৃৎকল্প আছে, সে কথা তাহাও নূতন
বেশের কাছে স্থান পাবে নাই । হঠাৎ চব্বক লাগিল ; চিৎরাশা বহিল,
“আশা কাছিতেছে কী ভণ্ড ।”

বিহারী বিরক্ত হইয়া কহিল, “সে কথা তুমি জান না, আমি জানি?”

মহেশ । তোমার মহিনবা সর্বত্র নদ বলিয়া বহি বাগ করিতেই হই
তো মহিনবায় বহিকর্ষণ উপর বাগ করো ।

অন্য বিহারী বাহা সেমিয়াছিল, তাহা আগাগোড়া বহিল । বহিরে
বহিরে কিনোখিলীর কলকল আশার সেই অকস্মিক হৃৎকল্প মনে
পড়িয়া বিহারীর প্রাণ কণ্ঠস্থ হইয়া আসিল ।

বিহারীর এই প্রথম আসলগে সেমিয়া মহেশ আশ্বৰ্য হইয়া গেল ।
মহেশ জানিত, বিহারীর কলকের বাগাই নাই—এ উপসর্গ করে মৃত্যু ।
যেনি কুমারী আশাকে তেবিরে গিয়াছিল, সেই দিন হইতে নারি ।
বেচারা বিহারী ! মহেশ মনে মনে তাহাকে বেচারা বলিল বটে, কিন্তু
হৃৎকল্প না করিয়া বাগ একটু আরোহণ পাইল । আশার মতী একদম
হালে সে কোন্ সিনে, তাহা মহেশ নিশ্চয় জানিত । “অম্ব কোক
কাছে হামোশা কাছার মন, কিন্তু আরোহণ করীর, অন্দরে কাছে তাহো
চিৎরাশির তরু আসনি দয়া নিবাহে”—ইহারে মহেশ কলকের মত
গৎগৎ করি কলকল করিল ।

মহেশ বিহারীর কহিল, “আজ্ঞা জান, আশা বাক ; তবে একটা
বাগি হামোশা ।”

মহেন্দ্র ঘরে ফিরিয়া আসিবা মাত্র তাহার মুখ দেখিয়াই আশার মনের সমস্ত সংশয় দগ্ধকালের কুয়াশার মতো এক মুহূর্তেই কাটিয়া গেল। নিজেই চিঠির কথা স্মরণ করিয়া মহেন্দ্রের সামনে সে যেন মুগ্ধ ভূমিতেই পাবিল না। মহেন্দ্র তাহার উপরে ভ্রূসনা করিয়া কহিল, “এমন অপবাদ দিয়া চিঠিওলা লিখিলে কী করিয়া।”

বলিয়া পকেট হইতে বহুবাহ-পঠিত সেই চিঠি তিনখানি বাহির করিল। আশা ব্যাকুল হইয়া কহিল, “তোমার পায়ে পড়ি, ও চিঠিওলা ছিঁড়িয়া যেলো।”

বলিয়া মহেন্দ্রের হাত হইতে চিঠিওলা লইবার জগৎ ব্যস্ত হইয়া পড়িল। মহেন্দ্র তাহাকে নিরস্ত করিয়া সেগুলি পকেটে পুরিল। কহিল, “আমি কর্তব্যের অচরোপে গেলাম, আর তুমি আমার অভিপ্রায় বুঝিলে না? আমাকে সন্দেহ করিলে?”

আশা ছলছল চোখে কহিল, “এবারকার মতো আমাকে নাপ করো। এমন আর কখনোই হইবে না।”

মহেন্দ্র কহিল, “কখনও না?”

আশা কহিল, “কখনও না।”

তখন মহেন্দ্র তাহাকে টানিয়া লইয়া চুম্বন করিল। আশা কহিল, “চিঠিওলা দাও, ছিঁড়িয়া ফেলি।”

মহেন্দ্র কহিল, “না, ও থাক্।”

আশা সবিনয়ে মনে করিল, “আমার শান্তিস্বরূপ এ চিঠিওলি উনি রাখিলেন।”

এই চিঠির ব্যাপারে বিনোদিনীর উপর আশার মনটা একটু যেন হাকিয়া পাকাইল। স্বামীকে আগমনবার্তা লইয়া সে শবীর কাছে আনন্দ করিতে গেল না—বরঞ্চ বিনোদিনীকে একটু যেন এড়াইয়া গেল।

বিনোদিনী সেটুকু মন্য করিল এবং কান্নেতে ছল করিয়া একবারে ছুঁত
বহিল ।

মহেন্দ্র ডাবিল, 'এ ছো বড়ো মনুষ্য । আমি ডাবিয়াছিলাম, এগার
বিনোদিনীকে বিশেষ করিয়া লেগা খাটিলে—উল্টা হইল । তবে সে
চিঠি গুলার অর্থ খী ।'

নাট্যলেখকের হাত সুবিধার কোনো চেষ্টা করিলে না বহিয়াই মহেন্দ্র
মনকে দৃঢ় করিয়াছিল, ডাবিয়াছিল, 'বিনোদিনী যদি তাহে আদিবার
চেষ্টা করে, তবু আমি দূরে থাকিব ।' আশ্রয় সে মনে মনে করিল, 'না, এ
ভেদে দিক দাঁতেরে না । যেন আমাদের কথা সত্যই খী একটা বিবাহ
হউতাহে । বিনোদিনীর সঙ্গে সহস্র বাতাবিক ভাবে কথাবার্তা আদ্যো-
প্রমোদ করিয়া এই সংস্কারের গুলির ভাবটা ছুঁ করিয়া দেখা উচিত ।'

আগাগে মহেন্দ্র করিল, 'দেখিতেছি, আমিই তোমার দীর্ঘ চোখের
দান হইলাম । আত্মকণে ঠাণ্ডার আর দেখাটা লাগে না ।'

আগা উপাধীন ভাবে উত্তর করিল, 'কেন জানে, 'হাওয়ার খী হইতাহে ।'

এ দিকে হারমসখী আসিয়া কালো-কালো হইয়া করিলেন, 'বিনোদিনী
বউকে আর হো বহিয়া রাখা বার না ।'

মহেন্দ্র চকিত ভাবে সামলাইয়া দাঁড়া করিল, 'কেন, না ।'

হারমসখী করিলেন, 'খী আমি বাচ্চা সে হো এগার বাড়ি খাটিলে
তাহা মিথ্যাবাদী করিয়া লিখিতাহে । খুই হো কথোকে লিখিব করিলে
আনিম না । হতলোকের মোর পরে লিখিলে আছে, উহাকে আদ্যো-
প্রমোদ হো । আদ্যো-প্রমোদ না করিলে খাটিলে কেন ।'

বিনোদিনী পোষার লবে বসিয়া বিজ্ঞানবৎ চোখ লেগাই করিলে করিল ।

মহেন্দ্র প্রশ্ন করিয়া ডাবিল, 'খাটিলে ?'

বিনোদিনী লম্বা হইয়া করিল । করিল, 'খী, মনোমুগ্ধ ।'

মহেন্দ্র করিল, 'খী মনোমুগ্ধ । মহেন্দ্র আবার বার হইলেন লবে ।'

বিনোদিনী আবার চাদর-সেলাইয়ের দিকে মত চক্ষু নিবদ্ধ রাখিয়া কহিল, “তবে কী বলিয়া ডাকিব।”

মহেন্দ্র কহিল, “তোমার মখীকে যা বল—চোখের বালি।”

বিনোদিনী অত্র দিনের মতো ঠাট্টা করিয়া তাহার কোনো উত্তর দিল না—সেনাই করিয়া যাইতে লাগিল।

মহেন্দ্র কহিল, “ওটা বুঝি সত্যাকার মথক হইল, তাই ওটা আর পাতানো চলিতেছে না।”

বিনোদিনী একটু ধামিয়া দাঁত দিয়া সেলাইয়ের প্রান্ত হইতে খানিকটা বাড়তি স্বতা বাটিয়া ফেলিয়া কহিল, “কী জানি, সে আপনি জানেন।”

বলিয়াই তাহার সর্বপ্রকার উত্তর চাপা দিয়া গম্ভীরমুখে কহিল, “কালেক্স হইতে হঠাৎ ফেরা হইল যে।”

মহেন্দ্র কহিল, “কেনল মড়া কাটিয়া আর কত দিন চলিবে।”

আবার বিনোদিনী দৃষ্টি দিয়া স্বতা ছেদন করিল এবং মূগ্ধ না তুলিয়াই কহিল, “এখন বুঝি জিহ্মন্তের আশ্রয়ক?”

মহেন্দ্র স্থির করিয়াছিল, আজ বিনোদিনীর সঙ্গে অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক ভাবে হস্তপরিহাস উত্তরপ্রত্যুত্তর করিয়া আসর ছমাইয়া তুলিবে। কিন্তু এমনি গাম্ভীর্যের ভার তাহার উপর চাপিয়া আসিল যে, লঘু ভবাব প্রাণপণ চেষ্টাতেও মুখের কাছে জোগাইল না। বিনোদিনী আজ কেমন একরকম কঠিন সূত্র বণা করিয়া চলিতেছে দেখিয়া, মহেন্দ্রের মনটা সঙ্গেতে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল—ব্যবধানটাকে কোনো একটা নাক্স দিয়া ফুটিসাৎ করিতে ইচ্ছা হইল। বিনোদিনীর শেষ বাক্য-ঘাতের প্রতিঘাত না দিয়া, হঠাৎ তাহার কাছে আসিয়া বসিয়া কহিল, “তুমি আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছ কেন। কোনো অশ্রদ্ধা করিয়াছি?”

বিনোদিনী তখন একটু সরিয়া সেলাই হইতে মূগ্ধ তুলিয়া চাই দিশান

উদ্ভাস চক্ৰ মহেশ্বরের মূৰের উপর থিৰ থাকিয়া তহিল, "কর্তব্যাকৰ্ম হো
 নকালেই আছে । আপনি যে সকল ছাত্রিমা কালেছকৰ শাসনৰ মান, সে
 তি তাহাৰও অন্তৰ্ভুক্ত । অন্তৰ্ভুক্ত মাঠেই হইবে না ? আমাৰও কর্তব্য
 নাই ?"

মহেশ্ব তাহাে উত্তর অনেক ছাত্রিমা খুঁজিয়া পাইল না । কিছুকণ
 থাকিয়া বিজ্ঞানী করিল, "হোমার এজন কী কর্তব্য যে না কোই
 নব ?"

বিশ্বাসিণী অত্যন্ত সানন্দে পুচ্ছিত হুতা পরাইতে পড়াইতে করিল,
 "কর্তব্য আছে কি না, সে নিজেই জানে । আপনার কাছে তাহার
 'আমি কী তালিকা তি'।"

মহেশ্ব পক্ষীও চিত্রিত হুত্ব আলাপার ব'হিরে একটা পক্ষী নাহিকেন
 গাছের মাথার তিনে ছাত্রিমা অনেককণ চপ করিয়া বসিয়া করিল ।
 বিশ্বাসিণী নিঃশব্দে সেলাই করিয়া বাইরে লাগিল । তবে ছুঁচটি পড়িয়া
 লক শুনা যায়, এমনি হইল । অনেক কণ পরে মহেশ্ব হঠাৎ কথা করিল ।
 সবদায় নিঃশব্দতাক্তে বিশ্বাসিণী চমকিয়া উঠিল, তাহার মাঠে ছুঁচ
 কুটীনা দেল ।

মহেশ্ব করিল, "হোমারও কোনো অতনব-দিনেই বাধা বাইবে না।"

বিশ্বাসিণী তাহার আচর অকুণি হইতে বহুবিধ করিয়া বইয়া
 করিল, "বিশেষ তত এই অতনব-দিন । আমি থাকিলেই কী, আম না
 থাকিলেই কী । আপনার প্রাণেই কী আছে মান ।"

যদিও হঠাৎ গলগী যেন ছাড়ি বইয়া আসিল ; বিশ্বাসিণী অত্যন্ত
 দাধা নিঃ করিয়া সেলাইয়ের প্রতি এতাদ্ধ অনুমানিতল করিল—তল
 হইল, বহুতায় বা তাহ'ক না কলেই পরাংমানে একটুখানি তল । বোঝা
 বেশা গিয়াছে । মহেশ্ব অপরূপ হুত্ব চক্ৰের অকৃত্যে বিশ্বাসিণীর উপর
 করিলেছিল ।

মহেন্দ্ৰ মুহূৰ্ত্তের মধ্যে বিনোদিনীৰ হাত চাপিয়া ধৰিবা রুদ্ধ মজল স্বৰে কহিল, “যদি তাহাতে আমাৰ আসে যায়, তবে তুমি থাকিবে?”

বিনোদিনী ভাড়াভাড়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া সরিয়া বসিল। মহেন্দ্ৰের চমক ভাঙিয়া গেল। নিজেৰ শেষ কথাটা ভীষণ ব্যস্তের মতো তাহার নিজের কানে বারংবার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অপরাধী ভিত্তিকে মহেন্দ্ৰ দৃঢ় দ্বারা দংশন করিল। তাহার পর হইতে বসনা নির্বাক হইয়া রহিল।

এমন সময় এই নৈশক্যাপরিপূৰ্ণ ঘরের মধ্যে আশা প্রবেশ করিল।

বিনোদিনী তৎক্ষণাৎ যেন পূৰ্ব-কথোপকথনের অস্বস্তিকৰূপে হাসিয়া মহেন্দ্ৰকে বলিয়া উঠিল, “আমার গুমর তোমরা যখন এত বাড়াইলে, তখন আমারও কর্তব্য তোমাদের একটা কথা রাখা। যতক্ষণ না বিদায় দিবে ততক্ষণ রহিলাম।”

আশা স্বামীৰ কৃতকাৰ্য্যতায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া সখীকে আগিদান করিয়া ধরিল। কহিল, “তবে এই কথা রহিল! তাহা হইলে তিন-সত্য কবো, যতক্ষণ না বিদায় দিব ততক্ষণ থাকিবে, থাকিবে, থাকিবে।”

বিনোদিনী তিনবার স্বীকার করিল। আশা কহিল, “ভাই চোখের বালি, সেই যদি রহিলেই তবে এত করিয়া সাধাইলে কেন। শেষকালে আমার স্বামীৰ কাছে তো হার মানিতে হইল?”

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, “ঠাকুরপো, আমি হার মানিয়াছি না তোমাকে হার মানাইয়াছি?”

মহেন্দ্ৰ এতক্ষণ স্থম্ভিত হইয়া ছিল; মনে হইতেছিল, তাহার অপরাধে যেন সমস্ত ঘর ভরিয়া রহিয়াছে, লাঞ্ছনা যেন তাহার সৰ্বাঙ্গ পরিবেষ্টন করিয়া। আশাৰ সঙ্গে কেনন করিয়া সে প্রসঙ্গমুখে স্বাভাবিক ভাবে কথা কহিবে। এক মুহূৰ্ত্তের মধ্যে কেনন করিয়া সে আপনার গীতংস অসংমনকে সহাস্ত চতুলতায় পরিণত করিবে। এই পৈশাচিক ইচ্ছাজাল তাহার

এমন বেগে কহিল, সে কথা ঘরের মধ্যে গিয়া পৌছিল ।

ঘরের মধ্য হইতে তৎক্ষণাৎ আহ্বান আসিল, “বিহারী-ঠাকুরপো ।”

বিহারী কহিল, “একটু বামে আসছি, বিনোদ-বোঠান ।”

বিনোদিনী কহিল, “একবার শুনেই যাও-না ।”

বিহারী ঘরে ঢুকিয়াই মুহূর্তের মধ্যে একবার আশার দিকে চাহিল—

ঘোমটার মধ্য হইতে আশার মুখ বতটুকু দেখিতে পাইল, সেখানে বিবাদ বা বেদনার কোনো চিহ্নই তো দেখা গেল না । আশা উঠিয়া যাইবার চেষ্টা করিল, বিনোদিনী তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া বাগিল ; কহিল, “আচ্ছা, বিহারী-ঠাকুরপো, আমার চোখের ঝালির সঙ্গে কি তোমার সতিন-সম্পর্ক । তোমাকে দেখলেই ও পালাতে চায় কেন ।”

আশা অভ্যস্ত লজ্জিত হইয়া বিনোদিনীকে তাকুনা করিল ।

বিহারী হাসিয়া উত্তর করিল, “বিধাতা আমাকে তেমন স্বদৃষ্ট করিয়া গড়েন নাই বলিয়া ।”

বিনোদিনী । দেখছিস ভাই ঝালি ? বিহারী-ঠাকুরপো বাঁচাইয়া কথা বলিতে জানেন—তোমার কচিকে দোষ না দিয়া বিধাতাকেই দোষ দিলেন । লক্ষ্যটির মতো এমন স্থলঙ্গ দেবর পাইয়াও তাহাকে আদর করিতে শিখিলি না—তোমাই কপাল মন্দ ।

বিহারী । তোমার যদি তাহাতে দয়া হয় বিনোদ-বোঠান, তবে আর আমার আবেশ কিসের ।

বিনোদিনী । সমুদ্র তো পড়িয়া আছে, তবু মেঘের ধান্দা নহিলে চাতকের ভূফা মেটে না কেন ।

আশাকে ধরিয়া রাখা গেল না । সে জোর করিয়া বিনোদিনীর হাত ছাড়াইয়া বাহির হইয়া গেল । বিহারীও চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতে-ছিল । বিনোদিনী কহিল, “ঠাকুরপো, মহেন্দ্রবাবুর কী হইয়াছে বলিতে পার ?”

ଅମିତାୟ ବିହାରୀ ଏକଦିନା ଶିବିରା ଶାନ୍ତାବିନ । କହିଲ, “ଆମା ମୋ
ଆମି ନା । କିନ୍ତୁ ହେବାହେ ନାହିଁ ।”

ବିଲୋମିନୀ । କି ଆମି ଶାନ୍ତାବିନା, ଆମାହ ହୋ ଆମାହ ଦୋହ ହେ ନା ।

ବିହାରୀ ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନହୃଦ ଶୋକିତ ଉପର ବସିଲା ମଞ୍ଚିନ । ଅଧାର୍ତ୍ତା ଦୋହମା
ଅମିତାୟ ବସିଲା ଶିବିରାମିନୀର ନିକଟ ନିକଟ ବାସ ଆମାହ ଚାହିଁଲା ବସିଲା
କହିଲା କହିଲ । ବିଲୋମିନୀ କୋଣେ କଥା ନା ବସିଲା ବସିଲାବେଳେ ବିଲୋମିନୀ
କୋଣେ କହିଲେ ନାହିଁ ।

କିନ୍ତୁ ଅଧାର୍ତ୍ତା କହିଲା ବିହାରୀ କହିଲ, “ଅମିତାୟ ମହତ୍ତ୍ବ ଦୁମି କି
ବିଲୋମିନୀ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ କହିଲେ ।”

ବିଲୋମିନୀ ଅଧାର୍ତ୍ତା ବାସାବେଳେ କହିଲ, “କି ଆମି ଶାନ୍ତାବିନା,
ଆମାହ ହୋ ଆମାହ ଦୋହ ହେ ନା । ଆମାହ ଦୋହେର ବାସିନେ କହୁ ଆମାହ
କେବଳେ ଚାହିଁଲା ହେ ।” ବସିଲା ଶାନ୍ତାବିନା କେଣିଆ କୋଣେ ଚାହିଁଲା ଶାନ୍ତାବିନା
କୋଣେ ଚାହିଁଲା ହେ ।

ବିହାରୀ ବାସ ହେଲା କହିଲ, “ବୋମିନ, ଏକଟି ବୋମିନ ।”

ବସିଲା ଏକଟି ଶୋକିତ ବସିଲା ।

ବିଲୋମିନୀ କୋଣେ ମହତ୍ତ୍ବ ଆମାହ-କୋଣେ ମହତ୍ତ୍ବ ବସିଲା ବିଲୋମିନୀ କୋଣେ
ବାସି ଉପକାଶିଲା କୋଣେ ଚାହିଁଲା କୋଣେ ବିଲୋମିନୀ କୋଣେ ବାସିଲା ହେ
କହିଲ, “ଶାନ୍ତାବିନା, ଆମି ହୋ ବିଲୋମିନୀ ଏକଟି ବାସିନେ ନା—କିନ୍ତୁ ଆମି
ଚାହିଁଲା ଦୋହ ଆମାହ ଦୋହେର ବାସିନେ ଉପର ଏକଟି ବାସିନେ—କୋଣେ
କୋଣେ ନା ହେ ।”

ବସିଲା କୋଣେ ବିଲୋମିନୀ କୋଣେ ବାସିଲା କୋଣେ ବିଲୋମିନୀ କୋଣେ
ବାସିଲା କୋଣେ ବିଲୋମିନୀ କୋଣେ ବାସିଲା କୋଣେ ବିଲୋମିନୀ କୋଣେ ବାସିଲା

ବିହାରୀ ବସିଲା ଶାନ୍ତାବିନା, “ବୋମିନ, ବୋମିନ କୋଣେ ବାସିନେ ହେ ।
କୋଣେ ବିଲୋମିନୀ କୋଣେ ବିଲୋମିନୀ କୋଣେ ବିଲୋମିନୀ କୋଣେ ବିଲୋମିନୀ
କୋଣେ ବିଲୋମିନୀ କୋଣେ ବିଲୋମିନୀ କୋଣେ ବିଲୋମିନୀ କୋଣେ ବିଲୋମିନୀ

উপায় দেখি না।”

বিনোদিনী । ঠাকুরপো, তুমি তো সংসারের গতিক জ্ঞান । এখানে বরাবর থাকিব কেমন করিয়া । লোকে কী বলিবে ।

বিহারী । লোকে যা বলে বলুক, তুমি কান দিয়ে না । তুমি দেবী—অসহায় বালিকাকে সংসারের নিষ্ঠুর আঘাত হইতে রক্ষা করা তোমারই উপযুক্ত কাজ । বোঠান, আমি তোমাকে প্রথমে চিনি নাই, সেজন্য আমাকে ক্ষমা করো । আমিও সংকীর্ণহৃদয় সাধারণ ইতর লোকদের মতো মনে মনে তোমার সম্বন্ধে অজ্ঞান ধারণা স্থান দিয়াছিলাম ; একবার এমনও মনে হইয়াছিল, যেন আশার স্বপ্নে তুমি দ্বৈধ করিতেছ—যেন—কিন্তু সে-সব কথা মুখে উচ্চারণ করিতেও পাশ আছে । তার পরে, তোমার দেবী-হৃদয়ের পরিচয় আমি পাইয়াছি—তোমার উপর আমার গভীর ভক্তি জন্মিয়াছে বলিয়াই, আজ তোমার কাছে আমার সমস্ত অপরাধ স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিলাম না ।

বিনোদিনীর সর্বশরীর পুলকিত হইয়া উঠিল । যদিও সে ছলনা করিতেছিল, তবু বিহারীর এই ভক্তি-উপহার সে মনে মনেও মিশ্রা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না । এমন জিনিস সে কখনও কাহারও কাছ হইতে পায় নাই । কণকালের জন্ম মনে হইল, সে যেন স্বার্থহীন পবিত্র, উন্নত—আশার প্রতি একটা অনির্দেশ্য দয়ায় তাহার চোপ দিয়া চল পড়িতে লাগিল । সেই অশ্রুপাত সে বিহারীর কাছে গোপন করিল না, এবং সেই অশ্রুপাতা বিনোদিনীর নিজের কাছে নিভেকে পৃষ্ঠনীচা বলিয়া মোহ উৎপাদন করিল ।

বিহারী বিনোদিনীকে অশ্রু ফেলিতে দেখিয়া, নিজের অশ্রুবেগ সংবরণ করিয়া উঠিয়া বাহিরে নহেন্দ্রের ঘরে গেল । নহেন্দ্র যে হঠাৎ নিভেছে পাশও বলিয়া কেন ঘোষণা করিল, বিহারী তাহার কোনো তাৎপর্য বুঝিয়া পাইল না । ঘরে গিয়া দেখিল, নহেন্দ্র নাই । খবর পাইল,

মহেশ বেনাৰ্জীৰ জাতিৰ বৈশিষ্ট্য । পূৰ্বে মহেশ অকাল্প কৰ্মোদ্যম
 কাৰ্য্যমাৰ্গ ব্যৱহাৰ কৰিছিল না । অশুভচিত্তি জ্যোতিষক এয়ে অশুভচিত্তি প্ৰাণৰ
 বাহিৰে মহেশ্বৰ অকাল্প কাৰ্য্য ও পৰীক্ষা বোধ কৰিছিল । বিদ্যাপী জাতিৰ
 জাতিৰ পৰিচয় কৰিব লাগিছিল তেনে ।

ଦିନୋଦିନୀ ଆମାଙ୍କେ ବିଦେଶ ଶବ୍ଦମଧ୍ୟରେ ଆସିଲା, ବୁକ୍ସର ଥାଏ ଟାମିନା, ହୁଏ ଡକ୍ ଚମେ ଡାକିଲା ଅଛି, "ତାଟି ଡୋକେର ଲାମି, ଆସି ବାହା ହୁ-
ଡାଗିନୀ, ଆସି ଲୁହା ଅମଦା।"

আশা করিছ হইবা তাহাকে ব্যতীয়ে কোন করিয়া দেহান্তর
 দিলি, "কেন তাই, এমন কথা কেন বলিতেছ।"

তিনোমিণী বোম্বোনেচ্ছদিত শিশু২ মন্তো আশার বক্ষে দুৰ ব্যাধিয়া
 মছিল, “আমি সেখানে ব্যাধি২ সেখানে কেবল মলট হইসে । সে ফাট,
 আমাকে ছাড়িয়া দে, আমি আমার জগৎ২ মন্তো চলিয়া যাই ।”

ଆମା ଡିବୁକେ ହାତ ଯିବା ବିଲ୍ଲାସିନୀର ଦୁଃ କୃମିରା ଧରିବା ବାହ୍ୟ,
 "କଳୀଟି ଡାଟି, ଅନ୍ୟ କଥା ଯିଲି ନେ—ହେଲେ ଛାଡ଼ିବା ଆଦି ଆଦି
 ନାହିଁ ନା—ଆମାଲେ ଛାଡ଼ିବା ବାଟେକେ କଥା କେବେ କଥା ହୋଇ ଯିବେ
 ଆସିବେ ।"

[illegible][illegible]

এমন করিয়া চলিয়া যাইবার কথা ভুলিয়াছে। বিহারীবাবুর ভারি অগ্রায়। উহার মন ভালো নয়। আশা বিবর্ত হইয়া বাহির হইয়া আসিল। বিহারীও বিনোদিনীর প্রতি ভক্তির মাত্রা চড়াইয়া বিগলিত-হৃদয়ে দ্রুত প্রস্থান করিল।

সেদিন রাত্রে মহেন্দ্র আশাকে কহিল, “চুনি, আমি কাল সকালের প্যাসেঞ্জারেই কাশী চলিয়া যাইব।”

‘আশার বক্ষস্থল ধক্ করিয়া উঠিল; কহিল, “কেন।”

মহেন্দ্র কহিল, “কাকীমাকে অনেক দিন দেখি নাই।”

শুনিয়া আশা বড়োই লজ্জাবোধ করিল, এ কথা পূর্বেই তাহার মনে উদয় হওয়া উচিত ছিল। নিজের সুখহৃৎখের আকর্ষণে ব্রহ্মরম্মী মাসিমাকে সে যে ভুলিয়া ছিল, অথচ মহেন্দ্র সেই প্রবাসী-তপস্বিনীকে মনে করিয়াছে, ইহাতে নিম্নে কঠিনহৃদয়া বলিয়া বড়োই খিঙ্ককার জন্মিল।

মহেন্দ্র কহিল, “তিনি আমারই হাতে তাঁহার সংসারের একমাত্র স্নেহের ধনকে সমর্পণ করিয়া নিষ্কা চলিয়া গেছেন—তাঁহাকে একবার না দেখিয়া আমি কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছি না।”

বলিতে বলিতে মহেন্দ্রের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল; স্নেহপূর্ণ নীরব ‘আশীর্বাদ ও অব্যক্ত মদনকামনার সহিত বারংবার সে ‘আশার ললাট ও মস্তকের উপর দগ্ধ করতল চালনা করিতে লাগিল। আশা এই ‘অকস্মাত্ স্নেহাবেগের সম্পূর্ণ মর্ম বুঝিতে পারিল না, কেবল তাহার হৃদয় বিগলিত হইয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। আশাই সন্ধ্যাবেলায় বিনোদিনী তাহাকে অকারণে স্নেহাতিশয্যে যে-সব কথা বলিয়াছিল, তাহা মনে পড়িল। উভয়ের মধ্যে কোথাও কোনো যোগ আছে কি না, তাহা সে কিছুই বুঝিল না। কিন্তু মনে হইল, যেন ইহা তাহার জীবন দিগের একটা সূচনা। ভালো কি মন্দ কে জানে।

হঠাৎবুলজিত্তে সে মহেন্দ্রকে বাহ্যপাশে বন্ধ করিল। মহেন্দ্র তাহার

যে ভাবে যেমন করিয়াই তিনি হস্তক্ষেপ করিবেন, তাহাতেই মহেন্দ্রের
সাংসারিক বিপ্লব আরও দিগ্ধ বাড়াইয়া উঠিবে, ইহাই যখন নিশ্চয়
বুঝিলেন তখনই তিনি সংসার ত্যাগ করিলেন। ক্রয় শিশু যখন জন
চাহিয়া পান্দে, এবং জন সেওয়া যখন কবিরাজের নিতান্ত নিষেধ, তখন
পীড়িতচিত্তে মা যেমন অস্ত্র ঘরে চলিয়া যান, অন্নপূর্ণা তেমনি করিয়া
নিজেকে প্রবাসে লইয়া গেছেন। দূর তীর্থবাসে থাকিয়া ধর্মকর্মের নিয়মিত
অনুষ্ঠানে এ কয়দিন সংসার অনেকটা ভুলিয়াছিলেন, মহেন্দ্র আবার কি
সেই-সকল বিরোধের কথা তুলিয়া তাঁহার প্রচ্ছন্ন ক্ষতে আঘাত করিতে
আসিয়াছে।

কিন্তু মহেন্দ্র আশাকে লইয়া তাহার মার সম্মুখে কোনো নালিশের
কথা তুলিল না। তখন অন্নপূর্ণার আশঙ্কা অস্ত্র পথে গেল। যে মহেন্দ্র
আশাকে ছাড়িয়া কালেজে বাইতে পারিত না, সে আজ কাকীর খোঁজ
লটতে কাকী আসে কেন। তবে কি আশার প্রতি মহেন্দ্রের টান ক্রমে
টীলা হইয়া আসিতেছে। মহেন্দ্রকে তিনি কিছু আশঙ্কার সহিত দ্বিভ্রাসা
করিলেন, “হা যে মহিন, আমার মাথা খা, ঠিক করিয়া বস্ দেখি, চুনি
কেনন আছে।”

মহেন্দ্র কহিল, “সে তো বেশ ভালো আছে, কাকীমা।”

“মাত্রকাল সে কী করে মহিন। তোরা কি এখনও তেমনি ছেলে-
মাড়ি আছিস না কাজকর্মে ঘরকমারি বন দিয়াছিস।”

মহেন্দ্র কহিল, “ছেলেমাড়ি একেবারেই বড়। সকল কষ্টাটের দুল
সেই চারপাঠখানা যে কোথায় অল্প হইয়াছে, তাহার আর সন্ধান
পাইবার ভো নাই। তুনি থাকিলে দেখিয়া হুপি হইতে—লেখাপড়া
শেখায় অবহেলা করা স্বীকারের পক্ষে বহুদূর কর্তব্য, চুনি তাহা একান্ত-
মনে শালন করিতেছে।”

“মহিন, বিদ্যারী কী করিতেছে।”

ନାହାନ୍ତି କହିଲେ, “ନିଜର ସାତ ଜଣା ଆତ୍ମ-ସମ୍ପର୍କ ବାରିକେଇ । ନାଆଁ-
 ଗୋଲକାର ଆହାର ବିହୀନାନ୍ତରାଳରେ, କି ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ଆଜି ମିଳି ପରିବେଶ
 ପାରି ନା । ବିହୀନୀର ଚିହ୍ନକରଣ ଏହି ଧରା । ଆହାର ନିଜର ସାତ ମନ
 ଛାନ୍ଦେ, ଛାନ୍ଦର ସାତ ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ।”

ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି କହିଲେ, “କେ କି ଦିବ୍ୟ କହିବେ ନା, ନାହିଁ ।”

ନାହାନ୍ତି ଏକତୁଲ୍ୟାନ୍ତରାଳ କହିଲେ, “କହି, ବିହୀନୀର ଉପସ୍ଥାନ ବା
 ଛାନ୍ଦେ ନା ।”

କହିଲେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ଛାନ୍ଦର ଗୋଲକାର ସାତ ଛାନ୍ଦ ଆହାର ପାରିଲେ ।
 ଛାନ୍ଦେ ନିଜର କୃତ୍ରିମ ଆହାରାନ୍ତରାଳ, ଆହାର ବେଳାନ୍ତରାଳ କହିଲେ, ଏକତୁ
 ବିହୀନୀ ଆହାରର ଛାନ୍ଦେ ବିହୀନ କହିଲେ ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ, ଆହାର ଛାନ୍ଦେ
 ଛାନ୍ଦେ ଆହାର ଛାନ୍ଦେ କହିଲେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ । ବିହୀନୀ
 କହିଲେ, “କାଳୀନା, ଆହାରର ଆହାର ବିହୀନ କହିଲେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି
 କହିଲେ ନା ।” ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ।
 ଆହାର ଏକତୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ବିହୀନୀର ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ
 ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ଛାନ୍ଦେ ଆହାରାନ୍ତରାଳ, ଆହାର ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ
 ନାହିଁ । ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ଆହାର ବିହୀନ ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ, “ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି
 କି ଆହାର ଛାନ୍ଦେ ବିହୀନୀର ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ।”

ଛାନ୍ଦେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ, ଆହାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି
 ଆହାରାନ୍ତରାଳ ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ, ଛାନ୍ଦେ ବିହୀନୀର ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ
 ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ।

ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ, ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ
 ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ
 ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ
 ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ
 ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ ଛାନ୍ଦେ

হইয়াছিল, নেটা দেখিতে দেখিতে দূর হইয়া গেল। কয় দিন 'সর্বদা ধর্মপরায়াণা অন্নপূর্ণার স্নেহমুগ্ধছবি' সম্মুখে থাকিয়া, সংসারের কর্তব্যপালন এননি সহজ ও স্বপক্ব ননে হইতে লাগিল যে, তাহার পূর্বকার আতঙ্ক হান্তকর বোধ হইল। মনে হইল, বিনোদিনী কিছুই না। এমন-কি তাহার মুখের চেহারাও মনেস্ত্র স্পষ্ট করিয়া মনে আনিতে পারে না। অবশেষে মনেস্ত্র খুব জোর করিয়াই মনে মনে কহিল, 'আশাকে আনার জন্য হইতে এক চুল সরাইয়া বসিতে পারে এমন তো আমি কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাই না।'

মনেস্ত্র অন্নপূর্ণাকে কহিল, "কারীনা, আমার কালেক্স কানাই যাইতেছে—এবারকার নতো তবে আমি। যদিও তুমি সংসারের দ্বারা কাটাঁইয়া একান্তে আসিয়া আছ, তবু অশ্রুমতি করো, মাঝে মাঝে আসিয়া তোমার পায়ের ধূলা লইয়া যাটব।"

মনেস্ত্র গৃহে ফিরিয়া আসিয়া যখন আশাকে তাহার মাসির স্নেহোপহার শিঁড়ের কোটা ও একটি সাদা পাখরের চুনকি ঘটি দিল, তখন তাহার চোখ দিয়া বদকবু করিয়া জল পড়িতে লাগিল। মাসিমার সেই পরমস্নেহময় পৈথ এবং মাসিমার প্রতি তাহারের ও তাহার শাওড়ির নানাপ্রকার উপহ্রব স্বরণ করিয়া তাহার জন্ম ব্যাকুল হইয়া উঠিল। স্বামীকে জানাইল, "আমার বড়ো ইচ্ছা করে, আমি একবার মাসিমার কাছে গিয়া তাঁহার কমা ও পায়ের ধূলা লইয়া আসি। সে কি কোনো-মতেই ঘটিতে পারে না।"

মনেস্ত্র আশার বেন্না বুঝিল, এবং কিছু দিনের ছুট কাটতে সে তাহার মাসিমার কাছে যায়, ইহাতে তাহার বশতিও হইল। কিন্তু পুনরায় কালেক্স কানাই করিয়া আশাকে কানী পৌছাইয়া দিতে তাহার দ্বিধা বোধ হইতে লাগিল।

বিহারী মনে মনে উদ্বেগ হইল—বর্তমান কালের সাহেবিয়ানা স্বরণ করিয়া নহে। বিহারী ভাবিতে লাগিল, ‘ব্যাপারখানা কী। মহেন্দ্র যখন কাশী গেল, আশা এখানে রহিল; আবার মহেন্দ্র যখন ফিরিল তখন আশা কাশী যাইতে চাহিতেছে; দু-জনের মাঝখানে একটা কী গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছে। এমন করিয়া ষাট দিন চলিবে? বন্ধু হইয়াও আমরা ইহার কোনো প্রতিকার করিতে পারিব না—দূরে পাড়াইয়া থাকিব?’

মাতার ব্যবহারে অত্যন্ত দুরূহ হইয়া মহেন্দ্র তাহার শয়নঘরে আসিয়া বসিয়া ছিল। বিনোদিনী ইতিমধ্যে মহেন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নাই—তাই আশা তাহাকে পাশের ঘর হইতে মহেন্দ্রের কাছে লইয়া আসিবার উচ্চ অনুরোধ করিতেছিল।

এমন সময় বিহারী আসিয়া মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, “আশা-বোঠানের কি কাশী যাওয়া স্থির হইয়াছে।”

মহেন্দ্র কহিল, “না হইলে কেন। সাধাটা কী আছে।”

বিহারী কহিল, “বাপার কথা কে বলিতেছে। কিছু হঠাৎ এ খেয়াল তোমাদের মাঝায় আসিল যে?”

মহেন্দ্র কহিল, “মাসিমাকে দেখিবার ইচ্ছা, প্রবাসী আত্মীদের রক্ত ব্যাকুলতা, মানবচরিত্রে এমন বাবে বাবে ঘটিয়া থাকে।”

বিহারী জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি সঙ্গে যাইতেছ?”

প্রশ্ন শুনিয়াই মহেন্দ্র ভাবিল, জেষ্ঠ্যের সঙ্গে আশাকে পাঠানো সংগত নহে, এই কথা লইয়া আলোচনা করিতে বিহারী আসিয়াছে।—পাছে অধিক কথা বলিতে গেলে হোম উদ্ভূসিত হইয়া উঠে, তাই সংকোচ পবিল, “না।”

বিহারী মহেন্দ্রকে চিনিত। সে যে রাগিয়াছে, তাহা বিহারীর অগোচর ছিল না। একবার দিগ ধরিলে তাহাকে টানানো যায় না, তাহাও সে জানিত। তাই মহেন্দ্রের বাগ্যের কথা আর তুলিল না।

ସମେ ସମେ ଡାକିଲେ, 'ବୋହୌ, ଆଜ୍ଞା ସବି ହୋଇଲା ହେଲା ଏବେ କହିଲୁଣି
 ତୁମ୍ଭା ସଂପର୍କରେ ଯଦି, ତୁମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବିନିକି ମୋର ଗର୍ବର ସାହସ, ଯଦିଏ
 ତାହା ଶୁଣି ଶୁଣି କହିଲେ, 'ବିଲୋ-ବୋହୌ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ମୋର ଗର୍ବ ହେଲା' ।

ସେହି ସମୟେ ଡାକିଲା ଡାକିଲା, 'ବିଲୋ-ବୋହୌ, ସମେ ଦିଅର ସେ
 ଯଦିଏ ଆଜ୍ଞା, ତୁମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ କହିଲୁଣି କହିଲା । ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କହିଲେ
 କହିଲେ କୋଲା କହିଲେ କହିଲା । ଆଜି ତାହା, ତୁମ୍ଭେ ସମେ ସମେ
 କହିଲେ, ଆଜି ବିଲୋ-ବୋହୌ କହିଲେ କହିଲା । ତୁମ୍ଭେ କହିଲା । ଆଜି କହିଲା
 କହିଲା । ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କହିଲେ କହିଲେ କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା
 କହିଲା । ତୁମ୍ଭେ ସମେ କହିଲେ କହିଲା । କହିଲେ କହିଲେ କହିଲା କହିଲା
 କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା
 କହିଲା ଏବଂ କହିଲେ କହିଲେ କହିଲେ କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା
 କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା
 କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା

ସେହି ସମୟେ ସମେ କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା
 କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା
 କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା
 କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା
 କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା
 କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା
 କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା

କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା

କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା
 କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା

କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା
 କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା

କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା
 କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା କହିଲା

বিহারী কহিল, “না না, বোঠান, সে হইবে না, সে কিছুতেই হইবে না। তোমাকে মিনতি করিতেছি—আমার কণায় কিছুই করিযো না। আমি এখানকার কেহ নই, আমি এখানকার কিছুতেই হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না, তাহাতে ভালো হইবে না। তুমি দেবী, তুমি যাহা ভালো বোধ কর, তাহাই করিযো। আমি চলিলাম।”

বলিয়া বিহারী বিনোদিনীকে বিনয় নমস্কার করিয়া চলিল। বিনোদিনী কহিল, “আমি দেবী নই ঠাহরপো, শুনিয়া যাও। তুমি চলিয়া গেলে কাহারও ভালো হইবে না। ইহার পরে আমাকে দোষ দিযো না।”

বিহারী চলিয়া গেল। মহেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া ছিল। বিনোদিনী তাহার প্রতি অলস বস্ত্রের নতো একটা কঠোর কটাক্ষ নিষ্ক্ষেপ করিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল। সে ঘরে আশা একান্ত লজ্জায় সংকোচে বসিয়া যাইতেছিল। বিহারী তাহাকে ভালোবাসে, এ কথা মহেন্দ্রের মূখে শুনিয়া সে আর মুখ তুলিতে পারিতেছিল না। কিন্তু তাহাব উপর বিনোদিনীর আর দয়া হইল না। আশা যদি তখন চোপ তুলিয়া চাহিত, তাহা হইলে সে ভয় পাইত। সমস্ত সংসারের উপর বিনোদিনীর যেন ধূন চাপিয়া গেছে। মিথ্যা কথা বটে! বিনোদিনীকে কেহই ভালোবাসে না বটে! সকলেই ভালোবাসে এই লজ্জাবতী ননির পুতুলটিকে।

মহেন্দ্র সেই যে আশেগের মূখে বিহারীকে বলিয়াছিল ‘আমি পাথর’— তাহার পর আবেগ-শাস্তির পর হইতে সেই হঠাৎ আত্মপ্রকাশের জড় সে বিহারীর কাছে কুঠিত হইয়া ছিল। সে মনে করিতেছিল, তাহার সব কথাই যেন ব্যক্ত হইয়া গেছে। সে বিনোদিনীকে ভালোবাসে না, অথচ বিহারী আনিয়াছে যে সে ভালোবাসে—ইহাতে বিহারীর উপরে তাহার বড়ো একটা বিরক্তি জন্মিতেছিল। বিশেষত, তাহার পর হইতে যতদূর বিহারী তাহার সম্মুখে আসিতেছিল তাহার নজ হইতেছিল, যেন বিহারী সকৌতুক তাহার একটা চিত্রকর কথা সুঁতিয়া বেড়াইতেছে। সেই-

তাহাকে ভালোবাসি না স্পষ্ট করিয়া বলিলাম, তখন সে কোনো স্বেযোগে আমার কাছে তাহার ভালোবাসা প্রত্যাখ্যান না করিয়া কী করিবে। এমন করিয়া আমার কাছে অবমানিত হইয়া হয়তো সে বিহারীকে ভালোবাসিতেও পারে।’

মহেন্দ্ৰের নোভ এতই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল যে, নিজের চাখলো সে নিজে আশ্চর্য এবং ভীত হইয়া উঠিল। নাহয় বিনোদিনী শুনিয়াছে, মহেন্দ্ৰ তাহাকে ভালোবাসে না—তাহাতে দোষ কী। নাহয় এই কথায় অভিমানিনী বিনোদিনী তাহার উপর হইতে মন সরাইয়া লইতে চেষ্টা করিবে—তাহাতেই বা ক্ষতি কী।

কণ্ডের সময় নৌকার শিকল খেঁদন নোঙরকে টানিয়া ধরে, মহেন্দ্ৰ তেমনি ব্যাকুলতার সঙ্গে আশাকে খেঁদ অতিরিক্ত জোর করিয়া ধরিল।

রাত্রে মহেন্দ্ৰ আশার মুখ বন্ধের কাছে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি, তুমি আমাকে কতখানি ভালোবাস ঠিক করিয়া বলো।”

আশা ভাবিল, ‘এ কেমন প্রশ্ন। বিহারীকে লইয়া অত্যন্ত লজ্জান্বনক যে কথাটা উঠিয়াছে, তাহাতেই কি তাহার উপরে সংশয়ের ছায়া পড়িয়াছে।’

সে লজ্জায় মরিয়া গিয়া কহিল, “ছি ছি, আর তুমি এমন প্রশ্ন কেন করিলে। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে ধুনিয়া বলো—আমার ভালোবাসায় তুমি কবে কোথায় কী অভাব লেগিয়াছ।”

মহেন্দ্ৰ আশাকে পীড়ন করিয়া তাহার নাসূর্ব বাহির করিবার জন্ত কহিল, “তবে তুমি কানী ঘাইতে চাহিতেছ কেন।”

আশা কহিল, “আমি কানী ঘাইতে চাই না, আমি কোথাও ঘাইব না।” মহেন্দ্ৰ। তখন তো চাহিয়াছিলে।

আশা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া কহিল, “তুমি তো জান, কেন চাহিয়া-ছিলাম।”

ସମାପ୍ତ । ଆଜିକିଂକେ ତାହାଙ୍କୁ ଯୋଗାଣ କରାଯିବ କିମ୍ବା ନାହିଁ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ସମୟରେ
ସାବଧାନ ।

ଆଜିକିଂକେ ତାହାଙ୍କୁ ଯୋଗାଣ କରାଯିବ କିମ୍ବା ନାହିଁ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ସମୟରେ

ଆଜିକିଂକେ ତାହାଙ୍କୁ ଯୋଗାଣ କରାଯିବ କିମ୍ବା ନାହିଁ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ସମୟରେ

ଆଜିକିଂକେ ତାହାଙ୍କୁ ଯୋଗାଣ କରାଯିବ କିମ୍ବା ନାହିଁ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ସମୟରେ

ଆଜିକିଂକେ ତାହାଙ୍କୁ ଯୋଗାଣ କରାଯିବ କିମ୍ବା ନାହିଁ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ସମୟରେ

ଆଜିକିଂକେ ତାହାଙ୍କୁ ଯୋଗାଣ କରାଯିବ କିମ୍ବା ନାହିଁ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ସମୟରେ

লাগিল; তাহাকে হৃদয় করিয়া সেই মুখে আবার রক্তের রেখা, প্রাণের প্রবাহ, হাতের বিকাশ দেখিবার জন্য বিনোদিনীর একটা অধীর ঔৎসুক্য জন্মিল।

দুই-তিনদিন সকল কর্মের মধ্যে এইরূপ উন্মনা হইয়া ফিরিয়া বিনোদিনী আর থাকিতে পারিল না। বিনোদিনী একখানি সাহসার পত্র লিখিল, কহিল—

ঠাকুরপো, আমি তোনার সেদিনকার সেই শুক যুগ দেখিয়া অবশি প্রাণমনে কাদনা করিতেছি, তুমি হৃদয় হও, তুমি যেমন ছিলে তেমনিটি হও—সেই সহস্র হাসি আবার কবে দেখিব, সেই উদার কথা আবার কবে শুনিব। তুমি কেমন আছ, আমাকে একটি ছত্র লিখিয়া জানাও।

তোমার বিনোদ-বোঠান

বিনোদিনী দ্বন্দ্বোদ্যানের হাত দিয়া বিহারীর ত্রিকানায় চিঠি পাঠাইয়া দিল।

আশাঞ্চে বিহারী ভালোবাসে, এ কথা যে এমন রুচ করিয়া এমন গর্হিতভাবে মহেশ্বর মুখে উচ্চারণ করিতে পারিবে, তাহা বিহারী স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই। কারণ, সে নিজেও এমন কথা স্পষ্ট করিয়া কখনও মনে স্থান দেয় নাই। প্রথমটা বহুহত হইল—তার পরে কোথায় ঘুণায় ছটফট করিয়া বলিতে লাগিল, ‘অজ্ঞায়! অসংগত! অনুলক!’

কিছু কথাটা যখন একবার উচ্চাখিত হইয়াছে, তখন তাহাকে আর সম্পূর্ণ মারিয়া ফেলা যায় না। তাহার মধ্যে যেটুকু সত্যের বীজ ছিল, তাহা দেখিতে দেখিতে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কত দেখিবার উপলক্ষ্যে সেই-যে একদিন সূর্যাস্তকালে বাগানের উজ্জ্বলিত পুষ্পগন্ধ-প্রবাহে লজ্জিতা বালিকার হৃদয়ের সুখানিকে সে নিতান্তই আপনার

কেবল শেষবার, তেমনি করিয়া ভিতরে গিয়া ঘরের ছেলের মতো রাজলক্ষীর সহিত কথা সারিয়া, একবার ঘোমটাবৃত আশাকে নোঠান বলিয়া ছুটো তুচ্ছ কথা কহিয়া আসা তাড়াতাড়ি আছে পরম আকাঙ্ক্ষার বিষয় হইয়া উঠিল।

সাধুচরণ কহিল, “ভাই, অদ্ভুতকারে দাঁড়াইয়া রহিলে যে, ভিতরে চলো।”

শুনিয়া বিহারী দ্রুত বেগে ভিতরের দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই বিদ্রিমা সাধুকে কহিল, “যাট, একটা কাজ আছে।”

বলিয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিল।

সেই রাত্রেই বিহারী পশ্চিমে চলিয়া গেল।

দরোয়ান বিনোদিনীর চিঠি লইয়া বিহারীকে না পাইয়া চিঠি ফিরাইয়া লইয়া আসিল। মহেন্দ্র তখন দেউড়ির সম্মুখে ছোটো বাগানটিতে বেড়াইতেছিল। জিজ্ঞাসা করিল, “এ কাহার চিঠি।”

দরোয়ান সমস্ত বলিল। মহেন্দ্র চিঠিখানি নিজে লইল।

একবার সে ভাবিল, চিঠিখানা লইয়া বিনোদিনীর হাতে দিবে—অপরাদিনী বিনোদিনীর লঙ্ঘিত মুখ একবার সে দেখিবার আসিবে, কোনো কথা বলিবে না। এষ্ট চিঠির মধ্যে বিনোদিনীর লজ্জার কাব্য যে আছেই, মহেন্দ্রের মনে তাহাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। মনে পড়িল, পূর্বে আর একদিন বিহারীর নামে এমন একখানা চিঠি গিয়াছিল। চিঠিতে কী লেখা আছে, এ কথা না জানিয়া মহেন্দ্র কিছুতেই হির থাকিতে পারিল না। সে মনকে বুকাইল—বিনোদিনী তাহার অভিভাবকতায় আছে, বিনোদিনীর ভালোমন্দের দল সে দায়ী। অতএব এরূপ সন্দেহজনক পত্র খুলিয়া দেখাই তাহার কর্তব্য। বিনোদিনীকে বিশেষ দাইতে দেখা কোনোমতেই হইতে পারে না।

মহেন্দ্র তাহার জবাব না দিয়াই চলিয়া গেল। বিহাবী চিঠি খুলিয়া পড়িয়া কোনো উত্তর না দিয়া চিঠি ফেরত পাঠাইয়াছে, মনে করিয়া বিনোদিনীর সর্বাপেক্ষা শিরা দব্, দব্, করিতে লাগিল। যে দরোয়ান চিঠি লইয়া গিয়াছিল, তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইল, সে অল্প কাছের অল্পপস্থিত ছিল, তাহাকে পাওয়া গেল না। প্রদীপের মূখ হইতে যেমন জলন্ত তৈলবিন্দু ফরিয়া পড়ে, কৃষ্ণ শয়নকক্ষের মধ্যে বিনোদিনীর দীপ্ত নেত্র হইতে তেমনি হৃদয়ের জালা অশ্রুজলে গলিয়া পড়িতে লাগিল। নিজের চিঠিখানা ছিঁড়িয়া-ছিঁড়িয়া কুটি-কুটি করিয়া কিছুতেই তাহার সাধনা হইল না—সেই ছই-চারি লাইন কালীর দাগকে অতীত হইতে, বর্তমান হইতে, একেবারেই মুছিয়া ফেলিবার, একেবারেই ‘না’ করিয়া দিবার কোনো উপায় নাই কেন। জুঁকা মধুকরী যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই দংশন করে, কুজা বিনোদিনী তেমনি তাহার চারি দিকের সমস্ত সংসারটাকে জালাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। সে যাহা চায় তাহাতেই বাধা ? কোনো-কিছুতেই কি সে কৃতকার্য হইতে পারিবে না। অথ যদি না পাইল, তবে যাহারা তাহার সকল অংশের অন্তরায়, যাহারা তাহাকে কৃতার্থতা হইতে ঝট, সমস্ত সম্ভবপর সম্পদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, তাহাদিগকে পরাণে ধূলিনুষ্ঠিত করিলেই তাহার বার্থ জীবনের কর্ম সমাধা হইবে।

২৫

সেদিন নূতন কাহনে প্রধান বসন্তের হাওয়া গিতেই আশা অনেক দিন পরে সম্ভাব্য আয়ত্তে ছাড়ে নাহর পাতিয়া বসিয়াছে। একপানি মাসিক কাগজ লইয়া পণ্ডা প্রকাশিত একটা গল্প খুব মনোযোগ দিয়া সেই অল্প আলোকে পড়িতেছিল। গল্পের নায়ক তখন সংবৎসর পরে পুরার চূড়িতে বাড়ি আসিবার সময় স্ত্রীকাতের হাতে পড়িয়াছে, আশার হৃদয় উদ্বেগে

আশাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মহেন্দ্র কহিল, “তোমার যাইতে ইচ্ছা করে না ?”

এ কথায় উত্তর দেওয়া কঠিন। মাগিকে দেখিবাব জন্ত যাইতে ইচ্ছা করে, আবার মহেন্দ্রকে ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছাও করে না। আশা কহিল, “কালেজের ছুটি পাইলে তুমি যখন যাইতে পারিবে, আমিও সঙ্গে যাইব।”

মহেন্দ্র। ছুটি পাইলেও যাইবার জো নাই ; পরীকার জন্ত প্রস্তুত হইতে হইবে।

আশা। তবে থাক, এখন না’ই গেলাম।

মহেন্দ্র। থাক কেন। যাইতে চাহিয়াছিলে, যাও-না।

আশা। না, আমার যাইবার ইচ্ছা নাই।

মহেন্দ্র। এই সেদিন এত ইচ্ছা ছিল, হঠাৎ ইচ্ছা চলিয়া গেল ?

আশা এই কথায় চুপ করিয়া, চোপ নিচু করিয়া, বসিয়া রহিল।

বিনোন্নিমীর সঙ্গে সন্ধি করিবার জন্ত বাধ্যতামূলক অবসর চাহিয়া মহেন্দ্রের মন ভিতবে ভিতরে অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। আশাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার একটা অদারণ রাগের স্ফূর্তি হইল। কহিল, “আমার উপর মনে মনে তোমার কোনো সন্দেহ প্রদ্বিষ্ট আছে নাকি। তাই আমাকে চোখে চোখে পাহারা দিয়া রাখিতে চাও ?”

আশার আভাবিক দুহতা নষ্টতা পৈণ মহেন্দ্রের কাছে হঠাৎ অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। মনে মনে কহিল, ‘মাগির কাছে যাইতে ইচ্ছা আছে, বাংলা যে, আমি যাইবই, আমাকে যেমন করিয়া হোক পাঠাইয়া দাও। তা নয়, কখনও হ্যাঁ, কখনও না, কখনও চুপচাপ— এ কী রকম।’

হঠাৎ মহেন্দ্রের এই উগ্রতা দেখিয়া আশা নিম্নিত ভীত হইয়া উঠিল। সে অনেক চেষ্টা করিয়া কোনো উত্তরই ভাবিয়া পাইল না। মহেন্দ্র কেন যে কখনও হঠাৎ এত আদর করে, কখনও হঠাৎ এমন নির্ভর হইয়া উঠে,

পাশে শোওয়াইল। আশার যৌনলগ্নে থাকিলে সে কহিল, “মাসিকে কি আমার দেখিতে যাইবার ইচ্ছা করে না। কিন্তু তোমাকে ফেলিয়া আমার যাইতে মন সরে না। তাই আমি যাইতে চাই নাই, তুমি রাগ করিয়ো না।”

মহেন্দ্র ধীরে ধীরে আশার অর্ধ কপোল মুছাইতে মুছাইতে কহিল, “এ কি রাগ করিবার কথা, চুনি। আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পার না, সে লইয়া আমি রাগ করিব ? তোমাকে কোথাও যাইতে হইলে না।”

আশা কহিল, “না, আমি কান্দে যাইব।”

মহেন্দ্র। কেন।

আশা। তোমাকে মনে মনে মনেই করিয়া যাইতেছি না— এ কথা যখন একবার তোমার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে, তখন আমাকে কিছু দিনের জগৎ ও যাইতেই হইবে।

মহেন্দ্র। আমি পাপ করিলাম, তাহার প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে করিতে হইবে ?

আশা। তাহা আমি জানি না— কিন্তু পাপ আমার কোনোখানে হইয়াছেই, নহিলে এমন-সকল অসম্ভব কথা উঠিতেই পারিত না। যে-সব কথা আমি স্বপ্নেও ভাবিতে পারিতাম না, সে-সব কথা কেন শুনিতে হইতেছে।

মহেন্দ্র। তাহার কারণ, আমি যে কী দল লোক তাহা তোমার স্বপ্নেরও অগোচর।

আশা ব্যস্ত হইয়া কহিল, “স্বাভাব ! ও কথা বলিয়া না। কিন্তু এমনি আমি কান্দে যাইবই।”

মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, “আজ্ঞা যাও, কিন্তু তোমার চোখের আড়ালে আমি যদি নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে কী হইবে।”

আশা কহিল, “তোমার আর অস্তিত্ব দেখাইতে হইবে না, আমি

विना हस्तित कविः प्रोक्तः ।

২২। জিব্বা-গে-চি-ব। হোমার এবং ক্রিস্টোফার ক্রিস্টোফ
 লিওনার্ড হাফ, ১৮৮৩ এর জন্য জার্মানি থেকে প্রাপ্ত।

ସଂଖ୍ୟା । ପ୍ରାୟ: ୧୫୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ । ପ୍ରାୟ: ୫୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ।

ସମସ୍ତଙ୍କ । ଦୟା କରନ୍ତୁ । (୧୫) ସୌମ୍ୟ କବିତା ।

५१०। ५५५-५६४।

[illegible]

ଏହି ଅଭିଳାଷ ସମ୍ପାଦକ 'ସଂସ୍କୃତ ଶାସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା' ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ।

विष्णुसहस्रनाम स्तोत्रम् । अथ विष्णुसहस्रनाम । १००० ।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

କଳା କାନ୍ଥର ଘରଟି କଞ୍ଚିଲେ "ସାବନା ବାନ୍ଧ କାନ୍ଥରୁ ଖସିଲା । ସାବନା
କାନ୍ଥର ଘର ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ତେଣୁ କାନ୍ଥର ଘର ଖୋଲି ଦେଖିଲେ
କାନ୍ଥର ଘର ଖୋଲି ଦେଖିଲେ କାନ୍ଥର ଘର ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ।"

ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ, "ସଂସ୍କୃତ"।

पुनर्जातः ॥३॥ विदितः ॥३॥

ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰੇ ਜਿਸ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
 ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰੇ ਜਿਸ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

[illegible][illegible]

1. (a) $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (b) $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 2. (a) $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (b) $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

শুনিস নাই। এ-সকল কথা যখন উঠিল তখন কি আর বাহির হওয়া উচিত—তুমিই বলো-না, ভাই বালি।

ঠিক উচিত যেমনহে, তাহা আশা বৃদ্ধি। এ-সকল কথার লজ্জাকরতা যে কত দূর, তাহাও সে নিশ্চয় মন হইতেই সম্প্রতি বৃদ্ধিযাচ্ছে। তবু বলিল, “কথা অমন কত উঠিয়া থাকে, সে-সব যদি না সহিতে পারিস তবে আর ভালোবাসা কিসের ভাই। ‘ও কথা হুলিতে হইবে।’

বিনোদিনী। আচ্ছা ভাই, ভুলিব।

আশা। আমি তো ভাই, কাল কালী বাইব, আমার স্বামীর যাহাতে কোনো অহুবিধা না হয়, তোমাকে সেইটে বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে। এখনকার মতো পালাইয়া বেড়াইলে চলিলে না।

বিনোদিনী চুপ করিয়া রহিল। আশা বিনোদিনীর হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, “নাথো গা ভাই বালি, এই কথাটা আমাকে দিতেই হইবে।”

বিনোদিনী কহিল, “আচ্ছা।”

২৬

এক দিকে চল অত যায়, আর-এক দিকে সূর্য উঠে। আশা চলিয়া গেল, কিন্তু মহেন্দ্রের ভাগ্যে এখনও বিনোদিনীর বেধা নাই। মহেন্দ্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখায়, মাঝে মাঝে ছুতা করিয়া সময়ে অসময়ে তাহার মার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হয়, বিনোদিনী কেবলই কাকি দিয়া পালায়, ধরা দেয় না।

দ্বাত্তনন্দী মহেন্দ্রের এইরূপ অত্যন্ত শূন্ততান বেধিয়া ভাবিলেন, ‘বউ গিয়াছে, তাই এ বাড়িতে মহিনের কিছুই আর ভালো লাগিতেছে না।’

দ্বাত্তনন্দ মহেন্দ্রের স্ববক্তব্যের পক্ষে মা যে বউয়ের তুলনায় একান্ত অনাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, তাহা মনে করিয়া ঠাট্টাকে বিসিল; তবু মহেন্দ্রের এই কলৌছাকা দিগ্ধ ভাব দেখিয়া তিনি কেমনা পাইলেন।

ଦିନାମିନୀଙ୍କ ଡାକିବା କରିବେ, “କୌଣି ବିଲୁପ୍ତପଦ ନର ହୌତେ କାହା
 ଶାସନିର ନୟନ ହୈଲକେ । ଆସି ଏକ କାହାଣୀର ନିମିତ୍ତ ଡାକିବା ଏକ
 ନିମିତ୍ତ ହାତେ ନାହିଁ ନା । ଏହାକାଳେ ଗାନ୍ଧୀ, ଲିଙ୍ଗ ଡାକିବା କରିବେ କାହା
 ନାହାନ୍ତେ କହୁଛି ଦେଖିବେ ହୈଲକେ । କହାବଦାନ କହାଣୀ, ଏକଦମ କୋ, କା
 ନା କାହାଣୀର ନିମିତ୍ତ ଡାକିବେ ନାହିଁ ନା । କୋହା କା, କୌ ହାହାଣୀ ନର ହୈଲକେ
 ଏ କେବଳ ଏକଦମ ହୌତା ହେବେ । ଏହାକାଳେ କହା କହି, କେବଳ କାହାଣୀ କୋ ।”

ଦିନାମିନୀ ଏହାକାଳେ କହା କାହାଣୀର ନିମିତ୍ତ ହାହାଣୀର ନିମିତ୍ତ କାହାଣୀ
 କାହାଣୀ କରିବେ, “କୌ କୌ, କୌ କାହାଣୀର ନିମିତ୍ତ । କାହାଣୀର ନିମିତ୍ତ
 କିଛି ନାହିଁ । କୋ କାହା ନର ହୈଲକେ, କୌ କାହାଣୀର ନର ହୈଲକେ ।”

ଦିନାମିନୀ କାହାଣୀ, “କାହାଣୀ, କାହାଣୀ, କାହାଣୀ ।”

କାହାଣୀ କରିବେ, “କାହାଣୀ, କାହାଣୀ, କାହାଣୀ । କୋ, କାହାଣୀ, କାହାଣୀ
 କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ ।”

କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ
 କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ
 କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ
 କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ

କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ
 କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ
 କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ
 କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ
 କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ
 କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ
 କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ

କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ

দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। দ্বার খুলিয়াই দেখিল চন্দনগুঁড়া ও ধূনার গন্ধে ঘর আনোদিত হইয়া আছে, মশারিতে গোলাপি বেশমের ঝালর লাগানো, নীচের বিছানায় শুভ্র ছাজিন্ তক্ততক্ত করিতেছে, এবং তাহার উপরে পূর্বকার পুরাতন তাকিয়ার পরিবর্তে বেশম ও পশমের ফুল-কাটা বিলাতি চৌক। বালিশ স্ফুস্কিত—তাহার কারুকার্য বিনোদিনীর বচ দিনের পরিশ্রমজাত। আশা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত, ‘এগুলি তুই কার দ্বারা তৈরি করিতেছিস, ভাই।’ বিনোদিনী হাসিয়া বলিত, ‘আমার চিতাশয্যার দ্বারা। মরণ ছাড়া তো সোহাগের লোক আমার আর কেহই নাই।’

দেয়ালে মহেন্দ্রের যে বাধানো ফোটোগ্রাফখানি ছিল, তাহার হ্রেনের চার কোণে রঙিন ক্ষিত্যর দ্বারা সূনিপুণ ভাবে চারিটি গ্রন্থি বাধা, এবং সেই চব্বির নীচে ভিত্তিগাত্রে একটি টিপাইয়ের দুই ধারে দুই ফুলদানিতে ফুলের তোড়া, যেন মহেন্দ্রের প্রতিমূর্তি কোনো অজ্ঞাত ভক্তের পূজা প্রাপ্ত হইয়াছে। সবস্বচ্ছ সমস্ত ঘরের চেহারা অস্তরকম। পাট যেখানে ছিল সেখান হইতে একটুখানি সরানো। ঘরটিকে দুই ভাগ করা হইয়াছে; ‘পাটের সম্মুখে চুতি বড়ো আলনার কাপড় কুলাইয়া দিয়া আড়ালের মতো প্রস্থত হওয়ায় নীচে বসিবার বিছানা ও রায়ে শুইবার বাট স্বতন্ত্র হইয়া গেছে। যে আলমারিতে আশার সমস্ত শব্দের জিনিস চীনের খেলনা প্রভৃতি সাজানো ছিল, সেই আলমারির নীচের দরজায় ভিতরের গায়ে লাল সাদা দূষিত করিয়া মাখিয়া দেওয়া হইয়াছে; এখন আর তাহার ভিতরের কোনো জিনিস দেখা যায় না। ঘরের মধ্যে তাহার পূর্ব-ইতিহাসের যে-কিছু চিহ্ন ছিল, তাহা নূতন হস্তের নব মল্লার সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হইয়া গেছে।

পরিশ্রান্ত মহেন্দ্র বেদের উপরকার শুভ্র বিছানায় শুইয়া নূতন বালিশ-গুলির উপর মাথা রাখিয়া মাত্র একটি বৃত্ত স্বপ্নের অস্তরভব করিল—বালিশের

মহেন্দ্র কহিল, “খাবার সময় হাজির ছিলে না, এখন খাবার পরে হাজরি পোকাইয়া আরও পাওনা বাড়ি থাকিবে।”

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, “তোমার হিসাব যে-রকম বড়াকড়, তোমার হাতে একবার পড়িলে আর উদ্ধার নাই দেখিতেছি।”

মহেন্দ্র কহিল, “হিসাবে বাই থাক, আদায় কি করিতে পারিলাম।”

বিনোদিনী কহিল, “আদায় করিবার মতো আছে কী। তবু তো বন্দী করিয়া রাখিয়াছ।”

বলিয়া ঠাট্টাকে হঠাৎ গাভীরে পরিণত করিয়া দ্রবৎ একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

মহেন্দ্রও একটু গভীর হইয়া কহিল, “ভাই বালি, এটা কি তবে ছেলখানা।”

এমন সময় বেহারা নিয়মমত আলো আনিয়া টিপাইয়ের উপর রাখিয়া চলিয়া গেল।

হঠাৎ চোখে আলো লাগাতে মুখের সামনে একটু হাতের আড়াল করিয়া নতনেত্রে বিনোদিনী বলিল, “কী জানি ভাই। তোমার সঙ্গে কথায় কে পারিলে। এমন যাট, কাজ আছে।”

মহেন্দ্র হঠাৎ তাহার হাত চাপিয়া পরিয়া কহিল, “বন্ধন যখন খাঁকার করিয়াছ, তখন বাইবে কোথায়।”

বিনোদিনী কহিল, “ছি চি, ছাড়ো। বাহার পালাইবার রাখা নাই, তাহাকে আদায় দাখিবার চেষ্টা কেন।”

বিনোদিনী চোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

মহেন্দ্র সেই বিদ্যানাথ সুগন্ধ ব্যালিশের উপর পড়িয়া রহিল, তাহার বকের মধ্যে যত্নে হোলপাত করিতে লাগিল। নিবৃত্ত সহ্যা, নির্গম মন্ত, নবমস্তের পাতাঙ্গ দিতেছে, বিনোদিনীর মন যেন ধরা দিল-দিল—উদ্ধার মহেন্দ্র আপনাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিবে না এমনি বোধ হইল।

আর অধিক দিন আমাকে একা ফেলিয়া রাখিয়ে না। আমার জীবনের লক্ষী তুমি—তুমি না থাকিলেই আমার সমস্ত প্রবৃত্তি শিকল ছিঁড়িয়া আমাকে কোন্ দিকে টানিয়া লইতে চায়, বুঝিতে পারি না। পপ দেখিয়া চলিব, তাহার আলো কোথায়—সে আলো তোমার বিশ্বামর্গ ছুটি চোপের প্রেমসিঁদু দৃষ্টিপাত। তুমি শীঘ্র এসো, আমার শুভ, আমার ধ্রুব, আমার এক। আমাকে স্থির করো, রক্ষা করো, আমার হৃদয় পরিপূর্ণ করো। তোমার প্রতি লেশমাত্র অজ্ঞায়ের মহাপাপ হইতে, তোমাকে মূর্ছাকাল-বিস্মরণের নিভীমিকা হইতে আমাকে উদ্ধার করো।'

এমনি করিয়া মহেন্দ্র নিজেকে আশার অভিমুখে সবেগে তাড়না করিবার জন্য অনেক রাত ঘরিয়া অনেক কথা লিখিল। দুব হইতে হৃদয়ে অনেকগুলি গির্জাব ঘড়িতে ঢঙ ঢঙ করিয়া তিনটা বাজিল। কলিকাতার পথে গাড়ির শব্দ আর প্রায় নাই, পাড়ার পরপ্রান্তে কোনো দোতলা হইতে মটকণ্ডে সেহাগ-রাগিণীর যে গান উঠিতেছিল, সেও বিশ্বব্যাপিনী শান্তি ও নিঃসার মধ্যে একেবারে ডুবিয়া গেছে। মহেন্দ্র একান্তমনে আশাকে স্মরণ করিয়া এবং মনের উদ্বেগ দীর্ঘ পথে নানা রূপে ব্যক্ত করিয়া অনেকটা সাহস পাষ্টল, এবং বিছানায় শুইবা মাত্র ঘুম আসিতে তাহার কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না।

সকালে মহেন্দ্র বখন জাগিয়া উঠিল, তখন দেখা হইয়াছে, ঘরের মধ্যে রৌদ্র আসিয়াছে। মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল; নিঃসার পর গন্তব্যতির সমস্ত ব্যাপার মনের মধ্যে হালকা হইয়া আসিয়াছে। বিছানার বাহিরে আসিয়া মহেন্দ্র বেশিল, গন্তব্যে আশাকে সে যে চিঠি লিখিয়াছিল তাহা টিপাইয়ের উপর রোয়াত দিয়া চাপা রহিয়াছে। সেখানি পুনরায় পড়িয়া মহেন্দ্র ভাবিল, 'করিয়াছি বী। এ যে নভেলি বাশার। ভাগ্যে পাঠাই নাই। আশা পড়িলে কী মনে করিত। সে তো এর অর্ধেক কথা বুঝিতেই পারিত না।'

সঙ্গে তার আত্ম পর্যন্ত ভালো বনে নাই।”

“কিয়কম।”

“আমি যদি বা অনেক করিয়া দেখাসাক্য করাইয়া দিলাম, তাঁর সঙ্গে তার কথাবার্তাই প্রায় বন্ধ। তুমি তো জ্ঞান তিনি কিয়কম হুনো—
লোকে মনে করে তিনি অহংকারী। কিন্তু তা নয় আমি, তিনি দুটি-একটি
লোক ছাড়া কাহাকেও সহ্য করিতে পারেন না।”

শেষ কথাটা বলিয়া ফেলিয়া হঠাৎ আশার লজ্জাবোধ হইল, গাল-
দুটি লাল হইয়া উঠিল। অন্নপূর্ণা খুশি হইয়া মনে-মনে হাসিলেন ;
কহিলেন, “তাই বটে, সেদিন মহিন যখন আসিয়াছিল, তোর বালির কথা
একবার মুখেও আনে নাই।”

আশা চম্পিত হইয়া কহিল, “ওই তাঁর লেখ। যাকে ভালোবাসেন
না, সে যেন একেবারে নাই। তাকে যেন একদিনও দেখেন নাই, জ্ঞানেন
নাই, এমনি তাঁর ভাব।”

অন্নপূর্ণা শাস্ত্র নিষ্ঠ হস্তে কহিলেন, “আবার যাকে ভালোবাসেন,
মহিন যেন অল্পজ্ঞানাত্মক কেবল তাকেই দেখেন এবং জ্ঞানেন, এ ভাবও
তাঁর আছে। কী বলিস, চুনি।”

আশা তাহার কোনো উত্তর না করিয়া চোখ নিচু করিয়া হাসিল।

অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, “চুনি, বিহারীর কী খবর বল্ দেগি। সে
কি বিবাহ করিলে না।”

মৃদুভেদে সংসারে আশার মুখ গম্ভীর হইয়া গেল। সে কী উত্তর দিলে
ভাবিয়া পাইল না।

আশার নিরুত্তর ভাবে অত্যন্ত ভয় পাইয়া অন্নপূর্ণা বলিয়া উঠিলেন,
“সত্য বল্ চুনি— বিহারীর অস্থব-বিস্থব কিছু হয় নি তো ?”

বিহারী এই চিরপুত্রহীন কবীর ব্রহ্ম-সিংহাসনে পুত্রের মানস-
আদর্শরূপে নিদ্রিত করিত। বিহারীকে তিনি সংসারে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া

মহেন্দ্র অর্পেক চোখ বুজিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল, “আজ শরীরটা তেমন ভালো নাই—আজ আর শ্রান করিব না।”

বিনোদিনী কহিল, “শ্রান না কর তো হুটিখানি খাইয়া লও।”

বলিয়া পীড়াপীড়ি করিয়া সে মহেন্দ্রকে ভোজনস্থানে লইয়া গেল এবং উৎকণ্ঠিত যত্নের সহিত অন্নবোষণ করিয়া আহার করাইল।

আহারের পর মহেন্দ্র পুনরায় নীচের বিছানায় আসিয়া শুইলে, বিনোদিনী শিয়রে বসিয়া ধীরে ধীরে তাহার নাথা টিপিয়া দিতে লাগিল। মহেন্দ্র নিম্নোক্তচক্ষে বলিল, “ভাই বালি, এখনও তো তোমার পাওয়া হয় নাই, তুমি পাইতে যাও।”

বিনোদিনী কিছুতেই গেল না। অলস নখ্যাহের উত্তপ্ত হাওয়ায় ঘরের পর্দা উড়িতে লাগিল এবং প্রাচীরের কাছে কম্পনান নারিকেল গাছের অর্ধহীন নর্মবর্ণক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মহেন্দ্রের চক্ষুপিও ক্রমশই দ্রুততর ভালে নাচিতে লাগিল এবং বিনোদিনীর ঘন নিশ্বাস সেই ভালে মহেন্দ্রের কপালের চুলগুলি কাপাইতে থাকিল। কাহারো কণ্ঠ দিয়া একটি কথা বাহির হইল না। মহেন্দ্র মনে মনে ভাবিতে লাগিল, “অশীত বিশ্বসংসারের অনন্ত প্রবাহের মধ্যে ভাসিয়া চলিয়াছি, তরণী কলকালের ব্রত কখন কোথায় ঠেকে, তাহাতে কাহার কী আসে যায় এবং কত দিনের জুতাই বা যায় আসে।”

শিয়রের কাছে বসিয়া কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বিহ্বল ঘোবনের গুরুভারে ধীরে ধীরে বিনোদিনীর নাথা নত হইয়া আসিতেছিল; অবশেষে তাহার কেশাগ্র-ভাগ মহেন্দ্রের কপোল স্পর্শ করিল। বাতাসে আন্দোলিত সেই কেশগুচ্ছের কম্পিত বৃহৎ স্পর্শে তাহার মনস্ত শরীর ব্যঃব্যস্ত কাশিয়া উঠিল, হঠাৎ ঘেন নিশ্বাস তাহার বুকের কাছে অবরুদ্ধ হইয়া বাহির হইবার পথ পাইল না। খহ্‌খহ্‌ করিয়া উঠিয়া বসিয়া মহেন্দ্র কহিল, “না, আমার কালের আছে, আমি যাই।”

বিনোদিনী কহিল, “আমার আবার গোপনীর কী থাকিতে পারে, শুনি।”

মহেন্দ্র কন্স করিয়া বলিয়া ফেলিল, “এই মনে করো, যদি বিহারীর কাছে হইতে কোনো চিঠি আসিত।”

নিমেষের মধ্যে বিনোদিনীর চোখে বিহ্বল স্মৃতি হইল। এতক্ষণ স্কুলশর ঘরের কোণে থেলা করিতেছিল; সে যেন দ্বিতীয় বার ভ্রমসং হইয়া গেল। মূহুর্তে-প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার মতো বিনোদিনী উঠিয়া দাঁড়াইল। মহেন্দ্র তাহার হাত পরিয়া কহিল, “মাপ করো, আমার পরিহাস মাপ করো।”

বিনোদিনী মাথাকে হাত ছিনাইয়া লইয়া কহিল, “পরিহাস করিতেহ কাহাকে। যদি তাঁহার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবার যোগ্য হইতে, তবে তাঁহাকে পরিহাস করিলে সহ্য করিতাম। তোমার ছোটো বন, বন্ধুত্ব করিবার শক্তি নাই, অথচ ঠাট্টা।”

বিনোদিনী চলিয়া যাইতে উদ্ভত হইবা নাত্র মহেন্দ্র দুই হাতে তাহার পা বেঁধেন করিয়া বাধা দিল।

এমন সময়ে সমুখে এক ছায়া পড়িল, মহেন্দ্র বিনোদিনীর পা ছাড়িয়া চমকিয়া নৃপ তুলিয়া দেখিল, বিহারী।

বিহারী স্থির দৃষ্টিপাতে উভয়কে দৃঢ় করিয়া শাস্ত দীর স্বরে কহিল, “মত্যস্ত মনসে উপস্থিত হইয়াছি, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকিব না। একটা কথা বলিতে আসিয়াছিলাম। আমি কাশী গিয়াছিলাম, জানিতাম না সেখানে বউঠাকরুন আছেন। না জানিয়া তাঁহার কাছে অপরাধী হইয়াছি; তাঁহার কাছে কমা চাহিবার অবসর নাই, তাই তোমার কাছে কমা চাহিতে আসিয়াছি। আমার বনে জানে অজ্ঞানে যদি কখনও কোনো পাপ স্পর্শ করিয়া থাকে, সেবস্ত তাঁহাকে বেন কখনও কোনো দণ্ড দণ্ড করিতে না হয়, তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা।”

কতহানে ব্যাণ্ডে বাঁধিতে প্রস্তুত হইল।

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি হাত সরাইয়া নইয়া কহিল, “না না, কিছুই করিয়ে না, বরু পড়িতে দাও।”

নহেল্ল কহিল, “বাঁধিয়া একটা উদ্দম দিতেছি, তাহা হইলে আর ব্যথা হইবে না, শীঘ্র সারিয়া যাইবে।”

বিনোদিনী সরিয়া গিয়া কহিল, “আমি ব্যথা সারাইতে চাই না, এ কাটা আনার থাক্।”

নহেল্ল কহিল, “আম্র অধীর হইয়া তোমাকে আমি লোকের সামনে অপদস্থ করিয়াছি, আনাকে নাপ করিতে পারিবে কি।”

বিনোদিনী কহিল, “নাপ কিসের ভক্ত। বেশ করিয়াছ। আমি কি লোককে ভয় করি। আমি কাহাকেও মারি না। যাহারা আঘাত করিয়া ফেলিয়া চলিয়া যায় তাহারাই কি আনার সব, আর যাহারা আনাকে পায়ে ধরিয়া টানিয়া রাখিতে চায় তাহার। আমার কেহই নহে?”

নহেল্ল উন্নত হইয়া গদগদকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “বিনোদিনী, তবে আমার ভালোবাসা তুমি পায়ে ঠেলিবে না?”

বিনোদিনী কহিল, “মাখায় করিয়া রাখিব। ভালোবাসা আমি ভ্রম্মাবধি এত বেশি পাই নাই যে ‘চাই না’ বলিয়া ফিরাইয়া দিতে পারি।”

নহেল্ল তখন দুই হাতে বিনোদিনীর দুই হাত ধরিয়া কহিল, “তবে এসো আনার ঘরে। তোমাকে আমি আশ্রয় দিয়া রাখি, তুমিও আনাকে ব্যথা দিয়া চলিয়া আসিয়াছ—যতক্ষণ তাহা একেবারে নুহিয়া না যাইবে, ততক্ষণ আনার খাইয়া শুইয়া কিছুতেই স্থখ নাই।”

বিনোদিনী কহিল, “আর নহ, আজ আনাকে ছাড়িয়া দাও। যদি তোমাকে ছুঃ দিয়া থাকি, নাপ করো।”

নহেল্ল কহিল, “তুমিও আনাকে নাপ করো, নহিলে আমি স্বায়ে খুশাইতে পারিব না।”

মহেন্দ্র খাইতে বসিল। বিনোদিনী ছাদে-বিছানো বৌদ্ধে-দেওয়া মহেন্দ্রের কাপড়গুলি ক্ষত পদে ঘরে বহিয়া আনিয়া নিপুণ হস্তে ঝাঁজ করিয়া কাপড়ের আলমারির মধ্যে তুলিতে লাগিল।

মহেন্দ্র কহিল, “একটু ঘোসো, আমি খাইয়া উঠিয়া তোমাব সাহায্য করিতেছি।”

বিনোদিনী ছোড়াহাত করিয়া কহিল, “দোহাই তোমার, আর যা কব সাহায্য করিয়ে না।”

মহেন্দ্র খাইয়া উঠিয়া কহিল, “বটে ! আমাকে অকর্মণ্য ঠাণ্ডাইয়াছ ! আচ্ছা, আজ আমার পরীক্ষা হউক।”

বলিয়া কাপড় ঝাঁজ করিবার বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল।

বিনোদিনী মহেন্দ্রের হাত হইতে কাপড় কাড়িয়া লইয়া কহিল, “গোঁ মশায়, তুমি ঝাপো, আমার কাছ বাড়াইয়ো না।”

মহেন্দ্র কহিল, “তবে তুমি কাজ করিয়া যাও, আমি দেখিয়া শিকান্নাভ করি।”

বলিয়া আলমারির সম্মুখে বিনোদিনীর কাছে আসিয়া মাটিতে আসন করিয়া বসিল। বিনোদিনী কাপড় ঝাড়িবার চলে একবার করিয়া মহেন্দ্রের পিঠের উপর আছড়াইয়া কাপড়গুলি পরিপাটিপূর্বক ঝাঁজ করিয়া আলমারিতে তুলিতে লাগিল।

মাছিকার মিলন এননি করিয়া আরম্ভ হইল। মহেন্দ্র প্রত্যাশ হইতে যেতপ কল্পনা করিতেছিল, সেই অপূর্বতার কোনো লক্ষণই নাই। এরূপ ভাবে মিলন কাব্যে লিখিবার, সংদ্বিগ্ধে গাহিবার, উপভাসে বচিবার যোগ্য নহে। কিন্তু তবু মহেন্দ্র দুঃখিত হইল না, বরঞ্চ একটু আরাম পাইল। তাহার কামিনিক আশ্রমকে কেনন করিয়া পাড়া করিয়া রাখিত, কিরূপ তাহার আয়োজন, কী কথা বলিত, কী ভাব প্রকাশ করিতে হইত, মঙ্গলপ্রকার সান্নিধ্যতাকে কী উপায়ে দূরে রাখিত, তাহা মহেন্দ্র

রাজলক্ষী আদর করিয়া কহিলেন, “আহা না, তোমার মতো আপন আমি পাব কোথায়।”

বিনোদিনীর কাপড় তোলা শেষ হইলে রাজলক্ষী কহিলেন, “এখন কি তবে সেই চিনির বসটা চড়াইয়া দিব না এখন তোমার অল্প কাজ আছে?”

বিনোদিনী কহিল, “না পিসিমা, অল্প কাজ আর কই। চলো, মিঠাই-গুলি তৈরি করিয়া আসি গে।”

মহেন্দ্র কহিল, “মা, এইমাত্র অহুতাপ করিতেছিলে উহাকে পাঠাইয়া মারিতেছ, আবার এখনই কাজে টানিয়া লইয়া চলিলে?”

রাজলক্ষী বিনোদিনীর চিবুক স্পর্শ করিয়া কহিলেন, “আমাদের লক্ষী মেয়ে যে কাজ করিতেই ভালোবাসে।”

মহেন্দ্র কহিল, “আজ সন্ধ্যাবেলায় আমার হাতে কোনো কাজ নাই, ডাবিয়াডিলান বালিকে লইয়া একটা বই পড়িব।”

বিনোদিনী কহিল, “পিসিমা, বেশ তো, আজ সন্ধ্যাবেলা আমরা দুজনই ঠান্ডাবপোর বই-পড়া শুনিতে আসিব—কী বল।”

রাজলক্ষী ভাবিলেন, ‘মহিন আমার নিতান্ত একলা পড়িয়াছে, এখন সকলে মিলিয়া তাহাকে ভুলাইয়া রাখা আবশ্যক।’ কহিলেন, “তা বেশ তো, মহিনের পাবার তৈরি শেষ করিয়া আমরা আজ সন্ধ্যাবেলা পড়া শুনিতে আসিব। কী বলিস মহিন।”

বিনোদিনী মহেন্দ্রের মুখের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া একবার দেখিয়া লইল। মহেন্দ্র কহিল, “আচ্ছা।” কিন্তু তাহার আর উৎসাহ রহিল না। বিনোদিনী রাজলক্ষীর সঙ্গে সঙ্গেই বাহির হইয়া গেল।

মহেন্দ্র রাগ করিয়া ভাবিল, ‘আমিও আজ বাহির হইয়া যাইব—দেখি করিয়া বাড়ি ফিরিব।’ বলিয়া তখনই বাহিরে যাইবার কাপড় পড়িল। কিন্তু সংকল্প কাগজে পরিণত হইল না। মহেন্দ্র অনেকক্ষণ ধরিয়া ছাদে

স্বাভাবিক কঠিনতা দেখাইল, দ্বিধা দিলে অনেক দূর চাছিল, শেষে ঘেঁষে
নন্দা আসিয়া বসিয়া পড়িল। বিবস্ত্র হইয়া মনে মনে কহিল, “আমি আর
মিঠাই পূর্ণ না করিয়া থাকে জানাইয়া দিব, এই মৌলভীর পরিচয় চিনি
কিন্তু আগ দিনে তাহাতে মিথ্যে থাকে না।”

আগ আশ্রমের সময় বিনোদিনী স্বাভাবিকভাবে যত্নে করিয়া আসিল।
স্বাভাবিকী তাঁহার উপাসনার ভয়ে প্রায় উপরে উঠিতে চান না, বিনোদিনী
তাঁহাকে অত্যাচার করিয়াই যত্নে আনিয়াছে। অতঃপর অত্যাচার গাধীকৃত
পাইতে পসিল।

বিনোদিনী কহিল, “ও কী ভাববোনা, আগ দুই কিছুই পাইতেছ না
যে।”

স্বাভাবিকী দ্বারা চটয়া বিস্ময় কহিলেন, “কিছু অল্প কয়েক নাই তো।”

বিনোদিনী কহিল, “এই করিয়া মিঠাই করিলাম, কিছু দুগ্ধ মিঠাই
হইবে। ভালো হয় নি দুধ ? শুধু থাক। না না, অত্যাচারে পড়িয়া গেছে
করিয়া থাকে কিছু নয়। না না, কয়েক নাই।”

অতঃপর কহিল, “ভালো দুগ্ধমিষ্টাই ফেলিলে। মিঠাইগাি সব ভেঙে
পাইবার ইচ্ছা, লাগিতেছেও ভালো, দুই দ্বারা দিলে ভবিষ্যৎ দেন।”

চৌটি মিঠাই যত্নে মিলেবলুইক পাইক—প্রায় ৩০টি ভালো, এগু
ওঁরা পছন্দ ফেলিল না।

আশ্রমের দিন মনে অত্যাচারে পোষার যত্নে আশ্রিতা বসিলেন।
পরিচয় প্রকাশ্যে অতঃপর আর দুই নাই, স্বাভাবিকী কহিলেন, “দুই যে
কী কী পড়িদি বসিয়াছিলি, অতঃপর কই না।”

অতঃপর কহিল, “কিন্তু অত্যাচারে উপর-উপরকার কথা কিছুই নাই,
তোমারে শুনিব ভালো লাগিবে না।”

ভালো লাগিল না ? মনে করিয়া হোক, ভালো লাগিবার দ্বারা বাক-
স্বাভাবিকী হইয়া পড়। অতঃপর যদি দুই ভালো প্রায়, তাঁহার ভালো লাগিবেই

হইবে ॥ আহা, বেচারী মহিন, বউ কানী গেছে, একলা পড়িয়া আছে—
তাহার যা ভালো লাগিবে মাতার তাহা ভালো না লাগিলে চলিবে
কেন।

বিনোদিনী কহিল, “এক কাজ করো-না ঠাকুরপো, পিসিমার ঘরে
বাংলা শান্তিগতক আছে, অল্প বই রাখিয়া আজ সেইটে পড়িয়া শোনাও
না। পিসিমারও ভালো লাগিবে, সন্ধ্যাটাও কাটিবে ভালো।”

মহেন্দ্র নিতান্ত করুণ ভাবে একবার বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিল।
এমন সময় ষি আসিয়া খবর দিল, “মা, কায়েত-ঠাকরুন আসিয়া তোমার
ঘরে বসিয়া আছেন।”

কায়েত-ঠাকরুন রাজলক্ষীর অন্তরঙ্গ বন্ধু। সন্ধ্যার পর তাঁহার সঙ্গে গল্প
করিবার প্রলোভন সংবরণ করা রাজলক্ষীর পক্ষে হুঃসাধ্য। তবু বিকে
বলিলেন, “কায়েত-ঠাকরুনকে বস, আজ মহিনের ঘরে আমার একটু কাজ
আছে, কাল তিনি যেন অবশ্য-অবশ্য কবিতা আসেন।”

মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি কহিল, “কেন না, তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়াই
এসো-না।”

বিনোদিনী কহিল, “কাজ কী পিসিমা, তুমি এখানে থাকো, আমি
বদল কায়েত-ঠাকরুনের কাছে গিয়া বসি গে।”

রাজলক্ষী প্রলোভন সংবরণ করিতে না পারিয়া কহিলেন, “বউ, তুমি
ততক্ষণ এখানে বোসো—দেখি, যদি কায়েত-ঠাকরুনকে বিদায় করিয়া
আসিতে পারি। তোমরা পড়া আরম্ভ করিয়া ধাও, আমার জ্ঞাত অপেক্ষা
করিতো না।”

রাজলক্ষী ঘরের বাহির হইবা নান্ন মহেন্দ্র আর থাকিতে পারিল না ;
বলিয়া উঠিল, “কেন তুমি আমাকে টেক্সা করিয়া এমন করিয়া মিছানিছি
নীচের দর।”

বিনোদিনী যেন আশ্চর্য হইয়া কহিল, “সে কী, ভাই। আমি তোমাকে

বিবাহীকে বাতলକরী ଏକনি ନବକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ା କରିବା ଆନିଷ୍ଟନ ଯେ, ତାହାର କଥା ତାହା ଦିବ୍ୟେ କିନ୍ତୁ ଜାପିତନ ନା—ସେ ଡାହାଣେର ଦିନା ଦୁକ୍ଷାର, ଦିନା ବହୁର, ଦିନା ଚିନ୍ତାର ଅବଗତ କୋଡ଼ ଚିହ୍ନ । ଦିନାନ୍ତରୀ ଦଳନ ବାତଲକରୀକେ ନାହୁଁନ ବିବାହୀର ନାହୁଁନୀରା ବଳିତା ଡାହାଣ କରିବ, ତଥନ ବାତଲକରୀର ନାହୁଁନର ଅବହାସ ଅର୍ପଣ କରିବ । ହୁଏତ ଯେ ହୈମ, 'ତା ବଡ଼ି, ବିବାହୀର ନା ନାହିଁ ଏବଂ ଆଜାକଟି ସେ ବାବ ଯତ୍ନେ ଯେବେ ।' ଯେ ନଢ଼ିନ, ଯୋଗେ ତାଳେ ଅବକଟି ବିବାହୀ ବହାବର ଦିନା ଆଜାକଟି, ଦିନା ଆଜାକଟି, ଡାହାଣେ ନିଜାକଟି ନିଜାର ଅବିତ୍ତ ଯେବେ ଅବିବାହେ, ବାତଲକରୀ ତାହା ନିବାସପ୍ରସାଦେର ଯତ୍ନେ ମହତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦାହେନ ଏବଂ ଯେକଟ ବାହାବର କାହା କୁହଜ୍ଜ ହୁଏତ କଥା ଡାହାଣ ଯତ୍ନେ ଉତ୍ତର ହୁଏ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ବିବାହୀର ଯୋଗବଦ୍ଧ କେ ଯାହାକାହା । ଦଳନ ଅବହାସ ଚିନ୍ତେନ ତାହା ଜାପିତନ ଯତ୍ନେ ; ବାତଲକରୀ ଜାପିତନ, 'ବିବାହୀକେ ଯେ ବାହାବର ଯତ୍ନ ଅବହାସ ଯେବେ ବାହାବର କରିଦାହେନ ।'

ବାତଲକରୀ ଯାହା ନିବାସ ଯେକଟି କରିଦେବ, 'ବିବାହୀ ଆଜାକଟି ଆଜାକଟି ଯେବେ ଯେବେ ଯତ୍ନେ ।'

ବାତଲକରୀ ଯେ ଉତ୍ତର ହୁଏ, ବିବାହୀ ଡାହାଣ ଆଜାକଟି ଯେବେ ଯେବେ ଯେକଟି କରେ—ଏବଂ ଅବହାସ ଦିବ୍ୟେ କିନ୍ତୁ ଯେକଟିନ ନା ଯେକଟିନ ଡାହାଣେର ଯାହା ସେ ଯାହା କିନ୍ତୁ ଯେକଟିନ । ଯେ ଯାହା ଡାହାଣ ଅବହାସ ଯେବେ ଯେକଟିନ ଯେକଟିନ ଯେକଟିନ ।

ବିବାହୀକି କରିବ, 'ବିବାହୀ-ଯାହାକାହା ଯେବେ ଯେବେ ଯାହା ଯାହାକାହା ଯେବେ ଯେବେ ।'

ବାତଲକରୀ ଯେବେ ଯେବେ କରିଦେବ, 'ଯାହା-କାହାକାହା ଯେବେ ଯେବେ ଯେବେ ଯେବେ ।'

ଯେବେ କରିଦେବ ଯେବେ କରିବ, ଯେବେ ଯେବେ ବିବାହୀ ଯେବେ ଯେବେ । କରିଦେବ, 'ଯାହା ଯେବେ, ବିବାହୀକେ ଯାହାକାହା ଯେକଟିନ ଯାହା ନା ଯେବେ ।'

বিনোদিনী কহিল, “আমিও তো তাই ভাবিতেছিলাম, পিসিমা। তা, তোমার ছেলেটি বিবাহের পর ইহঁতে নিজের বউকে লইয়াই এমন মাতিয়া রহিয়াছে—বন্ধুবান্ধবরা আসিয়া আর কী করিবে বলো।”

কথাটা রাজলক্ষীর অত্যন্ত সংগত বোধ হইল। খ্রীকে লইয়া মহেন্দ্র তাহার সমস্ত হিতৈষীদের দূর করিয়াছে। বিহারীর তো অভিমান ইহঁতেই পারে—কেন সে আসিবে। বিহারীকে নিজের দলে পাইয়া তাহার প্রতি রাজলক্ষীর সমবেদনা বাড়িয়া উঠিল। বিহারী যে ছেলেবেলা ইহঁতে একান্ত নিঃস্বার্থ ভাবে মহেন্দ্রের কত উপকার করিয়াছে, তাহার কত কতবার কত কষ্ট সহ্য করিয়াছে, সে-সমস্ত তিনি বিনোদিনীর কাছে বিবৃত করিয়া বলিতে লাগিলেন—ছেলের উপর তাঁহার নিজের যা মালিশ তা বিহারীর বিবরণ দ্বারা সমর্থন করিতে লাগিলেন। দু’দিন বউকে পাইয়া মহেন্দ্র যদি তাহার চিরকালের বন্ধুকে এমন অনাদর করে, তবে সংসারে দ্বাদ্ধর্ম আর রহিল কোথায়।

বিনোদিনী কহিল, “কাল রবিবার আছে, তুমি বিহারী-ঠাকুরপোকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাওঘাও, তিনি খুশি হইবেন।”

রাজলক্ষী কহিলেন, “ঠিক বলিয়াছ বউ, তা হইলে মহিনকে ডাকাই, সে বিহারীকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইবে।”

বিনোদিনী। না পিসিমা, তুমি নিজে নিমন্ত্রণ কবো।

রাজলক্ষী। আমি কি তোমাদের মতো লিখিতে পড়িতে জানি।

বিনোদিনী। তা হোক, তোমার ইচ্ছা নাহয় আমিই লিখিয়া দিতেছি।

বিনোদিনী রাজলক্ষীর নাম দিয়া নিজের নিমন্ত্রণ-চিঠি লিখিয়া পাঠাইল।

রবিবার দিন মহেন্দ্রের অত্যন্ত আগ্রহের দিন। পূর্বরাতি ইহঁতেই তাহার কল্পনা উদ্ভাস ইচ্ছা উঠিতে থাকে, যদিও ঐ-পর্বৎ তাহার কল্পনার

অদ্বৈত বিছুট হই নাই—তবু, হৃদয়ান্তর ভেদেই আসে। তাহার সেই
মুগ্ধবৎ কঠিনতা থাকিল। তাহার নগ্নদেহ সমস্ত কোলাহল হৃদয়ের ভগ্ন
অদ্বৈত শাস্তির ন্যায় আদিয়া প্রবেশ করিল।

কিছু ব্যাপারখানা কী। আর আর কোনো দ্রব্য আছে নাই। কত
দিনের মধ্যে কিনোমিনীও প্রতি দুঃখভরিত হইয়া গিয়া তিনি প্রে বিস্তৃত
কঠিনত্বের ন্য। আর তিনি নিঃসৃত বায়ু হইয়া বেরাইয়াছেন।

এই তাড়ানো পল্টা খামিয়া গেল—ইতিমধ্যে আরো কোনো কুণ্ডল
কিনোমিনীও সঙ্গে এক দ্বন্দ্ব বিবর্তে লেগা করিতে পারিল না। দুই পক্ষের
চেষ্টা করিল, পক্ষের কিছুতেই মন গেল না, স্বভাবের স্বাভাবিক
অনাদরিত বিজ্ঞাপনে পক্ষেরা মিনিট দৃষ্টি আকর্ষ হইয়া গেল। আর
খামিতে পারিল না। নীচে গিয়া কেলি, যা পক্ষের পক্ষের স্বাভাবিক
একটা তোলা উঠানে বাঁধিয়াছেন এবং কিনোমিনী কঠিনত্ব দৃঢ় করিয়া
আঁচল চাপিয়া গোপাল দিতে বাধ্য।

আরো গিলাসা করিল, “আজ প্রোভাতের ব্যাপারটা কী। এত দুঃ-
খান ঘে?”

বায়বহী কঠিনত্ব, “এই প্রোভাতের ব্যাপারটা = আর ঘে বায়বহী
নিঃসৃত করিয়াছি।”

বায়বহীকে নিঃসৃত; অদ্বৈতের স্বভাবের কঠিনতা উঠিল। অদ্বৈত
কঠিন, “কিছু না, আমি হো খামিতে পারিল না।”

বায়বহী। কেন।

অদ্বৈত। আমার ঘে খামিতে বাঁধিতে চাইলে।

বায়বহী। খামিতে বাঁধা করিতে হাল, কেনি কেনি হইলে না।

অদ্বৈত। আমার ঘে খামিতে নিঃসৃত আছে।

কিনোমিনী দুঃখের মত অদ্বৈতের দুঃখ কোলাহল করিয়া করিল,
“কি নিঃসৃত আছে, যা হইলে ইনি বান্ধা নিঃসৃত। আর আর

বিহারীঠাকুরপো একলাই থাইবেন।”

কিন্তু নিজের হাতের যন্ত্রের বান্না মহিনকে থাওয়াইতে পারিবেন না, ইহা রাজলক্ষ্মীর সহিবে কেন। তিনি যতই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, মহিন ততই দাঁকিয়া দাঁড়াইল। ‘অত্যন্ত অক্লান্তি নিমন্ত্রণ, কিছুতেই কাটাইবাব জো নাই—বিহারীকে নিমন্ত্রণ করিবার পূর্বে আমার সহিত পরামর্শ করা উচিত ছিল’ ইত্যাদি।

রাগ করিয়া মহেন্দ্র এইরূপে মাকে শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করিল। রাজলক্ষ্মীর সমস্ত উৎসাহ চলিয়া গেল। তাঁহার ইচ্ছা হইল, বাবা কেনিদ্দা তিনি চলিয়া যান। বিনোদিনী কহিল, “পিসিমা, তুমি কিছু ভাবিও না—ঠাকুরপো মুখে আশ্বাসন করিতেছেন, কিন্তু আজ উহার বাহিরে নিমন্ত্রণে যাওয়া হইতেছে না।”

রাজলক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া কহিলেন, “না বাহা, তুমি মহিনকে জান না, ‘ও যা একবার ধরে তা কিছুতেই ছাড়ে না।’”

কিন্তু বিনোদিনী মহেন্দ্রকে রাজলক্ষ্মীর চেয়ে কম জানে না, তাহাই প্রমাণ হইল। মহেন্দ্র বুঝিয়াছিল, বিহারীকে বিনোদিনীই নিমন্ত্রণ করাইয়াছে। ইহাতে তাহার হৃদয় দ্রব্য যতই পীড়িত হইতে লাগিল, ততই তাহার পক্ষে দূরে যাওয়া কঠিন হইল। বিহারী কী ক’রে, বিনোদিনী কী করে, তাহা না দেখিয়া সে দাঁচিবে কী করিয়া। দেখিয়া বলিতে হইবে, কিন্তু দেখাও চাই।

বিহারী আশ্রয় অনেক দিন পরে নিমন্ত্রিত আত্মীয়-ভাবে মহেন্দ্রের অগ্ন্যুত্তর প্রবেশ করিল। বাল্যকাল হইতে যে ঘর তাহার পতিচিহ্ন এবং যেখানে সে ঘরের ছেলের মতো অব্যবহৃত ভাবে প্রবেশ করিয়া দৌরাখা করিয়াছে, তাহার ঘরের কাছে আনিয়া মুহূর্তের ভয় সে খনকিয়া দাঁড়াইল—একটা অশ্রুতরঙ্গ গলকের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবার চক্র তাহার বকলবাটে আঘাত করিল। সেই আঘাত সংকলন করিয়া লইয়া সে

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “কই মহিন, তুই তোব নিমন্ত্রণে গেলি না?”

মহেন্দ্র লজ্জা চাকিতে চেষ্টা করিয়া কহিল, “না, সেটা কাটাইয়া দেওয়া গেছে।”

জ্ঞান করিয়া আসিয়া বিনোদিনী যখন দেখা দিল, তখন বিহারী প্রথমটা কিছুই বলিতে পারিল না। বিনোদিনী ও মহেন্দ্রের যে দৃশ্য সে দেখিয়াছিল, তাহা তাহার মনে মুদ্রিত ছিল।

বিনোদিনী বিহারীর অনতিদূরে আসিয়া মূহুরে কহিল, “কী ঠাকুর-পো, একবারে চিনিতেই পার না নাকি।”

বিহারী কহিল, “সকলকেই কি চেনা যায়।”

বিনোদিনী কহিল, “একটু বিশেষনা থাকিলেই যায়।”

বলিয়া থবব দিল, “পিসিমা, খাবার প্রস্তুত হইয়াছে।”

মহেন্দ্র বিহারী পাইতে নসিল, রাজলক্ষ্মী অদূরে বসিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং বিনোদিনী পরিবেষণ করিতে লাগিল।

মহেন্দ্রের খাওয়ায় মনোযোগ ছিল না, সে কেবল পরিবেষণে পক্ষপাত লক্ষ্য করিতে লাগিল। মহেন্দ্রের মনে হইল, বিহারীকে পরিবেষণ করিয়া বিনোদিনী যেন একটা বিশেষ সুখ পাইতেছে। বিহারীর পাতেই যে বিশেষ করিয়া মাছের মুড়া ও দধির সব পড়িল, তাহার উত্তম কৈফিয়ত ছিল—মহেন্দ্র ঘরের ছেলে, বিহারী নিমন্ত্রিত। কিন্তু মুখ ফুটিয়া নালিশ করিবার ভালো হেতুবাচ ছিল না বলিয়াই মহেন্দ্র আরও বেশি করিয়া জলিতে লাগিল। অসময়ে বিশেষ সজ্জানে তপসি মাছ পাওয়া গিয়াছিল, তাহার মধ্যে একটি ভিৎ‌ওমালা ছিল; সেই মাছটি বিনোদিনী বিহারীর পাতে দিতে গেলে বিহারী কহিল, “না না, মহিনদাকে দাও, মহিনদা ভালোবাসে।”

মহেন্দ্র তীব্র অভিমানে বলিয়া উঠিল, “না না, আমি চাই না।”

তিনি বিনোদিনী দ্বিতীয় বার অত্যাশঙ্কিত না করিয়া সে মাছ

আপা নান মনে ভাবিতে গাথিল, 'আমি যখন কথা বাবিলিন ভাবি, তিনি কি আনন্দ মনে কথা জানেন না। আমি ভাবো করিয়া চিঠি লিখিতে পারি না বলিয়া তিনি কেন আনন্দে চিঠি লেখা ছাড়াই দিয়াছেন।'

আপা কহিলি নানজের চিঠি পার নাহি। নিবান দেখিয়া নান মনে সে ভাবিল, 'চোখের দানি যদি হাতের কাছে থাকিত, সে আনন্দ মনে কথা প্রিয়মত করিয়া লিখিতা দিতে পারিত।'

কুচিখিত কুচু পদ খানীর কাছে আসত পাঠে না মনে করিয়া চিঠি লিখিতে কিছুতে আপার হাত সরিত না। বহুই বার করিয়া লিখিতে চাহিত তবুই তাহার অকর খাতা হইয়া বাইত। মনে কথা বহুই 'ভালো করিয়া' প্রচাইয়া লটকায় ঢেঁকা করিত তবুই তাহার পদ লেগেন নানট সম্পূর্ণ হইত না। যদি কেউমাত্র 'উত্তরবেশু' লিখিতা মনে পড়ি করিলেই নানজের অকরমী দেবতার মতো সকল কথা বুঝিত পারিত, তাহা হইলেই আপার চিঠি লেখা পারিত হইত। বিগত একবারি কালোখানি দিয়াছেন, একটুখানি ভাল ভেন নাহি কেন।

নানিরে সত্যবেশির পরে দুইে লিখিতা আনিয়া আপা অকরমীরে পানায় কানে ধরিয়া অগত আপার তাহার পানে চাহ দৃষ্টাইয়া দিতে লাগিল। অকরমীরে নিশেজের পর কহিল, "নানি, তুমি যে বল, খানীরে দেবতার মতো করিয়া দেখা কথা মনে পদ, কিছ বে মী দুর্ভ, খানীরে দুর্ভ নাহি, কেমন করিয়া খানীর দেখা করিতে বহু যে জানেন না, সে মী করিয়ে।"

অকরমীরে কিছুকাল আপার দুইে দিকে ভাবিতা বহিবে, একটী খানি মীখানিখানি দেখিয়া করিলেন, "নাহি, আনিও দেও দুর্ভ, বহুণ বে) কালজেন দেখা করিয়া দাবি।"

আপা করিল, "নিজি যে দেবতার মনে জানেন, তাহা দুইে মনে। কিছ মনে পড়ে, খানী যদি দুর্ভের দেবতার দুইে না বহু।"

অন্নপূর্ণা कहिलेन, “सकलके खुशि करिबार शक्ति सकलैर थाके ना, बाछा । श्री यदि आशुदिक श्रद्धा ठक्ति धरैर सप्पे खामीर सेवा ओ संसारैर काज करे, तबे खामी ताहा ठुछ करिया फेलिया छिले ओ ब्रह्म-जगदीश्वर ताहा कूड़ाईया लन ।”

आशा निरुद्धरे छुप करिया रहिल । मासिने এই কথা हईते माझना ग्रहणेर अनेक चेष्टा करिल, किन्तु खामी याहाके ठुछ करिया फेलिया दिबेन, जगदीश्वरओ ये ताहाके सार्थकता दिते पारिबेन, ए কথা किछुतेहै ताहार मने हईल ना । से नतमुखे बसिया ताहार मासिने पाये हात बुलाईया दिते लागिल ।

अन्नपूর্ণा तখন आशार हात धरिया ताहाके आरओ काछे टानिद्या लईलेन, ताहार मंत्रकचुवन करिलेन, रुद्र कर्णके दृढ चेष्टाय बाधामुक्त करिया कहिलेन, “छुनि, छुपे कष्टे ये शिखालाठ हर शुभ काने पुनिया ताहा पाईनि ना । तोर এই मासिओ एकदिन तोर बसे तोरई मतो संसारैर सप्पे मंत्र करिया सेनापाओनाब सम्पर्क पातिया बसियाछिल । तখন आमाओ तोरई मतो मने करितान, याहार सेवा करिव ताहार सन्तोष ना छनिबे केन । याहार पूजा करिव ताहार प्रसाद ना पाईब केन । याहाब डालोर चेष्टा करिव से आनाब चेष्टाके डालो बनिद्या ना बुझिबे केन । पले पले सेदिगाम, सेरूप ह्य ना । अवशेसे एकदिन असह्य हईया मने हईल, पृथिवीते आनाब समस्तई बार्थ हईयाछे—सेई दिनई संसार त्याग करिया आसिलाम । आज देखितेछि, आमाब किछुई निफल ह्य नाई । एरे बाछा, थार सप्पे आसल सेनापाओनाब सम्पर्क, यिनि এই संसार-बाटेर मूल महाजन, त्रिनिई आनाब समस्तई लईतेछिलेन, कुरये बसिया आज से क्या खीकार करियाछेन । तখন दष्टि जानितान ! यदि तार कर्म बनिद्या संसारैर कर्म करितान, ताके दिलाब बनिद्याई संसारके हन्य दितान, तब हईले के आनाके छुप दिते पारित ।”

বিনোদিনী । আমি কেন প্রথমে লিখিব । তোমারই তো লিখিবার কথা ।

আশা বিনোদিনীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া নিষেধে অপরাধ স্বীকার করিয়া লইল । কহিল, “জান তো ভাই, আমি ভালো লিপিতে জানি না । বিশেষ, তোমার মতো পণ্ডিতের কাছে লিখিতে আমার লজ্জা করে ।”

দেখিতে দেখিতে দুই জনের বিবাদ মিটিয়া গিয়া প্রণয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল ।

বিনোদিনী কহিল, “দিনরাত্রি সত্ৰ দিয়া তোমার স্বামীটির অভ্যাস তুমি একেবারে পাবাপ করিয়া দিয়াছ । একটি কেহ কাছে নহিলে থাকিতে পারে না ।”

আশা । সেটাজুই তো তোমার উপরে ভাব দিয়া গিয়াছিলাম । কেমন করিয়া সঙ্গ দিতে হয়, আমার চেয়ে তুমি ভালো জান ।

বিনোদিনী । দিনটা তো একরকম করিয়া কালেজে পাঠাইয়া নিশ্চিহ্ন হইতাম, কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় কোনোমতেই ছাড়াজুড়ি নাই—গল্প করিতে হইবে, বই পড়িয়া শুনাইতে হইবে, আবদারের শেষ নাই ।

আশা । কেমন জব । লোকের মন ভুলাইতে যখন পার তখন লোকেই বা ছাড়িবে কেন ।

বিনোদিনী । সাবধান থাকিস ভাই । ঠাবুরগো যে-রকম বাড়াবাড়ি করেন, এক-একবার সন্দেহ হয়, বুদ্ধি বশ করিবার বিদ্যা জানি না ।

আশা হাসিয়া কহিল, “তুমি জান না তো কে জানে । তোমার বিদ্যা আমি একটুখানি পাইলে বাচিয়া যাইতাম ।”

বিনোদিনী । কেন, কার সন্ধান করিবার ইচ্ছা হইয়াছে । ঘরে যেটি আছে সেটিকে দগা কর, পরকে ভোলাইবার চেষ্টা করিস নে ভাই, বালি । বড়ো ম্যাঠা ।

আশা বিনোদিনীকে হস্ত দ্বারা হর্জন করিয়া বলিল, “হাঃ, হী বকিস

তার চিত্র নেই।”

কানি চোঁটে কিরিয়া আসার পথ প্রধান মাঝারেই মনোস্থ করিল,
“হোনার পরীর বেশ ভাণ্ডা ছিল বেশেতেছি, নিয়া মোটা হইল
আসিয়াচ।”

আশা অত্যন্ত লজ্জাবোধ করিল। কোনোমতেই তাহার পরীর ভাণ্ডা
খানক উঠিল ছিল না—কিন্তু যত আশার কিছুই ঠিকমত চলে না, তাহাও
মন ধরন এত পাঠান ছিল তখনও তাহার সেটা পরীর মোটা হইল
উঠিয়াছিল, একে তো মনের ভাব বাহ্যে করিতে কথা মোটা না,
সাহসে আশার পরীরটাও উল্টা বলিতে থাকে।

আশা দুইখরে মিজাল করিল, “তুমি কেমন ছিলে।”

অগ্নি হইলে মনোস্থ অত্যন্ত ঠাট্টা, কতক মনের মত বলিল, “কিহা
ছিলাম।” এমন আশ ঠাট্টা করিতে পারিল না, পূর্বে তাহা আসিয়া
যদিহা সেল। করিল, “বেশ ছিলাম, মত ছিলাম না।”

আশা চাটিল। কেবল, মনোস্থ পূর্বেও তেহে যেন বেণুগাই হইত—
তাহার মত পাণ্ডুর, তেহে একপ্রকার ভীরু মনি। এতটা যেন
আত্মসমীকৃত স্বাভাবিক তাহাকে অস্বস্তিতে নিয়া সেহেও করিয়া হইত।
আশা মনে মনে কথা অত্যন্ত করিয়া চাটিল, “কহে, আমার খানক
ছিলাম না, যেন আমি উৎসাহে কেবলি খানক করিয়া সেহে।” খানক
হোণা হইলে, অত্যন্ত মিত্র মোটা হইল, ইহাতেও মিত্রের স্বাভাবিক গতি
আশার অত্যন্ত বিবর্তন করিল।

মনোস্থ তাহে কী কথা তুলিলে চাটিলে তাহাতে খানক মত মিজাল
করিল, “কানীনা তাহা আসিলে মোটা?”

সে মনের উৎসাহে মনোস্থ মনোস্থ তাহা তাহা আশ বিবর্তন মত মনে
খানক হইল। অত্যন্ত এতটা দিহা পূর্বেও মনোস্থ তাহা দিহা,
সেইটা উল্টা হইল। মনোস্থ মনোস্থ তাহা মনোস্থ তাহা মনোস্থ। আশা মন

নিচু করিয়া ভাঙিতে লাগিল, ‘এত দিন পরে দেখা হইল, কিন্তু উনি আমার সঙ্গে কেন ভালো করিয়া কথা कहিলেন না, এমন-কি আমার নুগের দিকেও যেন চাহিতে পারিলেন না। আমি তিন-চার দিন চিঠি লিখিতে পারি নাই বলিয়া কি রাগ করিয়াছেন। আমি মাসির অগ্ররোধে বেশি দিন কাশীতে ছিলাম বলিয়া কি বিরক্ত হইয়াছেন।’ অপরাধ কোন ছিদ্ৰ দিয়া কেনন করিয়া প্রবেশ করিল, ইহাই সে নিতান্ত ক্রিষ্টহৃদয়ে সন্ধান করিতে লাগিল।

মহেন্দ্র কলেঙ্গ হইতে কিরিয়া আসিল। ‘অপরাহ্নে জলপানের সময় রাজলক্ষ্মী ছিলেন, আশাও ঘোমটা দিয়া অদূরে দুয়ার ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু আর কেহই ছিল না।

রাজলক্ষ্মী উদ্বেগ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ কি তোরা অল্প করিয়াছে, মহিন।”

মহেন্দ্র বিরক্ত ভাবে कहিল, “না মা, অল্প কেন করবে।”

রাজলক্ষ্মী। তবে তুই যে কিছু পাইতেছিল না!

মহেন্দ্র পুনর্বার উত্ফুক্ত হয়ে कहিল, “এই তো, খাচ্ছি না তো কী।”

মহেন্দ্র গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় একথানা পাতলা চাদর গায়ে, ছাদের এ ধারে ও ধারে বেড়াইতে লাগিল। মনে বড়ো আশা ছিল, তাহাদের নিয়মিত পড়াটা আজ কাণ্ড থাকিবে না। আনন্দমঠ প্রায় শেষ হইয়াছে, আর গুটিতুই-তিন অধ্যায় বাকি আছে নাত্র—বিনোদিনী ষষ্ঠ নিঃসর হোক, সে বড়ো অধ্যায় আজ তাহাকে নিশ্চয় ভনাইয়া যাইবে। কিন্তু সন্ধ্যা অতীত হইল, সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, গুরুজার নৈরাত্ত বহিরা মহেন্দ্রকে শুইতে যাইতে হইল।

সজ্জিত লজ্জাধিত আশা দীরে দীরে শয়নগৃহে প্রবেশ করিল। দেখিল, বিছানায় মহেন্দ্র শুইয়া পড়িয়াছে। তখন, কেনন করিয়া অগ্রসর হইবে ভাবিয়া পাইল না। বিজ্ঞেয়ের পদ কিছুক্ষণ একটা নূতন লজ্জা আসে—

ଦେଖାନତିରେ ଛାଡ଼ିବା ଦାବୀ ସହ ଟିକ ଫେର୍ସନଟିରେ ମିଳିତର ମଧ୍ୟ
 ମହାନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ଦ୍ରର ନିକଟ ହେତେ ନୂତନ ସହଯୋଗର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବ । ସମସ୍ତ
 ସାହାଯ୍ୟ ଓ ଓଡ଼ିଆପରିଚିତ ଆନବଦ୍ୟାତିରେ ଆପ ଆନାଦିତ ଦେବନ କରିବା
 ପ୍ରାୟଶ କରିବ । ଆପେର କାରେ ଅନେକକ୍ଷମ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ - ଓଡ଼ିଆ
 ଦେବନା ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ନା । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୌର ଦୌର ଏକ ମା ଏକ ମା କରିବା
 ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୌର କରିବ । ସମସ୍ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୌର ଦେବନା ଦେବନା କରିବା ଓଡ଼ିଆ
 ଓଡ଼ିଆ ମେ ମହାନ୍ଦ୍ର କରିବା ଦାବ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୌର ଦେବନା ଦେବନା କରିବା
 ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କରିବା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୌର ଦୌର । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୌର ଦେବନା
 ଦେବନା ଦେବନା ଦେବନା ଦେବନା କରିବା କରିବା କରିବା କରିବା । ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ
 ଦେବନାଦେବନା ଏ ଦୌର ଦୌର ଦୌର ଦୌର ଦୌର ଦେବନା ଦେବନା ।

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥

আশা ভাবিতে লাগিল, ‘এমন কেন হইল। আমি কী করিয়াছি।’ যে জায়গায় যথার্থ বিপদ সে জায়গায় তাহার চোখ পড়িল না। বিনোদিনীকে যে মহেন্দ্র ভালোবাসিতে পারে, এ সম্ভাবনাও তাহার মনে উদয় হয় নাই। সংসারের অভিজ্ঞতা তাহার কিছুই ছিল না। তা ছাড়া বিবাহের অনতিকাল পর হইতেই সে মহেন্দ্রকে যাহা বলিয়া নিশ্চয় জানিয়াছিল, মহেন্দ্র যে তাহা ছাড়া আর-কিছুই হইতে পারে, ইহা তাহার বদ্ব্যভাসেও আসে নাই।

মহেন্দ্র আজ সকাল-সকাল কলেজে গেল। কলেজ-যাত্রা-কালে আশা বরাদর জানলার কাছে আসিয়া দাঁড়াইত, এবং মহেন্দ্র গাড়ি হইতে একবার মুখ তুলিয়া দেখিত, ইহা তাহাদের চিরকালের নিত্যপ্রথা ছিল। সেই অভ্যাস অহুসারে গাড়ির শব্দ শুনিবামাত্র যথচালিতের মতো আশা জানলার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। মহেন্দ্রও অভ্যাসের দ্বারা একবার চকিতের মতো উপরে চোখ তুলিল; দেখিল, আশা দাঁড়াইয়া আছে—তখনও তাহার স্থান হয় নাই, মলিন বস্ত্র, অসংযত বেশ, শুষ্ক মুখ—দেখিয়া নিমেষের মধ্যে মহেন্দ্র চোখ নানাইয়া কোলের বই দেখিতে লাগিল। কোথায় চোখে চোখে সেই নীরব সম্ভাষণ, সেই ভাবাপূর্ণ হাসি।

গাড়ি চলিয়া গেল, আশা সেইখানেই মাটির উপরে বসিয়া পড়িল। পৃথিবী, সংসার, সমস্ত বিশ্বাস হইয়া গেল। কলিকাতার কর্মপ্রবাহে তখন হোয়ার আশিয়ার সময়। সাত্বে দশটা বাজিয়াছে, আশিসের গাড়ির গিয়ার নাট, ট্রামের পশ্চাতে ট্রাম ছুটিতেছে—সেই ব্যস্ততাব্যগদান কর্মব্যস্ততার মধ্যে এই একটি বেরনাস্থিতিত মুহূর্ত্ত অত্যন্ত মিসদণ।

১৯১২ এক সময় আশার মনে হইল, ‘বুদ্ধিমানি। ঠাকুরপো কানি

কর্তব্য তাহা সে কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না— সদয় ছলনা না অকপট নিষ্ঠুরতা, কোন্টো উচিত ? বিনোদিনীকে পরিত্যাগ করিবে কি না, সে তর্ক আর মনে উদয়ই হয় না। দয়া এবং প্রেম, মহেন্দ্র উভয়ের দাবি কেনন করিয়া রাগিবে।

মহেন্দ্র তখন মনকে এই বলিয়া বুঝাইল যে, আশার প্রতি এখনও তাহার যে ভালোবাসা আছে তাহা অল্প জীব ভাগ্যে জোটে। সেই স্নেহ, সেই ভালোবাসা পাইলে আশা কেন না সন্তুষ্ট থাকিবে। বিনোদিনী এবং আশা, উভয়কেই স্থান দিবার মতো প্রশস্ত হৃদয় মহেন্দ্রের আছে। বিনোদিনীর সহিত মহেন্দ্রের যে পবিত্র প্রেমের সম্বন্ধ তাহাতে দাম্পত্য-নীতির কোনো ব্যাঘাত হইবে না।

এইরূপ বুঝাইয়া মহেন্দ্র মন হইতে একটা ভার নামাইয়া কেলিল। বিনোদিনী এবং আশা, কাহাকেও ত্যাগ না করিয়া ছুই-চন্দ্র-সেবিত গ্রহের মতো এই ভাবেই সে চিরকাল কাটাইয়া গিতে পারিবে, এই মনে করিয়া তাহার মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। আর রাত্রে সে সকাল-সকাল বিছানায় প্রবেশ করিয়া আসরে বসে শিথ-খালাশে আশার মন হইতে সমস্ত বেদনা দূর করিয়া গিবে, ইহা নিশ্চয় করিয়া ক্ষতপদে বাড়ি চলিয়া আসিল।

আহারের সময় আশা উপস্থিত ছিল না ; কিন্তু সে এক সময় শুইতে আসিবে তো, এই মনে করিয়া মহেন্দ্র বিছানার মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু নিম্নরূপ ঘরে সেই শূন্য শয্যার মধ্যে কোন্ দৃতি মহেন্দ্রের হৃদয়কে আবিষ্ট করিয়া তুলিল। আশার সহিত নবশদিনেরে নিত্যনূতন মীমাংসা ? না। স্বর্গলোকের কাছে জ্যোৎস্না যেমন মিলাইয়া যায়, সে-সকল দৃতি তেমনি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে— একটি তীব্র-উজ্জ্বল তরুণানুতি, সদলা সাদিকার মল্লক শিথলকবিকে কোথায় আবৃত্ত আচ্ছন্ন করিয়া দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। বিনোদিনীর সঙ্গে বিদায় হইয়া সেই

ବାହାବାହି ବନ୍ଧେ ମାହିତେ ମାହିତମ୍, ସହାୟକ ମତେ ବିଲୋଚିନୀ ଉଦୟତୁ ଶତାଃ
ମାହିତା । ଉନାଦିତେ ଉନାଦିତେ ଉଦୟ ବାହି ହୈତା ଆସିତ, ବାହିତ ତୋଷ
ମୁନାହିତା ମାହିତ, ବାହେ ବିହୃତ ବସେତ ଶେଷ ଶତେ ବିଲୋଚିନୀ
କଟକତ ସେନ ଆସେତେ ଉଦୟତୁ ଶତ ସହାୟକ ହୈତା ଆସିତ, ଶତାଃ ସେ
ଆଦୟତୁଦୟ କହିତା ଯତେ ସେଲିତା ଶେଷା ମାହିତ, ବାହେତ ବାହିତ 'ସେନାବ
ବିହିତ ଶେଷ ମାହିତ ମୋହିତା ନିତା ଆସିତ' । ଶେଷ-ଶତେତ ଶତାଃ ମାହିତେ
ଶତେ ମାହିତା ଶତାଃ ଶତାଃ ଶତାଃ ଶତାଃ କହିତେ ମାହିତ । ବାହିତ ବାହିତ
ଶତାଃ— ଶତାଃ ଶତେ ଶତେ ଶତେ ଶତେ ଶତାଃ ଶତାଃ ଶତାଃ ଶତାଃ
ଶତାଃ ମାହିତା ମାହିତେ, କିନ୍ତୁ ଶତାଃ ଶତାଃ ନା । ବାହେତ ବାହିତ, 'ଆସିତେ
କାହିତେତ ଶତେ ଶତେତ ଶତାଃ, କିନ୍ତୁ ଶତାଃ ବାହିତ ବାହିତ କହିତା ନା
ଆସେତେ 'ଆସିତେ କି ବାହିତା' ଶେଷ ଶତାଃ ବିଲୋଚିନୀ
ଶତାଃ ଶତାଃ ଶତାଃ କହିତା ମାହିତ ।

ଏହିପରି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟ ରାମ ରାବିବର ମାଣିକେଇ
 ଲମ୍ବାରି ସୁମିତ୍ରା ମାଣିକେଇ ପ୍ରମୁଖ । ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା, ଶୈଳୀ
 ଗୋପାଳକାନ୍ତାରି ମଧ୍ୟ ସୁଲଭ ହୋଇଛି । ସାହିତ୍ୟର ଗୋପାଳ ମିଶ୍ର
 ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ସେନା ଗଦ୍ୟ ଲେଖକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋପାଳ ମିଶ୍ର ସେହି
 ହୋଇଛନ୍ତି । ସାମାନ୍ୟ ଗୋପାଳଙ୍କ ଉପର ମିଶ୍ର ଗୋପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋପାଳ
 ସାହିତ୍ୟ ମାଣିକେଇ ଗୋପାଳ ଗୋପାଳ ଗୋପାଳ ସାହିତ୍ୟ ।

[illegible]

খোলা বাবান্দা হইতে বিনোদিনী দ্বিচ্ছাসা করিয়া উঠিল, “কে ও।”

মহেন্দ্ৰ অভিভূত আঁৰ্জ কণ্ঠে উত্তর করিল, “বিনোদ, আমি।”

বলিয়া সে একেবারে বাবান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

গ্ৰীষ্মপ্রাপ্তিতে বাবান্দায় মাদুর পাতিয়া বিনোদিনীৰ শব্দে রাঙলম্বী শুইয়া ছিলেন ; তিনি বলিয়া উঠিলেন, “মহিন, এত রাহে তুই এখানে যে !”

বিনোদিনী তাহার ঘনকৃষ্ণ জুগের নীচে হইতে মহেন্দ্ৰের প্রতি বজ্রাঘি নিক্ষেপ করিল। মহেন্দ্ৰ কোনো উত্তর না দিয়া ক্রতপনে সেপান হইতে চলিয়া গেল।

৩৩

পরদিন প্রত্যুষ হইতে ঘনঘটা করিয়া আছে। কিছুকাল অসহ উত্তাপের পর ব্রহ্মশ্যামল মেঘে দধি আকাশ জুড়াইয়া গেল। আজ মহেন্দ্ৰ সময় হইবার পূর্বেই কলেজে গেছে। তাহার ছাড়া কাপড়গুলো মেন্দ্ৰের উপর পড়িয়া। আশা মহেন্দ্ৰের ময়লা কাপড় গনিয়া গনিয়া, তাহার হিসাব রাখিয়া পোষাকে বুঝাইয়া দিতেছে।

মহেন্দ্ৰ খড়াবত ভোলামন অসাবধান লোক ; এইজন্য আশার প্রতি তাহার অহুয়োদ ছিল পোষার বাড়ি দিবার পূর্বে তাহার ছাড়া-কাপড়ের পকেট তদন্ত করিয়া লওয়া হয় যেন। মহেন্দ্ৰের একটা ছাড়া জামায়, পকেটে হাত দিতেই একখানা চিঠি আশার হাতে ঠেকিল।

সেই চিঠি যদি বিফল সাপের নৃতি ধরিয়া তখনই আশার অতুলি সংশয় করিত তবে ভালো হইত ; কারণ, উগ্র বিল শরীরে প্রবেশ করিলে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তাহার চরম মল ফলিয়া শেষ হইতে পারে, কিন্তু বিল মনে প্রবেশ করিলে সুস্থাময়তা আসে—বুহু আসে না।

খোলা চিঠি বাহির করিবানাহ দেখিল, বিনোদিনীই হস্তাক্ষর।

চকিতের মতো আগায় মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। চিঠি হাতে দইয়া সে
পাশের ঘরে গিয়া পড়িল—

কাল রাতে তুমি যে কাণ্ডটা করিলে, তাহাতেও কি তোমার
তুপি হইল না। আর আমার সেন খেদির হাত দিয়া আমাকে
গোপনে চিঠি পাঠাইলে। তি তি, সে কী মনে করিম। আমাকে
তুমি কি অগতে কাহারও কাছে মুখ দেখাইতে দিবে না।

আমার কাছে কী চাও তুমি। ভালোবাসা? তোমার এ
প্রিকারুত্তি কেন। অল্পকাল হইতে তুমি কেনস ভালোবাসাই পাইয়া
আসিতেছ, তবু তোমার লোভের অঙ্গ নাই।

অগতে আমার ভালোবাসিবার এবং ভালোবাসা পাইবার
কোন্না স্থান নাই। তাই আমি খেলা খেলিয়া ভালোবাসাঃ খেপ
মিটাটমা থাকি। এখন তোমার অবসর ছিল এখন সেই দিয়া
খেলায় তুমিও যোগ দিয়াছিলে। কিন্তু ঘোষার ছুটি কি সুবাদ না।
ঘরের মতো তোমার ডাক পড়িয়াছে, এখন আমার খেলার ঘরে
ইকিছুকি সেন। এখন খুলা কাছিয়া ঘরে দাও। আমার ঘো ঘর
নাই, আমি মনে মনে একলা বসিয়া খেলা করিব, তোমাকে ডাকিব
না।

তুমি নিশ্চিন্ত, আমাকে ভালোবাস। খেলার খেলায় যে কথা
খোলা খাটতে পারে—কিছু যদি সহ্য করিতে হয়, এ কথা বিচার
করি না। এক সময় মনে করিবে, তুমি আমাকে ভালোবাসিতেছ—
সেই দিয়া। এখন মনে করিবে, তুমি আমাকে ভালোবাসিতেছ—
এই দিয়া। তুমি কেনস নিশ্চিন্ত ভালোবাস।

বলিতেছি, তুমি আমাকে ত্যাগ করো, আমার পশ্চাতে ফিরিয়ে না ; নির্লজ্জ হইয়া আমাকে লজ্জা দিও না । আমার খেলার শপথ মিটিয়াছে , এখন ডাক দিলে কিছুতেই আমার সাজা পাইবে না । চিঠিতে তুমি আমাকে নির্ভর বলিয়াছ ; সে কথা সত্য হইতে পারে ; কিন্তু আমার কিছু দয়াও আছে, তাই আচ্ছ তোমাকে আমি দয়া করিয়া ত্যাগ করিলাম । এ চিঠির যদি উত্তর দাও তবে সুখিব, না পলাইলে তোমার হাত হইতে আমার আর নিহতি নাই ।

চিঠিখানি পড়িবামাত্র মুহূর্তের মধ্যে চারি দিক হইতে আশার সমস্ত অবলম্বন যেন থমিয়া পড়িয়া গেল, শরীরের সমস্ত স্বাধু পেশী যেন একেবারেই হাল ছাড়িয়া দিল, নিখাস লইবার জন্য যেন বাতাসটুকু পর্যন্ত রহিল না, স্বর্গ তাহার চোখের উপর হইতে সমস্ত আলো যেন তুলিয়া লইল । আশা প্রথমে দেবাল, তাহার পর আলমারি, তাহার পর চৌকি ধরিতে ধরিতে মাটিতে পড়িয়া গেল । কণকাল পরে সচেতন হইয়া চিঠি-খানা আর-একবার পড়িতে চেষ্টা করিল, কিন্তু উদ্ভ্রান্তচিত্তে কিছুতেই তাহার অর্থ গ্রহণ করিতে পারিল না—কালো-কালো অক্ষরগুলি তাহার চোখের উপর নাচিতে লাগিল । এ কী ! এ কী হইল ! এ কেনন করিয়া হইল ! এ কী সম্পূর্ণ সর্বনাশ ! সে কী করিবে, কাহাকে ডাকিবে, কোথায় যাইবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না । ডাকার উপরে উঠিয়া মাহু যেমন খাবি পায়, তাহার বুদ্ধের ভিতরটা তেমনি করিতে লাগিল । মনমান ব্যক্তি যেমন কোনো-একটা আশ্রয় পাইবার দৃষ্ট জলের উপরে দৃষ্ট প্রসারিত করিয়া আকাশ খুঁজিয়া বেড়ায়, তেমনি আশা মনের মধ্যে একটা যা-হয় কিছু প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিবার জন্য একান্ত চেষ্টা করিল, অবশেষে বুক চাপিয়া উপর-বাসে বলিয়া উঠিল, “নাগিনা ।”

সেই ঘেমের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইবামাত্র তাহার চোখ দিয়া স্বর্

করু করিয়া চল পড়িতে লাগিল। মাটিতে বসিয়া কাছার উপর বামা, কাছার উপর বামা, যখন কিরিয়া কিরিয়া শব্দ হইল, তখন সে হাবিতে লাগিল, 'এ চিঠি লইয়া আমি কী করিব।' খানী যদি জানিতে পারেন এ চিঠি আশার হাতে পড়িযাছে, তবে সেই উপসংহা তাহার নিশাচর লক্ষ্য বদল করিয়া আশা অস্তিত্ব সূচিত হইতে লাগিল। দূর করিয়া, চিঠিপানি সেই ছাড়া ভানার পকেটে পুনরায় রাখিয়া ভানাটি আশার নুলাইয়া রাখিলে, খোবার বাড়ি গিবে না।

এই ভাবিয়া চিঠি হাতে সে শয়নঘূমে আসিল। পোশাটা ইতিমধ্যে নহলা কাপড়ের গাঠির উপর ঠেস দিয়া ঘুলাইয়া পড়িযাছে। হাংসের চাড়া ভানাটি তুলিয়া লইয়া আশা তাহার পকেটে চিঠি পুতিবার উৎসাহ করিতেছে, এমন সময় মাড়া পাইল, "কাই বালি।"

তাড়াহাড়ি চিঠি ও ভানাটি খাটের উপরে ফেলিয়া সে তাহা জপিয়া বসিল। বিনোদিনী ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, "খোবা বনো কাপড় বদল করিতেছে। যে কাপড়ওয়ার নারী সেওয়া হয় নাই সেওয়া আমি লইয়া দাই।"

আশা বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। পাছে মুখের ডাবে সকল কথা স্পষ্ট প্রকাশ পায়, এইজন্য সে ভানাটার দিকে মুখ ফিরাইয়া আশার দিকে চাহিয়া বহিল। ঠোটে ঠোটে চানিয়া বহিল, পাছে গোল দিয়া চল বাড়ির হইয়া পড়ে।

বিনোদিনী পুনর্বিয়া ধানাইয়া একবার আশাকে নিরীক্ষণ করিয়া বেশিল। মনে মনে কহিল, 'ও, বুঝিযাছি। কাল রাতেই বিবরণ যেন জানিতে পারিয়াছি। খানার উপরেই সমস্ত রাত। যেন বদলান আনাও।'

বিনোদিনী আশার সঙ্গে কথাবার্তা কহিবার কোনো চেষ্টা করিল না। খানারকে কাপড় বাড়িয়া লইয়া জুত শব্দ হইতে চলিয়া গেল।

বিনোদিনীর সঙ্গে আশা যে এতদিন সরলচিত্তে বন্ধুত্ব করিয়া আসিতেছে, সেই লজ্জা নিদারুণ দুঃখের মধ্যেও তাহার হৃদয়ে পুণীকৃত হইয়া উঠিল। তাহার মনের মধ্যে সখীর যে আদর্শ ছিল সেই আদর্শের সঙ্গে নিষ্ঠুর চিঠিখানা আর-একবার মিলাইয়া দেখিবার ইচ্ছা হইল।

চিঠিখানা খুলিয়া দেখিতেছে, এমন সময় তাড়াতাড়ি মহেন্দ্র ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। হঠাৎ কী মনে করিয়া কালেক্সের একটা লেবচারের মাঝখানে ভঙ্গ দিয়া সে ছুটিয়া বাড়ি চলিয়া আসিয়াছে।

আশা চিঠিখানা অঙ্কলের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিল। মহেন্দ্রও ঘরে আশাকে দেখিয়া একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর যাত্রা দৃষ্টিতে ঘরের এ দিক - ও দিক চাহিয়া দেখিতে লাগিল। আশা বুঝিয়াছিল, মহেন্দ্র কী খুঁজিতেছে, কিন্তু কেনন করিয়া সে হাতের চিঠিখানা অলক্ষিতে যথাস্থানে রাখিয়া পালাইয়া যাইবে, ভাবিয়া পাইল না।

মহেন্দ্র তখন একটা একটা করিয়া মলা কাপড় তুলিয়া তুলিয়া দেখিতে লাগিল। মহেন্দ্রের সেই নিফল প্রয়াস দেখিয়া আশা আর থাকিতে পারিল না, চিঠিখানা ও ভ্রামাটা মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া ডান হাতে পাটের থামটা ধরিয়া সেই হাতে মুখ লুকাইল। মহেন্দ্র বিহ্বালবেগে চিঠিখানা তুলিয়া লইল। নিমেষের যন্ত্রণা হইয়া আশার দিকে চাহিল। তাহার পরে আশা মিঁড়ি মিঁড়ি মহেন্দ্রের দ্রুত ধাবনের শব্দ শুনিতে পাইল।

তখন পোকা ডাকিতেছে, “মা-ঠাকরন, কাপড় দিতে আর কত দেবি করিবে। বেল অনেক হইল, আমার বাড়ি তো এখানে নয়।”

রাভনশ্রী আর সকাল হইতে আর বিনোদিনীকে ডাকেন নাহে। বিনোদিনী নিদ্রাবশত তাঁহারে গেল; দেখিল, রাভনশ্রী মুখ তুলিয়া চাহিলেন না।

সে কথা মেনা করিয়াও বলিল, "শিদিনা তোমার অশ্রু করিয়াছে
কৃষ্ণ ? করিয়াছেই কথা । কাল রাতে ঠাকুরপো যে কীর্তি করিলেন ।
একবারে পাগলের মতো আদিয়া উপস্থিত । আমার হোঁ হাব গলে ঘুর
হটল না ।"

হাফসতী দুখ ভাব করিয়া রহিলেন, "ঐ, না, কোনো উত্তরই করিলেন
না ।"

দিনোদিনী বলিল, "বাতো চোখের দানির সঙ্গে আমার কিছু
খিতিমিটি হইয়া থাকিলে, আর সেসে কে । তখনই না দিলে কিংবা নিশ্চিহ্ন
ভায়ে আমাকে ধরিয়া লইয়া যাওয়া চাই, রাত পোহাইতে তব না না ।
যাই বল শিদিনা, তুমি রাগ করিয়া না, হোনার হেলের সঙ্গে ও
থাকিলে পালে, কিছু সৈবের কেমনায় নাই । ওই মতই আমার সঙ্গে
কেবলই কথাটা হয় ।"

হাফসতী করিলেন, "ওই, তুমি মিথ্যা বলিতেছ—আমার আর আর
কোনো কথা ভালো লাগিলেই না ।"

দিনোদিনী করিল, "আমারও কিছু ভালো লাগিলেই না, শিদিনা ।
হোনার মনে শ্রদ্ধা লাগিলে, এই হলেই মিথ্যা কথা শিয়া হোনার
হেলের লোক চাকিয়ার ভেটা করিয়াছি । কিন্তু এমন হইলোই যে, আর
চাকা পড়ে না ।"

হাফসতী । আমার হেলের লোক-গুণ আমি জানি—কিছু তুমি যে
কেমন মানোনি, তাহা আমি জানিবার না ।

দিনোদিনী তাই একটা বলিবার মত উদ্ভট হইয়া নিজেতে সংশয়
করিল, করিল, "সে কথা ঠিক শিদিনা, কেবল তাহাওই জানে না ।
নিজের মনও কি লগাই আছে । তুমি কি কখনও হোনার দাঁতের উপর
খোঁ করিয়া ওই মানোদিনীকে শিয়া হোনার হেলের মন বুঝাইতে পার
নাই ? একবার ঠাকুর করিয়া তোমো দেখি ।"

রাজলক্ষ্মী অগ্নির মৃত্যু উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন; কহিলেন, “হতভাগিনী, ছেলের সম্বন্ধে মার নামে তুই এমন অপবাদ দিতে পারিস ? তোম ছিদ খসিয়া পড়িবে না !”

বিনোদিনী অবিচলিত ভাবে কহিল, “পিসিমা, আমরা মায়াবিনীর জাত, আমাদের মধ্যে কী মায়া ছিল তাহা আমি ঠিক জানি নাই, তুমি জানিয়াছ ; তোমার মধ্যেও কী মায়া ছিল তাহা তুমি ঠিক জানি নাই, আমি জানিয়াছি । কিন্তু মায়া ছিল, নহিলে এমন ঘটনা ঘটত না । ফাঁদ আমিও কতকটা জানিয়া এবং কতকটা না জানিয়া পাতিয়াছি । ফাঁদ তুমিও কতকটা জানিয়া এবং কতকটা না জানিয়া পাতিয়াছ । আমাদের জাতের ধর্ম এইরূপ—আমরা মায়াবিনী ।”

দোষে রাজলক্ষ্মীর ঘেন কণ্ঠরোধ হইয়া গেল—তিনি ঘর ছাড়িয়া দ্রুত পদে চলিয়া গেলেন ।

বিনোদিনী একলা-ঘরে নগ্নকালের ছত্র ছিন্ন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল— তাহার দুই চক্ষে আগুন জলিয়া উঠিল ।

সকাল বেলাকার গৃহকাৰ্য হইয়া গেলে রাজলক্ষ্মী নহেজ্জকে ডাকিয়া পাঠাইলেন । মহেশ্বর বুকিল, কাল রাত্রিকার ব্যাপার লইয়া আলোচনা হইবে । তখন বিনোদিনীর কাছ হইতে পমোস্তর পাইয়া তাহার মন নিবল হইয়া উঠিয়াছিল । সেই আঘাতের প্রতিঘাত-রূপে তাহার সমস্ত তরঙ্গিত হৃদয় বিনোদিনীর দিকে সবদেগে প্রাবল্য হইতেছিল । ইহার উপরে আবার মার সঙ্গে উত্তর-প্রভুত্বের কথা তাহার পক্ষে অসাধ্য । নহেশ্বর চানিত, না তাহাকে বিনোদিনী সম্বন্ধে তৎসন্না করিলেই বিদ্রোহী-ভাবে সে স্বার্থ ননের কথা বলিয়া ফেলিবে এবং বলিয়া ফেলিলেই নিরাক্ষণ গৃহদুঃস্বাদ হইবে । অতএব এ মনকে বাঁচি হইতে দূরে গিয়া সকল কথা পরিষ্কার করিয়া ডাকিয়া দেখা দরকার । নহেশ্বর চাকরকে বলিল, “বাকি বলিস, আম কালোগে আমার বিশেষ কাজ আছে, এখনই

বাইতে চাইবে, মিথিয়া আসিয়া দেখা হইবে।”

বলিয়া পলাতক খানকেই মতো। তখনই তাড়াতাড়ি কাপড় পরিয়া
না খাইয়া, চুতিয়া বাতির হইয়া গেল। বিনোদিনীও যে লাফ চিঠিখানা
আচ মকান হইতে বার বার করিয়া সে পড়িয়াছে এবং পকেটে চুইয়া
ফিরিয়াছে, আচ নিতান্ত তাড়াতাড়িতে সেই চিঠিহস্ত খানা ছাড়িয়াই
সে চুনিয়া গেল।

এক পক্ষা গুন দুই হইয়া তাহার পরে বাতলায় মতো করিয়া বহিল।
বিনোদিনীও মন আছ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আছে। মনের কোনো অস্থির
হইলে বিনোদিনী কাজের নান্য নাড়া। তাই সে আচ ধর হামোর
কাপড় বড়ো করিয়া চিরু দিতে আরম্ভ করিয়াছে। আবার নিকট হইতে
কাপড় চাহিতে গিয়া আবার দুখের ভাব দেখিয়া তাহার মন আরও
বিগড়াইয়া গেছে। সংসারে যদি অপরাধীট হইতে হয়, তবে অপরাধের
যত লাজনা তাহাই কেন ভোগ করিলে, অপরাধের যত ছুখ তাহা হইতে
কেন বঞ্চিত হইবে।

কৃপ, কৃপ, শব্দে চাপিয়া বৃষ্টি আসিল। বিনোদিনী তাহার গায়ে মেয়ে
উপর এগিয়া। মক্কে কাপড় পূর্ণাবার। খেমি লম্বী এক-একখানি
কাপড় অঙ্গপর করিয়া নিতেছে, আর বিনোদিনী মাঝা মিথার কানী মিথ
হাংগে মকর মুদ্রিত করিতেছে।

মহেশ কোনো খাড়া না দিয়া কখনো দুনিয়া একেবারে বদলে মতো
লাগে করিল। খেমি লম্বী কাছ খেমিলা নাখার কাপড় দিয়া যে
চাতিয়া চুটিল।

বিনোদিনী কোণে কাপড় নাটকে কেমিলা মিথ বিহাংগে উদ্রিয়া
খাড়াইয়া করিল, “খাপ, আমোদ এ ঘর হইতে চলিয়া যাপ।”

মহেশ করিল, “কেন, লী করিয়াছি।”

বিনোদিনী। কী করিয়াছি। কী করিয়াছি। কী করিয়াছি।

আছে তোমার । না জান ভালোবাসিতে, না জান কর্তব্য করিতে । মাঝে
হইতে আমাকে কেন লোকের কাছে নষ্ট করিতেছ ।

মহেন্দ্র । তোমাকে আমি ভালোবাসি নাই, এমন কথা বলিলে ?

বিনোদিনী । আমি সেই কথাই বলিতেছি । লুকাচুবি, ঢাকাঢাকি,
একবার এ দিক, একবার ও দিক—তোমাব এই চোরের বতো প্রবৃত্তি
দেখিয়া আমার ঘৃণা জন্মিয়া গেছে । আর ভালো লাগে না । তুমি
যাও ।

মহেন্দ্র একেবারে মুহূর্ত্তমান হইয়া কহিল, “তুমি আমাকে ঘৃণা কর,
বিনোদ ।”

বিনোদিনী । হাঁ, ঘৃণা করি ।

মহেন্দ্র । এখনও প্রায়শ্চিত্ত করিবার সময় আছে, বিনোদ । আমি
যদি আর বিদ্যা না করি, সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই, তুমি আমার
সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত আছ ?

বলিয়া মহেন্দ্র বিনোদিনীর দুই হাত গললে ধরিয়া তাহাকে কাছে
টানিয়া লইল । বিনোদিনী কহিল, “ছাড়ো, আমার লাগিতেছে ।”

মহেন্দ্র । তা লাগুক । বলো—তুমি আমার সঙ্গে যাইবে ?

বিনোদিনী । না, যাইব না । কোনোমতেই না ।

মহেন্দ্র । কেন যাইবে না । তুমিই আমাকে সর্বনাশের দুখে টানিয়া
আনিয়াছ, আর তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না । তোমাকে
যাইতেই হইবে ।

বলিয়া মহেন্দ্র স্বদৃঢ়বলে বিনোদিনীকে বুকের উপর টানিয়া লইল,
ঘোর করিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া কহিল, “তোমার-ঘৃণাও আমাকে
শিখাইতে পারিবে না, আমি তোমাকে লইয়া যাইবই, এবং যেমন
করিয়াই হউক, তুমি আমাকে ভালোবাসিবেই ।”

বিনোদিনী গললে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইল ।

মহেন্দ্র কহিল, "চারি সিক্ত আঙন আলাইয়া তুলিয়াছ; এখন ম্যা
নিবাইতেও পারিবে না, পানাইতেও পারিবে না।"

বলিতে বলিতে মহেন্দ্রের গলা চড়িয়া উঠিল, উঠিয়াও যে কহিল,
"এমন খেলা কেন খেলিলে, বিনোদ। এখন আর ইহাও তোলা বলিয়া
মুক্তি পাইবে না। এখন হোমায় আমার একটু দৃষ্ট।"

স্বাভাবিকী ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন, "বহিন, কী করছিস?"

মহেন্দ্রের উন্নত দৃষ্টি এক নিমেষ নাত্র মাতার মুখের দিকে ফুটিয়া
আসিল; তাহার পর পুনরায় বিনোদিনীকে দিকে চাহিয়া মহেন্দ্র কহিল,
"আমি সব চাচ্ছি। চলিয়া বাইরেছি, বলো—তুমি আমার সঙ্গে
বাইবে?"

বিনোদিনী হুতা স্বাভাবিকীর মুখের দিকে একবার চাহিল। তাহার
পর অগম্যর হেঁচা অবিচ্ছিন্ন ভাবে মহেন্দ্রের হাত ধরিয়া কহিল,
"বাইব।"

মহেন্দ্র কহিল, "তবে আমারই মতো অপেক্ষা করো, আমি চলিলাম,
কাল হইতে তুমি চাড়া আমার খাত কেন্দ্র করিবে না।"

বলিয়া মহেন্দ্র চলিয়া গেল।

এমন শব্দ খোলা আসিয়া বিনোদিনীকে কহিল, "মাঠাঘর, আর
হো বলিতে পারি না। আদ্য যদি হোমায়ের কৃপণতা না থাকে হো আমি
কাল আসিয়া সাপড় লইয়া বাইব।"

যেহি আসিয়া কহিল, "বউঠাকরন, যদিও যদিও হো তোলা ফুটিয়া
গেছে।"

বিনোদিনী সাত সিনের লোনা এখন কহিয়া আসিয়াছে আলাইয়া সিক্ত,
এক নিমেষ আলাইয়া আলাইয়া খোলায় পড়িয়া কহিল।

শোণাল চাকর আসিয়া কহিল, "বউঠাকরন, স্বত্ব-কেন্দ্রের আত
স্বাভাবিকের (স্বত্ব-কেন্দ্রের) সঙ্গে কৃপণতা করিয়াছে। সে বলিয়াছে,

তাহার কেরোসিনের হিসাব বুঝিয়া লইলেই সে সরকার-বাবুর কাছ হইতে বেতন চুকাইয়া লইয়া কাছ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইবে।”

সংসারের সমস্ত কর্মই পূর্ববৎ চলিতেছে।

৩৫

বিহারী এতদিন মেডিকাল কলেজে পড়িতেছিল। ষ্টিক পরীক্ষা দিবার পূর্বেই সে ছাড়িয়া দিল। কেহ বিশ্বাস প্রকাশ করিলে বলিত, ‘পরের স্বাস্থ্য পরে দেখিব, আপাতত নিজের স্বাস্থ্য রক্ষা করা চাই।’

আসল কথা, বিহারীর উচ্চ অশেষ; একটা-কিছু না করিয়া তাহার থাকিবার ছো নাই, অথচ যশের তৃষ্ণা, টাকার লোভ এবং জীবিকার স্বত্ত্ব উপার্জনের প্রয়োজন তাহার কিছুমাত্র ছিল না। কলেজে ডিগ্রী লইয়া প্রথমে সে শিবপুরে এন্টিনিয়ারিং শিখিতে গিয়াছিল। যতটুকু জানিতে তাহার কোঁতুহল ছিল, এবং হাতের কাছে যতটুকু দক্ষতালাভ সে আবশ্যক বোধ করিত, সেইটুকু সমাধা করিয়াই সে মেডিকাল কলেজে প্রবেশ করে। মহেন্দ্র এক বৎসর পূর্বে ডিগ্রী লইয়া মেডিকাল কলেজে ভর্তি হয়। কলেজের বাঙালি ছাত্রদের নিকট তাহাদের ছুই জনের বন্ধুত্ব বিখ্যাত ছিল। তাহারা ঠাট্টা করিয়া ইহাদের ছাত্রনকে জামদেণীয় মোকা-যমজ বলিয়া ডাকিত। গত বৎসর মহেন্দ্র পরীক্ষায় যেন করাতে ছুই বন্ধু এক ত্রেণীতে আসিয়া দিলিল। এমন সময়ে হঠাৎ মোড় কেন যে ভাঙিল, তাহা ছাত্রেরা বুঝিতে পারিল না। যোদ্ধা বেখানে মহেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হইবেই, অথচ তেমন করিয়া দেখা হইবে না, সেখানে বিহারী কিছুতেই যাইতে পারিল না। সকলেই জানিত, বিহারী ভালোদরকম পাস করিয়া নিশ্চয় সম্মান পুদ্গার পাইবে, কিন্তু তাহার আর পরীক্ষা দেওয়া হইল না।

তাহাদের বাড়ির পার্শ্বে এক কুঠিরে দ্বাদশ চন্দ্রবর্তী বলিয়া এক

বিহারী । ইচ্ছা তোমার নাই ? এ বিপত্তি কে খটাইল । মনেস্ত সে
পথে চলিয়াছিল সে পথ হইতে তাহাকে কে দ্রষ্ট করিয়াছে ।

বিনোদিনী । আমি করিয়াছি । তোমার কাছে লুকাইল না, ওমনি
আনাথই কাচ । আমি মনে হই বা হই, একবার আনাথ হইয়া
আমার অন্তরের কথা বুঝিবার চেষ্টা করো । আমার সুন্দর মালা লইয়া
আমি মনোহর দর আলোড়িয়াছি । একবার মনে হইয়াছিল আমি
মনোহরকে ভালোবাসি, কিং তাহা কল ।

বিহারী । ভালোবাসিলে কি কেহ এমন অধিকাণ্ড করিতে পারে ।

বিনোদিনী । ঠাকুরপো, এ তোমার কাস্তেই কথা । এখনও কল
কথা শুনিবার মতো মতি আনাথ হয় নাই । ঠাকুরপো, তোমার পুঁথি
স্বাধিনা একবার অন্তর্যামীর মতো আমার হৃদয়ে মতো স্তম্ভিত করো ।
আমার ভালোমন্দ সব আত্ম আমি তোমার কাছে বলিতে চাই ।

বিহারী । পুঁথি পাথে দুনিয়া রাপি বেগীন ? হৃদয়ে হৃদয়ে
নিহনে বুঝিবার ভার অন্তর্যামীরই উপরে থাকে । আমবা পুঁথির বিবরণ
মিলাইয়া না চলিলে শেষকালে যে খেটাইতে পারি না ।

বিনোদিনী । তুমি ঠাকুরপো, আমি নির্গল হইয়া বলিতেছি, তুমি
আমাকে ফিরাইতে পারিতে । মনেস্ত আমাকে ভালোবাসে না, কিং
সে নিজেই অন্ধ, আমাকে কিছুই বোঝে না । একবার মনে হইয়াছিল,
তুমি আমাকে কেন বুঝিয়াছ—কেন তুমি আমাকে অন্ধা করিয়াছিলে—
কথা করিয়া যখন সে কথা আর ঢাপা দিতে চেষ্টা করিয়া না ।

বিহারী । কহাই বলিতেছি, আমি তোমাকে কল করিয়াছিলম ।

বিনোদিনী । কল কল নাই ঠাকুরপো । কিং বুঝিবারে যদি, কল
করিতেই যদি, তবে সেইখানেই আমিও কেন । আমাকে ভালোবাসিতে
তোমার কী কথা ছিল । আমি আত্ম নির্গল হইয়া তোমার কল
অসিদ্ধি, কল আমি আত্ম নির্গল হইয়াই তোমাকে বলিতেছি—

তুমিও আমাকে ভালোবাসিলে না কেন। আমার পোড়া কপাল ! তুমিও
 কি না আশার ভালোবাসায় মজিলে ! না, তুমি রাগ করিতে পাইবে না।
 বোনো ঠাকুরপো, আমি কোনো কথা চাকিয়া বলিব না। তুমি যে
 আশাকে ভালোবাস সে কথা তুমি যখন নিজে জানিতে না, তখনও আমি
 জানিতাম। কিন্তু আশার মধ্যে তোমরা কী দেখিতে পাইয়াছ, আমি
 কিছুই বুঝিতে পারি না। ভালোই বল আর মন্দই বল, তাহার আছে
 কী। বিধাতা কি পুরুষের দৃষ্টির সঙ্গে অন্তরদৃষ্টি কিছুই দেন নাই। তোমরা
 কী দেখিয়া, কতটুকু দেখিয়া ভোল। নির্বোধ ! অন্ধ !

বিহারী উঠিয়া পাড়াইয়া কহিল, “আজ তুমি আমাকে যাহা শুনাইবে
 সমস্তই আমি শুনিব—কিন্তু, যে কথা বলিবার নহে সে কথা বলিঘো না,
 তোমার কাছে আমার এই একান্ত মিনতি।”

বিনোদিনী। ঠাকুরপো, কোথায় তোমার ব্যথা লাগিতেছে, তাহা
 আমি জানি—কিন্তু যাহার অন্ধা আমি পাইয়াছিলাম এবং যাহার
 ভালোবাসা পাইলে আমার জীবন মার্থক হইত, তাহার কাছে এই দ্বায়ে
 ভয়-লজ্জা সমস্ত বিসর্জন দিয়া ছুটিয়া আসিলাম, সে যে কত বড়ো বেদনায়
 তাহা মনে করিয়া একটু শৈব ধরো। আমি সত্যই বলিতেছি, তুমি যদি
 আশাকে ভালো না বাসিতে, তবে আমার দ্বারা আশার আজ এমন
 সর্বনাশ হইত না।

বিহারী নিবর্ণ হইয়া কহিল, “আশার কী হইয়াছে। তুমি তাহার কী
 করিয়াছ।”

বিনোদিনী। মহেছ তাহার সমস্ত সংসার পরিত্যাগ করিয়া কাল
 আমাকে লইয়া চনিয়া বাইতে প্রস্তুত হইয়াছে।

বিহারী হঠাৎ গর্জন করিয়া উঠিল, “এ কিছুতেই হইতে পারে না।
 কোনোমতেই না।”

বিনোদিনী। কোনোমতেই না ? মহেছকে আজ কে ঠেকাইতে পারে।

বিহারী । তুমি পাত্র ।

দিনোদিনী । আমিও তুমি চূপ করিয়া বসিয়া ; তাহার পর বিহারী
মুখে দিবে দুই চক্ষু বন্ধ রাখিয়া বসিল, “যেখানে কাহারও চক্ষু
তোমার আশার চক্ষু ? আমার নিঃশব্দ হৃদয় হৃদয় কিছুই নাই ? তোমার
আশার ভালো হউক, নরসিংহের সমস্যারের ভালো হউক, এই বলিয়া
ইহকালে আমার মঙ্গল লাভি মুচিয়া ফেলিল, এত ভালো আমি নই—
মর্দবাস্থের পুঁথি এত করিয়া আমি পড়ি নাই । আমি যাহা চাহিয়া
তাহার মঙ্গল আমি কী পাঠাই ।”

বিহারী মুখের ভাব ক্রমশঃ অস্বস্ত করিয়া উঠিয়া আসিল ; বলিল,
“তুমি অনেক স্পষ্ট কথা বলিয়াছ ভেটা করিয়াছ, এবার আমিও একটা
স্পষ্ট কথা বলি । তুমি আর যে কাণ্ডটা করিলে, এবং যে কথায়
বলিতেছ, ইহার অধিকাংশই তুমি যে সাহিত্য পড়িয়াছ তাহা হইতে
চুরি । ইহার ব্যাপ্তি আনাই নাটক এবং মডেল ।”

দিনোদিনী । নাটক ! মডেল !

বিহারী । ইহা নাটক, মডেল । তাও বুঝ চুপের নহ । তুমি যেন
কবিত্তেছ, এ-সময় তোমার নিঃশব্দ—যাহা নহে । এ-সময় হাস্যাত্মক
প্রতিদানি । যদি তুমি নিঃশব্দ নিঃশব্দ দুই মঙ্গল। বালিকা হইলে, তাহা
হইলেও সমস্যার সমস্যাবাদ হইলে দ্বিগুণ হইলে না—কিছু নাটকের
নাটিকা হইলেও উপরেই খোঁজা পাত্র, এবং প্রত্যেকই লইয়া চলি না ।

কোথায় দিনোদিনীকে সেই হীরা হেতু, চক্ষুর স্প । অস্বস্ত করিয়া
মতো সে পাত্র হইয়া নহে হইয়া বসিল । অনেক কণ স্পষ্ট, বিহারী মুখে
দিবে না করিয়া পাত্র নহে বসে বসিল, “তুমি আনন্দের কী করিলে
পাত্র ।”

বিহারী বলিল, “অস্বস্তকে কিছু করিলে করিয়াছে না । পাত্রের
হীরাহেতু পাত্রকে কাহা পাত্র, পাত্র বসে । সেসে করিয়া পাত্র ।”

বিনোদিনী । কেনন করিয়া বাইব ।

বিহারী । খেয়েদের গাড়িতে তুলিয়া দিয়া আমি তোমাকে তোমাদের
স্টেশন পর্যন্ত পৌছাইয়া দিব ।

বিনোদিনী । আচ্ছ ব্রাত্রে তবে আমি এইখানেই থাকি ।

বিহারী । না, এত বিখাস আমার নিছের পরে নাই ।

তিনি তৎক্ষণাৎ বিনোদিনী চৌকি হইতে ভূমিতে নুটাইয়া পড়িয়া,
বিহারীর ভই পা প্রাণপণ বলে বকে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, “এইটুকু
দুর্বলতা রাখো, ঠান্ডাধুপো । একেবারে পাখরের সেবতার মতো পবিত্র
হইয়ো না । মলকে ভালোবাসিয়া একটুখানি মল হও ।”

বলিয়া বিনোদিনী বিহারীর পরদুগল ব্যবহার চুপন করিল । বিহারী
বিনোদিনীর এই আকস্মিক অভাবনীয় ব্যবহারে অগত্যা যেন
আশ্চর্যবোধ করিতে পারিল না । তাহার শরীর-মনের সমস্ত গ্রন্থি যেন
শিথিল হইয়া আসিল । বিনোদিনী বিহারীর এই শুষ্ক বিহ্বল ভাব
অনুভব করিয়া তাহার পা চাড়িয়া দিয়া নিছের ভই হাঁটুর উপর উন্নত
হইয়া উঠিল, এবং চৌকিতে আসীন বিহারীর গলদেশ বাহতে বেঠন
করিয়া বলিল, “সীদনসর্বদা, আমি তুমি আমার চিরকালের নও, কিন্তু
আমি এক দুর্ভাগ্যের জন্য তোমাকে ভালোবাসো । তার পরে আমি তোমাদের
সেই নল তুলে চলিয়া যাইব, বাহারও কাছে কিছুই চাহিব না । মরণ
পর্যন্ত মনে রাখিবার মতো তোমাকে একটা কিছু দাও ।”

বলিয়া বিনোদিনী চোগ বুজিয়া তাহার গলাধর বিহারীর কাছে
অগ্রসর করিয়া নিল । দুহস্তকালের অল্প ভই ঘনে নিশলে এবং মনস্ত দর
নিহত হইয়া রহিল । তাহার পর দীর্ঘনিদ্রাস ফেলিয়া বিহারী দীর্ঘ দীর্ঘ
বিনোদিনীর হাত ছাড়াইয়া লইয়া অত্ৰ চৌকিতে গিয়া বলিল এবং কঙ্ক-
প্রাণে কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল, “আজ রাতি একটার সময়
একটা প্যাসেজার-ট্রেন আছে ।”

ଦିନାମିନୀ ଏକଟୁଧାନି ଟଙ୍କା ହେବା ପ୍ରତି, ତାହାର ଗମ୍ଭୀର ଅନୁରୋଧ
 କହିଲା, "ସେହି ଘୋରଟି ବାହାରି ।"

এমন সময়, গায়ে ছুঁয়া নাই, গায়ে ঘামা নাই, বদল ভাঙে পরিশুভে
 দৌরভ্রমের সের হয়ে। বিহাদীর চৌকির কাছে আসিয়া পাড়াইয়া গড়ীর-
 মধ্যে দিনোদিনীকে বেধিয়া রাখিল।

ਦਿਵਾਨੀ ਤੇ ਆਸਾ ਕਹਿਣ, "ਕੁਝ ਵਾਸ ਨਿ ਦੇ ?"

दमश्च द्यावा उच्यते वा निजं गच्छीदनुजं शङ्कामेव ।

दिनाम्नि होइ दाउ दाउरेडा मि । दाउ दाउरेडा होइ दिना यदिसा,
 होउ होउ दिनाम्नि होउ दाउरेडा । दिनाम्नि होउ दाउरेडा होउ
 दाउरेडा होउ दाउरेडा । दिनाम्नि होउ दाउरेडा होउ दाउरेडा होउ ।

[illegible]

ଆଜ୍ଞା ଉପର ଅଧ୍ୟାୟ । ଚେତନା ତିନି ବାସ୍ତବ କରିବା ଆଦିରା ଅଛି,
“ଆସି ତିନି ।”

[illegible]

ਅੰਤਰ ਵਿਚ, "ਉਹੀ ਹੈ।"

রাত্রি তখন আঁটটা হইবে, মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি বাড়ির মতো বিনোদিনীর ঘরের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত হইল, দেখিল—ঘরে আলো নাই, সমস্ত অন্ধকার। পকেট হইতে একটা দেশলাইয়ের বায় বাহির করিয়া দেশলাই ধরাইল; দেখিল—ঘর শূন্য। বিনোদিনী নাই, তাহার জিনিসপত্রও নাই। দক্ষিণের বায়ান্নায় গিয়া দেখিল, বায়ান্না নির্জন। ডাকিল, “বিনোর।” কোনো উত্তর আসিল না।

‘নির্বোধ! আমি নির্বোধ! তখনই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া উচিত ছিল। নিশ্চয়ই মা বিনোদিনীকে এমন গল্পনা দিয়াছেন যে, সে ঘরে টিকিতে পারে নাই।’

সেই কল্পনামাত্র মনে উদয় হইতেই, তাহা নিশ্চয় সত্য বলিয়া তাহার মনে বিশ্বাস হইল। মহেন্দ্র অদূর হইয়া তৎক্ষণাৎ মার ঘরে গেল। সে ঘরেও আলো নাই; কিন্তু রাজলক্ষ্মী বিছানায় শুইয়া আছেন, তাহা অন্ধকারেও লক্ষ্য হইল। মহেন্দ্র একেবারে ঝুটে ঘরে বলিয়া উঠিল, “মা, তোমরা বিনোদিনীকে কী বলিয়াছ।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “কিছুই বলি নাই।”

মহেন্দ্র। তবে সে কোথায় গেছে।

রাজলক্ষ্মী। আমি কী জানি।

মহেন্দ্র অবিবাসের স্বরে কহিল, “তুমি জান না? আচ্ছা, আমি তাহার সন্ধানে চলিলাম—সে যেখানেই থাক, আমি তাহাকে বাহির করিবই।”

বলিয়া মহেন্দ্র চলিয়া গেল। রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে চলিতে বলিতে লাগিলেন, “মহিন, বাস নে মহিন, মিথিয়া আর, আমার একটা কথা শ্রুতিয়া যা।”

মহেন্দ্র এক নিবাসে চুটিয়া দাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল। মুহূর্ত্ত পরেই মিথিয়া আনিয়া চন্দ্রাবানকে জিজ্ঞাসা করিল, “বহুঁহুদানী

মাফন করিতে নাই । কিন্তু তবু এই বিদ্বেষ, এই ঘেঁষা, অশুভ মেহবোধিত
মাসুর্গভাবের ব্যাধি পরিপূর্ণ হইয়া রহিল ।

তাহার পরে যে শনিবারের উদ্ভব হইল—বহুত প্রায়, অশান্তির জের,
যুদ্ধের শাস্তি ও পরিহৃত্য একবারে চাবধার করিয়া লিল, বিহারী প্রথম
চুপায় সেই দিনোন্নিমীষে সদস্য অধ্যক্ষদণ্ডের সহিত তবুই গেলিয়া
ফেলিতে চেষ্টা করিল । কিন্তু, এ খী আশ্চর্য ! আঘাত যেন অত্যন্ত দূর
হইয়া গেল, তাহাকে যেন স্পর্শ করিল না । সেট পুনরাবৃত্তি প্রাথমিক
তাহার দুর্ভেদ্যবস্তৃপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার চুই হইয়া চকমকম মনস্তাত্ত্বিক
বিহারীর মস্তকে দ্বিত হইয়া উঠিল । ঐতিহাসিক উদ্ভূতচিত্ত পতিব্রাহ্মণ
তাহারই মন নিখাসের নত্যা বিহারীর গায় আশিয়া পড়িতে লাগিল ।
দীর্ঘে দীর্ঘে সেট পসকহীন চক্ৰব্রাহ্মণ্যমী নীলি দ্বান হইয়া আশিত
লাগিল, সেট ব্রাহ্মণ্য বহুত অশক্তিতে মিলি থিত হইয়া গভীর ভাবমণ
ফেলিতে ফেলিতে পরিচুত হইয়া উঠিল, দুর্ভেদ্য মন্যে সেই মুহূর্ত্ত বিহারীর
পায়ের কাছে পড়িয়া তাহার এই লাভ প্রাপণ্য বসে বসে চাপিয়া ধরিল—
তাহার পরে সে একটি অশক্ত মনস্তাত্ত্বিক মন্যে নিম্নোক্ত মন্যে
বিহারীকে বেঁটন করিয়া আশিয়া উঠিল। সত্যোদিতচিত্ত ব্রাহ্মণ্য পুনরাবৃত্তি
চুপা একখানি চুপোদিত চুপ বিহারীর মন্যে নিম্নে আশিয়া উঠিল
করিল । বিহারী চক ব্রাহ্মণ্য সেট কহুত্বিত্তে ব্রাহ্মণ্য হইতে বিহারী
করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কোন্মোহেই তাহাকে আঘাত
করিতে যেন তাহার হাত উঠিল না—একটি অশক্ত ব্রাহ্মণ্য চুপন তাহার
মুখের কাছে আস্ত হইয়া রহিল, পুণ্যে তাহাকে আশিত করিয়া উঠিল ।

বিহারী হাতের নিচন অশক্তিতে আশে আশিত করিল না । আশে
কোন্মোহে মিলে মন দিবার মত সে তাহাভাতি নীলোদিতচিত্তে তাহার মন্যে
আশিয়া আস্ত করিল ।

কোন্মোহে তাহাভাতি উদ্ভব ফেলিতে তাহাভাতি একখানি বিহারী

ফোটোগ্রাফ ছিল। বিহারী ঢাকা খুলিয়া সেই ছবিটি ঘরের মাঝখানে আলোর নীচে লইয়া বসিল—কোলের উপর রাখিয়া দেখিতে লাগিল।

ছবিটি মহেন্দ্র ও আশার বিবাহের অনতিকাল পরের যুগলমূর্তি। ছবির পশ্চাতে মহেন্দ্র নিজের অঙ্গরে 'মহিন্দা' এবং আশা স্বহস্তে 'আশা' এই নামটুকু লিখিয়া দিয়াছিল। ছবির মধ্যে সেই নবপরিণয়ের মধুর দিনটি আর ঘুচিল না। মহেন্দ্র চোঁকিতে বসিয়া আছে, তাহার মুখে নূতন বিবাহের নবীন সরস ভাবাবেশ; পাশে আশা পাঁজাইয়া—ছবিওয়ালা তাহাকে মাথায় ঘোমটা দিতে দেয় নাই, কিন্তু তাহার মুখ হইতে লজ্জাটুকু খসাইতে পারে নাই। আজ মহেন্দ্র তাহার পার্শ্বচরী আশাকে কান্দাইয়া কত দূরে চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু ছড ছবি মহেন্দ্রের মুখ হইতে নবীন প্রেমের একটি রেখাও বদল হইতে দেয় নাই, কিছু না বুঝিয়া মূঢ় ভাবে অনুষ্ঠের পরিহাসকে স্বাধী করিয়া রাখিয়াছে।

এই ছবিগানি কোলে লইয়া বিহারী বিনোদিনীকে শিক্কারের দ্বারা স্বদ্বারে নির্বাসিত করিতে চাহিল। কিন্তু বিনোদিনীর সেই প্রেম-কাতর যৌবন-কোমল বাহুটি বিহারীর দ্বাড়া চাপিয়া রহিল। বিহারী মনে মনে কহিল, 'এমন স্বপ্নের প্রেমের সংসার ছাড়বার করিয়া দিলি!' কিন্তু বিনোদিনীর সেই উপ্‌সর্গাংকিষ্ট ব্যাকুল মুখের চুখননিবেদন তাহাকে নীরবে কহিতে লাগিল, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি। সমস্ত জগতের মধ্যে আমি তোমাকে বরণ করিয়াছি!'

কিন্তু এই কি জবাব হইল। এই কথাই কি একটি ভাঙ্গ সংসারের নিরাকরণ আর্তথরকে ঢাকিতে পারে। পিশাচী!

পিশাচী! বিহারী এটা কি পূরা ভৎসনা করিয়া বলিল না ইহার সঙ্গে এতটুকু গানি আসরের স্বয় আসিয়াও মিশিল! যে মুহূর্তে বিহারী তাহার সমস্ত জীবনের সমস্ত প্রেমের দাবি হইতে বঞ্চিত হইয়া একেবারে নিঃশব্দ হইয়া যায় নত্যা পথে আসিয়া পাঁজাইয়াছে, সেই মুহূর্তে বিহারী

[illegible]

যদি কোলে মইয়া এইরকম নানা কথা বলাই সে এককালে খাণ্ডের
 কবিতা-কবিতা, এমন সময় পার্শ্ব পথ শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়া বেশির ভাগ
 আসিয়াছে। চকিত হইয়া ঠাড়াইয়া উঠিতেই কোলে হঠাৎ হবিষ্টি
 শীত দ্বার্পণের উপর পড়িয়া গেল—বিহারী তাহা লক্ষ্য করিল না।

ଅଂଶୁ ଏକମାତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଓଡ଼ିଆ, "ଦିନାନ୍ତରୀ କୋଷାଂଶୁ ।"

ଦିନାଦୀ ନାହାନ୍ତ କାଳେ ଅସମ୍ଭବ ହେବ। ତତ୍ପରେ ହାତ ଧରିବା ଉଚିତ,
“ନହିଲିବା, ଏକଟି ଖୋଲୋ ଡାହାଣ, ବାମ ଉପାଦି ଆମୋଚ୍ଛା କରା ହେଉଥାଉ ।”

বাহাদুর বহিন, "আমার বহিনের ওপর আশ্রয়না করিবার মত
নাহে। বলা, দিল্লিশিলী কোথায়।"

ବିଦ୍ୟାରୀ କହିଲେ, "ହୁନି ସେ ଧର୍ମଟି ହିନ୍ଦୁମାନେ କବିରାଜଙ୍କ, ଏକ ବ୍ୟବସାୟର ଉକ୍ତର ଦେଖା ଡାଲେ ନା । ଏକଟି ହୋଇଲେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରା ବଢ଼ିଲେ ହୋଇଲେ ।"

କାହାକୁ ଦାମ, ଓଡ଼ିଆରେ ମିଳେ ଏ ଯେ ଏକ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା କହି
 ଦିଅନ୍ତୁନାହିଁ କାହିଁକି ?

ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗਵਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ନାମ । ଓହ୍ଲାଇ ଶବ୍ଦରେ ଓ ଆସି ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଶବ୍ଦରେ, ଯାହା ଶବ୍ଦରେ,
 ଓହ୍ଲାଇ ଶବ୍ଦରେ ଶବ୍ଦରେ ଶବ୍ଦରେ ଶବ୍ଦରେ । ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ, ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ
 ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦରେ ଶବ୍ଦରେ ଶବ୍ଦରେ ।

नि.अ. २०२१

মহেন্দ্র । আমাকে বলিবে কি না ।

বিহারী । না ।

মহেন্দ্র । বলিতেই হইবে । তুমি তাহাকে চুবি করিয়া আনিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছ । সে আমার, তাহাকে দিরাইয়া দাও ।

বিহারী স্বপকাল শুক হইয়া রহিল । তাহার পর দৃঢ় স্বরে বলিল, “সে তোমার নহে । আমি তাহাকে চুবি করিয়া আনি নাই, সে নিজে আমার কাছে আসিয়া ধরা দিয়াছে ।”

মহেন্দ্র গর্জন করিয়া উঠিল, “মিথ্যা কথা !”

এই বলিয়া পার্শ্ববর্তী ঘরের রুদ্ধ দ্বারে আঘাত দিতে দিতে উচ্চ স্বরে ডাকিল, “বিনোদ ! বিনোদ !”

ঘরের ভিতর হইতে কান্নার শব্দ শুনিতে পাইয়া বলিয়া উঠিল, “ভয় নাই বিনোদ । আমি মহেন্দ্র, আমি তোমাকে উদ্ধার করিমা লইয়া যাইব—কেহ তোমাকে বন্ধ করিমা রাখিতে পারিবে না ।”

বলিয়া মহেন্দ্র সবলে ধাক্কা দিতেই দ্বার খুলিয়া গেল । ভিতরে ছুটিয়া গিয়া দেখিল, ঘরে অন্ধকার । অন্ধুট ছায়ার মতো দেখিতে পাইল, বিছানায় কে যেন ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া অবাক শব্দ করিয়া বালিশ চাপিয়া ধরিল । বিহারী তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বসন্তকে বিছানা হইতে কোলে তুলিয়া মাথনার স্বরে বলিতে লাগিল, “ভয় নাই বসন্ত, ভয় নাই, কোনো ভয় নাই ।”

মহেন্দ্র তখন দ্রুত গদে বাহির হইয়া বাড়ির সমস্ত ঘর দেখিয়া আসিল । যখন কিরিয়া আসিল তখনও বসন্ত ভয়ের আবেগে থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল, বিহারী তাহার ঘরে আলো আলিয়া তাহাকে বিছানায় শোওয়াইয়া গায়ে হাত বুলাইয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল ।

মহেন্দ্র আসিয়া কহিল, “বিনোদিনীকে কোথায় রাখিয়াছ ।”

ବିଚାରୀ କହିଲା, “ନହିନା, ଗୋଟିଏ କାରିଗର ନା, ତୁମ୍ଭି ଯଦ୍ୟାପି ଏହି
 ବାଳକଙ୍କ ସେବକ ଡର ପାଖରେଇବା ଗିରାଫ, ହିରାଏ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାରିଗର ନାହିଁ ।
 ଆମି ବଞ୍ଚିତେହି, ବିଲୋମିନୀର ଧରଣ ଗୋଦାର କୋଳେ ଲୋଦାଧନ ନାହିଁ ।”

ନରୋଞ୍ଜ କହିଲା, “କାହାଁ! ନହାୟା! ଧର୍ମର ଆବର୍ଣ୍ଣ ଖାତା କାରିଗର ନା ।
 ଆମାର ଧର୍ମ ଏହି ହୁଏ କୋଳେ କାରିଗର ଦାବେ କୋଲୁ କେବଳାବ ଧ୍ୟାନ କୋଲୁ
 ପୁଣ୍ୟମୟ ଚକ୍ର କାରିଗରଚିଲେ ? ତତ୍ତ୍ୱ !”

କାରିଗର, ଛାଦିଧାନି ନରୋଞ୍ଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେଳିବା ଛୁଆବେଷ ପା ଧିଆ ଦାବେ
 କାଢ଼ ଚୁର୍ଣ୍ଣ ଚୁର୍ଣ୍ଣ କାରିଗର ଏକ ପ୍ରତିହତ୍ତିତି ଗଣିବା ଟୁକରା ଟୁକରା କାରିଗର ଦିନିଆ
 ନିହାରିର ଗାବେର ଉପର କେଳିବା ଲିମ ।

ହାହାଃ ନରୋଞ୍ଜ କେଳିବା ବଳୟ ଆକାର ଡର କାଳିଆ ଉଠିଲା । ଗିରାଫ
 କଟ କଦମ୍ବାବ ହିରା ଆସିଲା, ଦାବେର ଗିରା ହୁଗାବେଷ କାରିଗର କାରିଗର,
 “କାହାଁ !”

ନରୋଞ୍ଜ ଡରର ଦେଶେ କାରିଗର ହିରା ଗେଲା ।



ବିଲୋମିନୀ ଧରଣ ଆବିଷ୍କୃତ କେଳିବା ଆବିଷ୍କୃତ ଚିତ୍ତିବା ଆବିଷ୍କୃତ ହିରା ଗେଲା
 ନାହିଁ ଏ ଛାଦାବେଷିତ ଏକ-ଏକଧାନି ଧ୍ୟାନ କେଳିବା ଆବିଷ୍କୃତ, ଧରଣ ଦାବେ
 ନରୋଞ୍ଜ ଦିନିଆବେଷ ଧରଣ ଦିନିଆବେଷ ଆବିଷ୍କୃତ ଉଠିଲା । କେହି ଛାଦାବେଷିତ
 ନାହିଁ ଦାବେର ବରଦିଶ କେଳିବାବେଷ ନିଷେଧ ଧିର ହିରାବେଷିତ ବିଧି-ବ୍ୟାସ-
 ନରୋଞ୍ଜବେଷିତ ଧରଣ କୋଳ ଦାବେ ଏ ଆବିଷ୍କୃତ ହିରାବେଷିତ ଦେଶେ ଆବିଷ୍କୃତ
 କାରିଗର ଆବିଷ୍କୃତ, ଏହି କାହା ଦାବେର ନରୋଞ୍ଜ ହିରାବେଷିତ । ଧିରୋଞ୍ଜ ଧରଣ
 କାରିଗର ଦିନିଆବେଷିତ ଦୃଷ୍ଟି ଆବିଷ୍କୃତ ନରୋଞ୍ଜ ଦୃଷ୍ଟିବା ବିଲୋମିନୀ
 ଦାବେର ଆବିଷ୍କୃତ, କାହା ଦେଶେ କିହୁର ହିରାବେଷିତ ନାହିଁ—ଏକ ଦେଶେ ହିରାବେଷିତ
 ଆବିଷ୍କୃତ ! ଆବିଷ୍କୃତ ଆବିଷ୍କୃତ ନରୋଞ୍ଜ ଦୃଷ୍ଟିବା ହିରାବେଷିତ ଦୃଷ୍ଟିବା କାରିଗର
 ଦାବେ, ଦାବେବିଷ୍କୃତ ନରୋଞ୍ଜବେଷିତ ହିରାବେଷିତ ଦିନିଆବେଷିତ

নিঃশব্দ সন্ধ্যায় একটি নিষ্কম্প বটবৃক্ষের তলায় বাঁধিয়া রাখিতে চায়, আর কিছুতেই কোনো প্রয়োজন নাই। গাড়ি চলিতে চলিতে এক-এক জায়গায় আনন্দ হইতে মুকুলের গন্ধ আসিতেই পল্লীর স্নিগ্ধশাস্তি তাহাকে নিবিড় ভাবে আবিষ্ট করিয়া তুলিল। মনে মনে সে কহিল, ‘বেশ হইয়াছে, ভালোই হইয়াছে, নিজেকে লইয়া আর টানাছেড়া করিতে পারি না; এবারে সমস্ত ভুলিব, ঘুমাইব—পাভাগীয়েব মেয়ে হইয়া ঘরের ও পল্লীর কাজে কর্ণে সন্তোষের সঙ্গে, আরামের সঙ্গে, জীবন কাটাইয়া দিব।’

তৃপ্তিত বক্ষে এই শাস্তির আশা বহন করিয়া বিনোদিনী আপনার কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু হায়, শাস্তি কোথায়। কেবল শূন্যতা এবং দারিদ্র্য; চারি দিকেই সমস্ত জীর্ণ, অপরিচ্ছন্ন, অনাদৃত, মলিন। বহু দিনের রুদ্ধ স্নায়ুসম্মেতে ঘরের বাসে তাহার যেন নিশ্বাস বদ্ধ হইয়া আসিল। ঘরে অল্পবয়স্ক যে-সমস্ত আসবাবপত্র ছিল, তাহা কীটের দংশনে ইহুদের উৎপাতে ও ধুলার আক্রমণে ছারখার হইয়া আসিয়াছে। সন্ধ্যার সময় বিনোদিনী ঘরে গিয়া পৌছিল—ঘর নিরানন্দ, অন্ধকার। কোনোমতে সর্বের তেলে প্রদীপ জ্বালাইতেই তাহার ধোঁয়ায় ও কীর্ণ আলোতে ঘরের দীনতা আরও পরিষ্কৃত হইল। আগে যাহা তাহাকে পীড়ন করিত না, এখন তাহা অসহ্য বোম হইতে লাগিল—তাহার সমস্ত বিদ্রোহী অস্তঃকরণ সবলে বলিয়া উঠিল, এখানে তো এক মুহূর্তও কাটিলে না। কুলুবিতে পূর্বকার ছুই-একটা ধুলায় আচ্ছন্ন বই ও মাগিক পত্র পড়িয়া আছে, কিন্তু তাহা ছুঁইতে ইচ্ছা হইল না। বাহিরে বাদুস্পর্কশূন্য আমবাগানে ঝিগি ও নগার গুহনধর অন্ধকারে ধনিত হইতে লাগিল।

বিনোদিনীর যে বৃদ্ধা অভিভাবিকা ছিলেন, তিনি ঘরে তালা লাগাইয়া দেয়ালে দেগিতে স্বপ্নে জানাইবাড়িতে গিয়াছেন। বিনোদিনী প্রতি-বেশিনীদের বাড়িতে গেল। তাহার। তাহাকে সেলিয়া যেন চমকিত হইয়া উঠিল। ও না! বিনোদিনীর দিয়া বড় দাক হইয়া উঠিয়াছে, কাপড়চোপড়

সম্ভাবনার আশাও বিনোদিনী ছাড়িতে পারিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন কতকাল কনিকাতা ত্যাগ করিয়াছে।

মহেন্দ্ৰের সহিত জড়িত করিয়া বিনোদিনীর নামে নিন্দা গ্রামের ঘরে ঘরে কিরূপ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, শত্রু-মিত্রের কুপায় বিনোদিনীর কাছে তাহা অগোচর রহিল না। শাস্তি কোথায়!

গ্রামবাসী সকলের কাছ হইতে বিনোদিনী নিম্নেকে নির্লিপ্ত করিয়া লইতে চেষ্টা করিল। পল্লীর লোকেরা তাহাতে আরও রাগ করিল। পাতকিনীকে কাছে লইয়া ঘৃণা ও পীড়ন করিবার বিলাসস্থল হইতে তাহারা বঞ্চিত হইতে চায় না।

কুহ পল্লীর মধ্যে নিম্নেকে সকলের কাছ হইতে গোপনে রাখিবার চেষ্টা বুধা। এখানে আহত জনগণকে কোণের অন্ধকারে লইয়া নির্জনে শুষ্ক করিবার অবকাশ নাই—যেখান-সেখান হইতে সকলের তীক্ষ্ণ কোতূহলদৃষ্টি আসিয়া কতস্থানে পতিত হয়। বিনোদিনীর অন্তঃপ্রকৃতি চূপড়ির ভিতরকার সজীব মাছের মতো যতই আছড়াইতে লাগিল, ততই চারি দিকের সংকীর্ণতার মধ্যে নিম্নেকে বারংবার আহত করিতে লাগিল। এখানে স্থানীন ভাবে পরিপূর্ণ রূপে বেদনাভোগ করিবারও স্থান নাই।

দ্বিতীয় দিনে চিঠি পাইবার সময় উত্তীর্ণ হইতেই বিনোদিনী ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া লিখিতে বসিল—

ঠাকুরপো, ভয় করিযো না, আমি তোমাকে প্রেমের চিঠি লিখিতে বসি নাই। তুমি আমার বিচারক, আমি তোমাকে প্রদান করি। আমি যে শাপ করিয়াছি তুমি তাহার কঠিন ৮৩ দিয়াছ; তোমার আদেশমাত্র সে ৮৩ আমি মাথায় করিয়া বহন করিয়াছি। হুঃ এই, ৮৩টি যে কত কঠিন তাহা তুমি দেখিতে পাইলে না। যদি দেখিতে, যদি জানিতে পাইতে, তাহা হইলে তোমার মনে যে দয়া

ଯେତେ ଆମେ ହୈହୟେ ବସିଛୁ ହୈହୟ । ହୋଇଲେ ଆମେ କହିଲେ ଯେ
 ନାମ ହୋଇବ ହୈହୟାମି ଆମେ ଆମେ ନାମା ଆସିଲା, ଆମି ହୈହୟ ହେ
 କହିବ । କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯେହୁଙ୍କର ବାସନା କି ଆମେବେ ନାମ ନା
 ଶୋଧିଲ ଆମେବେ ନା—ହୁଅନ୍ତୁ ନା ହୈହୟ ଆମେବେ ଆମେବେ ନା
 ହୈହୟେ ହୋଇଲେ ଆମେବେ ହୋଇବେ ହୈହୟ ଚିତ୍ତି ଆମେବେ ହୈ
 ମିତାମିତାବେ ଆମେବେ—ହୈହୟ ହୈ ନା ଆମେବେ ହୈହୟ ଆମେବେ ହୈହୟ
 ମିତାମିତାବେ ନାମ, ଆମେବେ । ଆମେବେ ହୈହୟ ଆମେବେ ହୈହୟ
 ନା, ହୈହୟ । ଆମେବେ ଆମେବେ ଆମେବେ ହୈହୟ ହୈହୟ ହୈହୟ
 କାହାବେବେ ଆମେବେ ଆମେବେ ହୈହୟ ନାମା ହୈହୟ ହୈହୟ ହୈହୟ
 ଆମି ହୈହୟ ଆମିହୟ ନା । ହୋଇବେ ହୈହୟେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ; ଆମି
 ମିତାମିତାବେ କହିବେ ନା । କିନ୍ତୁ ଆମେବେ ହୈହୟ, ଆମେବେ ହୈହୟ
 ନାମ । ହୈହୟେ ହୋଇବେ ହୈହୟ ଆମେବେ ହୈହୟ ମିତାମିତାବେ
 ହୈହୟେ ଆମେବେ ନା । ହୈହୟେ ହୈହୟେ ହୈହୟେ ହୈହୟେ, ହୈହୟ
 ହୈହୟେ ହୈହୟେ ହୈହୟେ ହୈହୟେ ହୈହୟେ ହୈହୟେ, ହୈହୟ
 ହୈହୟେ ହୈହୟେ ହୈହୟେ ହୈହୟେ ହୈହୟେ ହୈହୟେ ହୈହୟେ
 କହିଲେ ।

ହୈହୟ

ହୈହୟେହୈହୟେ

ମିତାମିତାବେ ଚିତ୍ତି ହୈହୟ ମିତା—ଆମେବେ ହୈହୟେ ହୈହୟେ ହୈହୟେ
 ଆମେବେ । ହୈହୟେ ହୈହୟେ ହୈହୟେ ହୈହୟେ, ଚିତ୍ତି ହୈହୟେ, ଚିତ୍ତି ହୈହୟେ ହୈହୟେ
 ହୈହୟେ ହୈହୟେ ହୈହୟେ ହୈହୟେ—ମିତାମିତାବେ ହୈହୟେ ହୈହୟେ ହୈହୟେ
 ହୈହୟେ ହୈହୟେ ହୈହୟେ ହୈହୟେ ହୈହୟେ ହୈହୟେ ହୈହୟେ ହୈହୟେ

ହୈହୟେ ହୈହୟେ ହୈହୟେ ହୈହୟେ ହୈହୟେ ହୈହୟେ ହୈହୟେ ହୈହୟେ
 ହୈହୟେ ହୈହୟେ ହୈହୟେ ହୈହୟେ ହୈହୟେ ହୈହୟେ ହୈହୟେ ହୈହୟେ

অপমানের মধ্যে তাহার হৃদয়ের অন্ধকার তনুদেশ হইতে নিষ্ঠুর সংহার-শক্তি নৃত্তিপরিগ্রহ করিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিল। সেই নিদারুণ নিষ্ঠুরতার আবির্ভাব বিনোদিনী সত্তরে উপলব্ধি করিয়া ঘরে দ্বার দিল।

তাহার কাছে বিহারীর কিছুই ছিল না, এক ছত্র চিঠি না, কিছুই না। সে শূণ্যের মধ্যে কিছু যেন একটা খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে বিহারীর একটা কিছু চিঠিকে সঙ্গে ছুঁড়াইয়া দিয়া শুক চক্ষে জল আনিতে চায়। অক্ষমলে অন্তরের সমস্ত কঠিনতাকে গলাইয়া, বিদ্রোহ-বহিকে নির্বাণিত করিয়া, বিহারীর কঠোর আদেশকে হৃদয়ের কোমলতনু প্রেমের সিংহাসনে বসাইয়া রাখিতে চায়। কিন্তু অমাবৃত্তির মধ্যাহ্ন-আকাশের মতো তাহার হৃদয় কেবল অনিতেই লাগিল, দিগ্‌দিশেষ্টে কোথাও সে এক বোটাও অক্ষর লক্ষণ দেখিতে পাইল না।

বিনোদিনী শুনিয়াছিল, একাগ্রমনে ধ্যান করিতে করিতে বাহাকে ডাকা যায়, সে না আসিয়া থাকিতে পারে না। তাই জোড়হাত করিয়া চোখ বুজিয়া সে বিহারীকে ডাকিতে লাগিল, ‘আমার জীবন শূণ্য, আমার হৃদয় শূণ্য, আমার চতুর্দিক শূণ্য—এই শূণ্যতার নাকশানে একবার ডুবি এসো, এক নুহর্তের জল এসো, তোনাকে আসিতেই হইবে, আমি কিছুতেই তোনাকে ছাড়িব না।’

এই কথা প্রাণপণ বলে বলিতে বলিতে বিনোদিনী যেন মথার দল পাইল। নম্র হইল, যেন এই প্রেমের দল, এই আশ্রানের দল, বৃথা হইবে না। কেবল শ্রবণমাত্র করিয়া, চরাসার গোড়ায় হৃদয়ের বন্ধ সেচন করিয়া, হৃদয় কেবল অন্ধর হইয়া পড়ে। কিন্তু এইরূপ একমনে ধ্যান করিয়া প্রাণপণ শক্তিতে কামনা করিতে থাকিলে নিজেই যেন মহাদেবান মনে হয়। মনে হয়, যেন প্রবল ইচ্ছা জগতের আদ-সমস্ত ছাড়িয়া কেবল বাহিকে আকর্ষণ করিতে থাকতে, প্রতি নুহর্তে ক্রমে ক্রমে, দীর্ঘে দীর্ঘে, সে নিবৃত্তবর্তী হইতেছে।

প্রতি যেমন বিধান করিবে আমি তাহাই নতশিরে গ্রহণ করিব। তাহার ভালোবাসার আশাকে বাঁচাইবার জন্য যেটুকু দরকার, আমার সঙ্গে কেবলমাত্র তাহার সেইটুকু সম্পর্ক? আমার নিজের কোনো প্রাপ্য নাই, দাবি নাই, সামান্য দুই ছত্র চিঠিও না—আমি এত ভুজ্জ, এত ঘৃণার সামগ্রী?’ তখন ঈর্ষার দিবে বিনোদিনীর সমস্ত বক্ষ পূর্ণ হইয়া উঠিল; সে কহিল, ‘আর-কাহারও জন্ত এত দুঃখ সহ্য করা যাইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া আমার চম্ভ নয়। এই দৈন্ত, এই বনবাস, এই লোকমিন্দা, এই অসজ্জা, এই জীবনের সকলপ্রকার অপরিহৃষ্টি, কেবল আমারই জন্ত আমারকে বহন করিতে হইবে—এতবড়ো যাকি আমি মাথায় করিয়া কেন লইলাম। কেন আমার সর্বনাশের ত্রুত সম্পূর্ণ করিয়া আমিলাম না। নির্বোধ! আমি নির্বোধ! আমি কেন বিহারীকে ভালোবাসিলাম।’

বিনোদিনী যখন কাঠের মূর্তির নতো ঘরের মধ্যে কঠিন হইয়া বসিয়া ছিল, এমন সময় তাহার দিগ্দিগন্তজি আনাইবাড়ি হইতে গিরিয়া আসিয়াই তাহাকে কহিল, “গোড়ারমুখী, কী সব কথা শুনিতেছি!”

বিনোদিনী কহিল, “বাহা শুনিতেছ সবই সত্য কথা।”

দিগ্দিগন্তজি। তবে এ কলহ পাড়ায় বহিয়া আনিবার কী দরকার ছিল—এখানে কেন আসিলি।

কল গোড়ে বিনোদিনী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। দিগ্দিগন্তজি কহিল, “বাচা, এখানে তোমার থাকি হইবে না, তাহা বলিতেছি। গোড়া অদূরে আনার সবাই বহিয়া-করিয়া গেল, ইহাও সহ্য করিয়া বাচিয়া আছি, কিন্তু তাই বলিয়া এ-সকল ব্যাপার আমি সহিতে পারিব না। চি চি, আনাতের মাথা ঝেঁট করিলে। তুমি এখনই যাও।”

বিনোদিনী কহিল, “আমি এখনই যাইব।”

এমন সময় মহেশ্বর, আন নাই, আহার নাই, উষ্মদুঃখ চুল করিয়া হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল। সমস্ত দ্বারের অন্তিমের তাহার চম্ভ দরদর,

বিনোদিনী দ্বিধাশঙ্কিত্তি যর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কহিল,
 “নহেন্দ্র, তুমি আমাকে চেন না, কিন্তু তুমি আমার পর নও। তোমার
 মা ব্রাহ্মসংসারী আমাদের গ্রামেরই মেয়ে, গ্রামসম্পর্কে আমি তাহার মামী।
 দ্বিজানা করি, এ তোমার কী বন্ধন ব্যবহার। ঘরে তোমার স্ত্রী আছে,
 না আছে, আর তুমি এমন বেহায়া উন্নত হইয়া কিরিতেছ! ভদ্রসমাজে
 তুমি মুখ দেখাইবে কী বলিয়া।”

নহেন্দ্র যে ভানোআদের রাজ্যে ছিল, সেখানে এই একটা আঘাত
 লাগিল। তাহার মা আছে, স্ত্রী আছে, ভদ্রসমাজ বলিয়া একটা ব্যাপার
 আছে। এই সহস্র কথাটা নূতন করিয়া যেন মনে উঠিল। এই অজ্ঞাত
 সন্দেহ পল্লীর অপরিচিত গৃহঘরে নহেন্দ্রকে যে এমন কথা শুনিতে হইবে,
 ইহা তাহার এক সময়ে স্বপ্নেরও অতীত ছিল। দিনের বেলায় গ্রামের
 মাঝখানে পাড়াইয়া সে একটি ভদ্রঘরের বিধবা রমণীকে যর হইতে পথে
 বাহির করিতেছে, নহেন্দ্রের জীবনচরিতে এমনও একটা অসুত অধ্যায়
 লিখিত হইল। তবু তাহার মা আছে, স্ত্রী আছে এবং ভদ্রসমাজ আছে।

নহেন্দ্র যখন নিরুত্তর হইয়া পাড়াইয়া গহিল তখন বৃদ্ধা কহিল,
 “ঘাটপে হয় তো এখনই যাও, এখনই যাও। আমার ঘরের পাওরায়
 পাড়াইয়া থাকিও না—আর এক দুর্ভটও হেরি করিও না।”

বলিয়া বৃদ্ধা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া
 গিল। অজ্ঞাত অন্ধকার মরিনবস্ত্র বিনোদিনী সূর্য্যোস্তে গাড়িতে গিয়া
 উঠিল। নহেন্দ্র যখন গাড়িতে উঠিতে গেল বিনোদিনী কহিল, “না,
 তেঁজন ঘরে নয়, তুমি হাঁটিয়া যাও।”

নহেন্দ্র কহিল, “তাহা হইলে গ্রামের সকল লোক আমাকে বেণিতে
 পাইবে।”

বিনোদিনী কহিল, “এখনও তোমার মতো বাকি আছে?”

বলিয়া গাড়ির ধরল বন্ধ করিয়া বিনোদিনী গাড়োয়ানকে বলিল,

ব্রাহ্মলক্ষ্মী বিছানার প্রান্তে অস্থানির্দেশ করিয়া মহেন্দ্রকে কহিলেন,
“মহিন, একটু বোস্ ।”

মহেন্দ্র সংকোচের সহিত বিছানায় বসিল । ব্রাহ্মলক্ষ্মী কহিলেন,
“মহিন, তোমার যেখানে ইচ্ছা তুই থাকিস, কিন্তু আমার বউমাকে তুই
কষ্টে দিস নে ।”

মহেন্দ্র চূপ করিয়া রহিল । ব্রাহ্মলক্ষ্মী কহিলেন, “আমার মন্দ কপাল,
তাই আমি আমার এমন লক্ষ্মী বউকে চিনিতে পারি নাই”—বলিতে
বলিতে ব্রাহ্মলক্ষ্মীর গলা ভাঙিয়া আসিল—“কিন্তু তুই তাহাকে এত দিন
ছানিয়া, এত ভালোবাসিয়া, শেষকালে এত দুঃখের মধ্যে ফেলিলি কী
করিয়া ।”

ব্রাহ্মলক্ষ্মী আর থাকিতে পারিলেন না, কাঁদিতে লাগিলেন ।

মহেন্দ্র সেখান হইতে কোনোমতে উঠিয়া পালাইতে পারিলে বাচে,
কিন্তু হঠাৎ উঠিতে পারিল না । মার বিছানার প্রান্তে অকস্মাৎ নিতরু
হইয়া বসিয়া রহিল ।

“অনেক কণ পয়ে ব্রাহ্মলক্ষ্মী কহিলেন, “আজ রায়ে তো এখানেই
আছিস ?”

মহেন্দ্র কহিল, “না ।”

ব্রাহ্মলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কখন যাবি ।”

মহেন্দ্র কহিল, “এখনই ।”

ব্রাহ্মলক্ষ্মী কষ্টে উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, “এখনই ? একবার বউমার
গলে ভালো করিয়া দেখাও করিয়া যাবি না ?”

মহেন্দ্র নিরুত্তর হইয়া রহিল । ব্রাহ্মলক্ষ্মী কহিলেন, “এ কয়টা দিন
বউমার কেমন করিয়া কাটিয়াছে, তাহা কি তুই একটু বৃদ্ধিতেও পারিলি
না । ৬৩২ নির্লক্ষ্য, তোমার নিঃসহায় আমার বুক ব্যাতিত যেন ।”

বসিয়া ব্রাহ্মলক্ষ্মী চির শাপের মধ্যে বিছানায় শুইয়া পড়িলেন ।

ବାସନ୍ତ ଋତୁ ଦିହନା ଛାଡ଼ିବା ବାନ୍ଧିବ ଶ୍ରେୟ ଲାଭ । ଏହି ସମୟ
 ମିଷ୍ଟାନ୍ନାଦି ଓ ମିଠି ମିଆଁ ଆଦିର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଏହା
 ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରେୟ ଲାଭ, ଏ ଆୟତ୍ତ ହେଉଛି ବିଧି ।

মাহেন্দ্র উপরে উল্লিখিত সেবিয়া, পল্লবগণের সমুদয়ে যে লক্ষ্য হয়
 আছে, সেইখানে অশা দাঁড়িয়ে পড়িয়া। সে মাহেন্দ্রের সমুদয়ে পদ পাত
 দাঁড়, হঠাৎ তাৎক্ষণিক সমুদয়ে উপস্থিত সেবিয়া তাৎক্ষণিক তাৎক্ষণিক
 লক্ষ্য উল্লিখিত। এই সমুদয়ে মাহেন্দ্র দ্বি-একটিমাত্র লক্ষিত 'কৃষ্ণ'-
 তাৎক্ষণিক সে মাহেন্দ্রের সমুদয়ে অশা দাঁড়িয়ে পড়িয়া। তাৎক্ষণিক
 লক্ষ্য তাৎক্ষণিক অশা দাঁড়িয়ে পড়িয়া। মাহেন্দ্রের দুই পা দাঁড়িয়ে পড়িয়া
 তাৎক্ষণিক তাৎক্ষণিক সমুদয়ে তাৎক্ষণিক লক্ষ্য। কিন্তু, মাহেন্দ্র সে লক্ষ্য
 তাৎক্ষণিক পড়িয়া না। দাঁড়িয়ে পড়িয়া, ইচ্ছা করিয়া, দাঁড়িয়ে পড়িয়া
 পড়িয়া, এ কথা কৃষ্ণের পড়িয়া না যে, অশা তাৎক্ষণিক তাৎক্ষণিক
 তাৎক্ষণিক পড়িয়া না। তাৎক্ষণিক তাৎক্ষণিক লক্ষ্য। তাৎক্ষণিক তাৎক্ষণিক
 তাৎক্ষণিক তাৎক্ষণিক পড়িয়া পড়িয়া পদ তাৎক্ষণিক তাৎক্ষণিক
 পদ পড়িয়া পড়িয়া।

[illegible]

આ બંધનના અનુભવને કારણે, આજના સમયના સર્જકોએ આવા સંજોગોમાં જીવવાની રીતો શોધી કાઢી છે.

এই আকাশ-ভরা অন্ধকার দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া যদি আগেকার ঠিক সেই দিনের মতো এই খোলা ছাদে মাহুর পাতিয়া আশার পাশে আমার সেই চিরস্থান স্থানটিতে অতি অনায়াসে গিয়া বসিতে পারি ! কোনো প্রশ্ন নাই, ভাবাবদিহি নাই ; সেই বিশ্বাস, সেই প্রেম, সেই সহজ আনন্দ ! কিন্তু হায়, জগৎসংসারে সেইটুকুমাত্র জায়গায় ফিরিবাব পপ আর নাই । এই ছাদে আশার পাশে মাহুরের একটুখানি ভাগ মহেস্ত একেবারে হারাইয়াছে । এতদিন বিনোদিনীর সঙ্গে মহেস্তের অনেকটা স্বাধীন সম্বন্ধ ছিল ; ভালো-বাসিবার উন্নত স্বপ্ন ছিল, কিন্তু তাহার অবিচ্ছেদ্য বন্ধন ছিল না । এখন মহেস্ত বিনোদিনীকে সমাজ হইতে বহুতে ছিন্ন করিয়া আনিয়াছে ; এখন আর বিনোদিনীকে কোথাও রাখিবার, কোথাও ফিরাইয়া দিবার জায়গা নাই—মহেস্তই তাহার একমাত্র নির্ভর । এখন ইচ্ছা থাকে বা না থাকে, বিনোদিনীর সমস্ত ভার তাহাকে বহন করিতেই হইবে । এই কথা মনে করিয়া মহেস্তের হৃদয় ভিতরে ভিতরে পীড়িত হইতে লাগিল । তাহাদের চাদের উপরকার এই গরুরমা, এই শান্তি, এই বাধাবিহীন দাম্পত্যমিলনের নিভৃত রাতি, হঠাৎ মহেস্তের কাছে বড়ো আরাধনের বলিয়া মনে হইল । কিন্তু এটো সহজমুসল্লি আরাধন, বাহ্যতে একমাত্র তাহারই অবিকার, তাহাই মাহু মহেস্তের পক্ষে চরাশার সামগ্রী । চিরজীবনের মতো যে বোকা সে মাথায় তুলিয়াছে, তাহা নানাইয়া মহেস্ত এক মুহূর্তও হাঁপ ছাড়িতে পারিলে না ।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মহেস্ত একবার আশার দিকে চাহিয়া দেখিল । নিতম্ব রোমনে বসে পহির্পূর্ণ করিয়া আশা তখনও নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছে—রাত্রির অন্ধকার চননীর অধরের হায় তাহার ললা ও বেলা আকৃত করিয়া রাখিয়াছে ।

মহেস্ত পায়েচাৰি বসে করিয়া কী বলিবার মত হঠাৎ আশার কাছে আসিয়া ধাক্কাটেল । সমস্ত শরীরের বস্তু আশার কানের মধ্যে গিয়া পড়

कविता काव्यिक, से कहूँ कविता कविता। मरने की वस्तु काव्यात्मिका
काव्यात्मा ही है—काव्यात्मा ही है वा कविता काव्यात्मा? किन्तु विद्वत् लोग
ना कविता काव्यात्मा कविता काव्यात्मा ना, कविता, "काव्यात्मा काव्यात्मा"

[illegible]

କାହାଣୀ ଏହି ଚାରି ଦିନ ଯେ କଥା ଘଟି ଯାଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ
 ଗାଁ ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା କଥା । ଗାଁ ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା କଥା ଗାଁ ଗାଁରେ
 ଘଟିଥିବା କଥା ଗାଁ ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା କଥା ଗାଁ ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା କଥା
 ଗାଁ ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା କଥା ଗାଁ ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା କଥା ଗାଁ ଗାଁରେ
 ଘଟିଥିବା କଥା ଗାଁ ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା କଥା ଗାଁ ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା କଥା
 ଗାଁ ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା କଥା ଗାଁ ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା କଥା ଗାଁ ଗାଁରେ
 ଘଟିଥିବା କଥା ଗାଁ ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା କଥା ଗାଁ ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା କଥା

विह भवित कथं शीतिप्राप्तं भवति हि । एतेन मया अहिंसा प्रका-
रान्तरं शीतिप्राप्तं भवति । अतएव कथं शीतिप्राप्तं भवति ।

“ସମାଧି, ସଂସାର ସିଂହାସ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଅଗ୍ନିର ଦେବୀ, ଚଢ଼ିଆ ।”

॥ वाचं धेनुमुपासीत ॥

दादाजी, तुमि अहिना काहिना नह ।

॥ १॥ अथ भूतलं भूतलं भूतलं भूतलं भूतलं ॥

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

হইয়া শ্রবণ সহ্য করিয়াছিলেন, আশাও সেরূপ রাজলক্ষীর কৃত সমস্ত প্রসাধন পরমধৈর্যে সর্বদা গ্রহণ করিল।

সাহ্য করিয়া আশা অতি দীর্ঘে দীর্ঘে নিঃশব্দ পদে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল। উকি দিয়া দেখিল, মহেন্দ্র ছাদে নাই। আস্তে আস্তে ঘরের কাছে আসিয়া দেখিল, মহেন্দ্র ঘরেও নাই, তাহার খাবার অতুল পড়িয়া আছে।

চাবির অভাবে কাপড়ের আলনারি জোর করিয়া খুলিয়া আনন্দকর একগাম কাপড় ও ডাল্কারি বই লইয়া মহেন্দ্র চলিয়া গেছে।

পরদিন একাদশী ছিল। অসুস্থ ক্রিষ্টদেহ রাজলক্ষী বিছানায় পড়িয়া ছিলেন। বাহিরে ঘন মেঘে ঝড়ের উপক্রম করিয়া আছে। আশা দীর্ঘে দীর্ঘে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আস্তে আস্তে রাজলক্ষীর পায়ে কাছ বসিয়া তাঁহার পায়ে হাত দিয়া কহিল, “তোনার দুখ ও ফল আনিয়াছি না, থাকে এসো।”

করণমূর্তি নব্বু এই অনভ্যস্ত সেবাব চেষ্টা দেখিয়া রাজলক্ষীর শুক চক্ষু প্রাবিত হইয়া গেল। তিনি উঠিয়া বসিয়া আশাকে কোলে লইয়া তাহার অশ্রুজলসিক্ত কপোল চুম্বন করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, “নহিন এখন কী করিতেছে বউমা।”

আশা অত্যন্ত লজ্জিত হইল, মুহূর্তে কহিল, “তিনি চলিয়া গেছেন।”

রাজলক্ষী। কখন চলিয়া গেল, আনি তো জানিতেও পারি নাই।

আশা নতশিরে কহিল, “তিনি কাল রাতেই গেছেন।”

শুনিবামাত্র রাজলক্ষীর সমস্ত কৌতুহল যেন দূর হইয়া গেল; নব্বু প্রতি তাঁহার আদরস্পর্শের মধ্যে আর হৃদয়গম্য বহিল না, আশা একটা নীচব লাকনা অস্ত্রভব করিয়া নতমুখে আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

না, নৈরাশকে সে স্বীকার করে না। তাহার মন অহরহ প্রাণপণ বলে বলিতেছে, 'আমার এ পূজা বিহারীকে গ্রহণ করিতেই হইবে।'

বিনোদিনীর এই দুর্দান্ত প্রেমের উপরে তাহার আত্মরক্ষার একান্ত আকাঙ্ক্ষা যোগ দিল। বিহারী ছাড়া তাহার আর উপায় নাই। মহেন্দ্রকে বিনোদিনী খুব ভালো করিয়াই জানিয়াছে; তাহার উপর নির্ভর করিতে গেলে সে ভরসা না—তাহাকে ছাড়িয়া দিলে তবেই তাহাকে পাওয়া যায়, তাহাকে ধরিয়া থাকিলে সে ছুটিতে চায়। কিন্তু নারীর পক্ষে যে নিশ্চিত বিষয় নিরাপদ নির্ভর একান্ত আবশ্যক বিহারীই তাহা দিতে পারে। আর আব বিহারীকে ছাড়িলে বিনোদিনীর একেবারেই চলিলে না।

গ্রাম ছাড়িয়া আগিলার দিন তাহার নামের সমস্ত চিঠিপত্র নূতন ত্রিকানায় পাঠাইবার চত্ব মহেন্দ্রকে দিয়া বিনোদিনী স্টেশনের সংলগ্ন পোস্ট, আপিসে বিশেষ করিয়া বলিয়া আসিয়াছিল। বিহারী যে একেবারেই তাহার চিঠির কোনো উত্তর দিবে না, এ কথা বিনোদিনী কোনোমতেই স্বীকার করিল না; সে বলিল, 'আমি সাতটা দিন ধৈর্য ধরিয়া উত্তরের চত্ব অপেক্ষা করিব, তাহার পরে দেখা যাইবে।'

এই বলিয়া বিনোদিনী অজ্ঞানতায় জানাসা খুলিয়া গ্যাসালোকদীপ কলিকাতার দিকে অগ্রসর চাহিয়া রহিল। এই সন্ধ্যাবেলায় বিহারী এই শহরের মধ্যেই আছে, ইহারই গোটাঅনেক দূরত্ব ৫ গজি পার হইয়া গেলেই এখনই তাহার দবজার কাছে পৌছানো যাইতে পারে; তাহার পরে সেই অশ্রু-কল-হালা ছোটো আত্মনা, সেই মিঁড়ি, সেই সুসজ্জিত পরিপাটি আলোকিত নিদ্রিত ঘরটি—সেখানে নিদ্রিত শাস্ত্রিয় নন্দা বিহারী একলা কেদারায় বসিয়া আছে—ইহাও কাছে সেই আবগাওয়াক, সেই অগোচর স্বন্দর গৌরবর্ণ আত্মনের মঙ্গলমুখি ছেলেটি নিজের মনে ছবির মত মনে পাতা উন্টাইতেছে—একে-একে সমস্ত চিঠিটা মনে

[illegible]

ଏକଜ୍ଞ ଜାଣିବେ ଜାଣିବେ ସେନ ହାରି ଗଲେ-କଳିଂଗ ବାସିନୀ ମେଳ
ହେବ ଯେଉଁ ଦୀବେ ଦୀବେ ଆସିବେ ଉପସ୍ଥିତ । ସାବିତ୍ରୀ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ
ଅହାତ ଉପସ୍ଥିତ ଅହାତ ସେ ବାଣୀବିହାରୀ, କାହା ଚିତ୍ତକାନ୍ତ ହେଉ
ମିଳାମିଳିତେ ସାଥୀ ଆସିବେ ଏକଦାବେ ଅବସାର ଏ ଜାଣିବେ ଅହାତ
ସେନ ଅବସାର କରିବେ ନିରାଶ । ଆଜି କାହା କାହାରେ ନାହିଁ, ନିଜା
ଅହାତ କାହା କାହାରେ ନାହିଁ ବସ ସେନ କାହାରେ ନାହିଁ । କାହା କାହାରେ
କାହାକାହା କାହା କାହାରେ ଜାଣି ସେନ କାହାରେ ଆଜି କାହା କାହାରେ
କାହାରେ ନାହିଁ ।

[illegible][illegible]

পরিষ্কৃত হইয়া উঠিল। এই-সমস্ত আয়োজন মহেন্দ্রকে সম্পূর্ণ করিতে হইবে, বাসার সমস্ত ব্যবস্থার ভাব তাহারই উপরে। মহেন্দ্র কখনও নিজের বা পরের আশ্রয়ের ভ্রম চিন্তা করে নাই—আজ হইতে একটি নতুনগঠিত অসম্পূর্ণ সংসারের সমস্ত খুঁটিনাটি তাহাকেই বহন করিতে হইবে। সিঁড়িতে একটা কেরোসিনের ভিবা অপবাণ্ড ধূমোদগার করিয়া মিটমিট করিতেছিল, তাহার পরিষ্কর্তে একটা ভালো ল্যাম্প, কিনিতে হইবে। বাবান্না বাহিয়া সিঁড়িতে উঠিবার রাস্তাটা কলের জলের প্রবাহে স্যাংস্যাং করিতেছে, মিস্ত্রি ভাকাইয়া বিলাতি বাটির দ্বারা সে জায়গা মেরামত করা আবশ্যক। রাস্তার দিকে ছুটো ঘর যে ছুতার দোকান-দারদের হাতে ছিল, তাহারা সে ছুটো ঘর এখনও ছাড়ে নাই, তাহা লটরা বাড়িওয়ানার সহিত লড়াই করিতে হইবে। এই-সমস্ত কাজ তাহার নিজে না করিলে নয়, ইহাই চকিতের মধ্যে মনে উদয় হইয়া তাহার শ্রান্তির বোঝায় আরও বোঝা চাপিল।

মহেন্দ্র সিঁড়ির কাছে কিছু কণ দাঁড়াইয়া নিজেদের সামলাইয়া লইল—বিনোদিনীর প্রতি তাহার যে প্রেম ছিল তাহাকে উত্তেজিত করিল। নিজেকে বুঝাইল যে, এতদিন সমস্ত পৃথিবীকে হুলিয়া সে যাহাকে চাহিয়াছিল আর তাহাকে পাইয়াছে, আজ উভয়ের নাকশ্বাসে কোনো বাধা নাই; আজ মহেন্দ্রের আনন্দের দিন। কিন্তু কোনো বাধা যে নাই তাহাট সর্বাপেক্ষা বড়ো বাধা, আজ মহেন্দ্র নিজেই নিজের বাধা।

বিনোদিনী রাস্তা হইতে মহেন্দ্রকে দেখিয়া তাহার দ্যানাসন হইতে উঠিয়া ঘরে আলো আগিল এবং একটা সেলাই কোলে লইয়া নতশিরে তাড়াতৈ নিবিষ্ট হইল; এই সেলাই বিনোদিনীর আবদর, ইহার অনুরাগে তাহার ঘেন একটা আশ্রয় আছে।

মহেন্দ্র ঘরে ঢুকিয়া বহিল, “বিনোদ, এখানে নিশ্চয় তোমার অনেক ‘মহাবিশ্ব’ গুটিতেছে।”

বলিয়া এই উপলক্ষে মহেন্দ্র একটুখানি সরিয়া আসিয়া কাপড়ে-বাঁধা হইয়ের পুটুলি বিনোদিনীর পায়ের কাছে আনিয়া ফেলিল।

বিনোদিনী গম্ভীর মুখে সেলাই করিতে করিতে মাথা না তুলিয়া বলিল, “ঠাকুরপো, এখানে তোমার থাকা হইবে না।”

মহেন্দ্র তাহার সম্ভোজাগ্রত আগ্রহের মুখে প্রতিঘাত পাইয়া ব্যাধুল হইয়া উঠিল, গব্গদকণ্ঠে কহিল, “কেন বিনোদ, কেন তুমি আমাকে দূরে রাখিতে চাও। তোমার জন্ত সমস্ত ত্যাগ করিয়া কি এই পাইলাম।”

বিনোদিনী। আমার জন্ত তোমাকে সমস্ত ত্যাগ করিতে দিব না।

মহেন্দ্র বলিয়া উঠিল, “এখন সে আর তোমার হাতে নাই—সমস্ত সংসার আমার চারি দিক হইতে ঝলিত হইয়া পড়িয়াছে, কেবল তুমি একলা মাত্র বিনোদ। বিনোদ—বিনোদ—”

বলিতে বলিতে মহেন্দ্র শুইয়া পড়িয়া বিহ্বল ভাবে বিনোদিনীর পা স্নেহ করিয়া চাপিয়া ধরিল এবং তাহার পদপদ্মের নারংবার চুখন করিতে লাগিল।

বিনোদিনী পা ছাড়াইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, “মহেন্দ্র, তুমি কী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে মনে নাই?”

সমস্ত বলপ্রয়োগ করিয়া মহেন্দ্র আব্রুসংরক্ষণ করিয়া লইল; কহিল, “মনে আছে। শপথ করিয়াছিলাম, তোমার বাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে, আমি কখনও তাহার কোনো অগ্রথা করিব না। সেই শপথই হুকা করিব। কী করিতে হইবে বলো।”

বিনোদিনী। তুমি তোমার বাড়িতে গিয়া থাকিবে।

মহেন্দ্র। আনিই কি তোমার একমাত্র অনিচ্ছার শাস্ত্রী বিনোদ। তাই যদি হইবে, তবে তুমি আমাকে টানিয়া আনিবে কেন। যে তোমার ভোগের সামগ্রী নয়, তাহাকে পিষার করিবার কী প্রয়োজন ছিল।

মতা করিয়া বলো, আমি কি ইচ্ছা করিয়া তোমার কাছে ধরা দিয়াছি না তুমি ইচ্ছা করিয়া আমাকে ধরিয়াছ। আমাকে লইয়া তুমি এইরূপ খেলা করিবে, ইহাও কি আমি সহ্য করিব। তবু আমি আমার গম্বু পালন করিব—যে বাড়িতে আমি নিজের স্বান পড়াঘাটে চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি সেই বাড়িতে গিয়াই আমি থাকিব।

বিনোদিনী ভূমিতে বসিয়া পুনরায় নিরুত্তরে সেলাই করিতে লাগিল।

মহেন্দ্র কিছুক্ষণ দ্বিভাষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া উঠিল, “নিষ্ঠুর, বিনোদ, তুমি নিষ্ঠুর। আমি অভাষ্য হতভাগা যে, আমি তোমাকে ভালোবাসিয়াছি।”

বিনোদিনী সেলাইয়ে একটা ভুল করিয়া আলোর কাছে ধরিয়া তাহা বহু যত্নে পুনরায় ভূমিতে লাগিল। মহেন্দ্রের ইচ্ছা করিতে লাগিল, বিনোদিনীর ওই পাষণ্ড দ্রবঢটাকে নিজের কঠিন মূর্তির মধ্যে সংলগ্ন চাপিয়া ভাঙিয়া ফেলে। এই নীরব নির্দহতা ও অবিচলিত উপেক্ষাকে প্রবল আঘাত করিয়া যেন বাতবলের দ্বারা পরাস্ত করিতে ইচ্ছা করে।

মহেন্দ্র ঘর হইতে বাহির হইয়া পুনরায় কিরিয়া আসিল; কহিল, “আমি না থাকিলে এখানে একাকিনী তোমাকে কে রক্ষা করিবে।”

বিনোদিনী কহিল, “সেইট তুমি কিছুমাত্র ভয় করিও না। পিসিমা খেমিকে ছাড়াইয়া দিয়াছেন, সে আজ আমার এখানে আসিয়া বাস লইয়াছে। ঘরে তোলা দিয়া আমরা দুই স্ত্রীলোকে এখানে বেগ থাকিব।”

মনে মনে যতই রাগ হইতে লাগিল, বিনোদিনীর প্রতি মহেন্দ্রের আকর্ষণ ততই একান্ত প্রবল হইয়া উঠিল। ওই অটল মূর্তিকে বহুবলে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া দ্রিষ্টে পিষ্টে করিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। সেই শরণ ইচ্ছার হাত এড়াইবার জন্য মহেন্দ্র চুটিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাষ্ট্রায় ঘুরিতে ঘুরিতে মহেন্দ্র প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিল, বিনোদিনীকে সে উপেক্ষার পরিবর্তে উপেক্ষা দেখাইবে। যে অবস্থায় বিশ্বত্রগতে বিনোদিনীর একমাত্র নির্ভর মহেন্দ্র সে অবস্থাতেও মহেন্দ্রকে এমন নীরবে নির্ভয়ে, এমন স্থূলত্ব সম্পন্ন ভাবে প্রত্যাখ্যান, এত বড়ো অপমান কি কোনো পুরুষের ভাগ্যে কখনও ঘটিয়াছে। মহেন্দ্রের গর্ব চূর্ণ হইয়াও কিছুতেই মরিতে চাহিল না, সে কেবলই পীড়িত বলিত হইতে লাগিল। মহেন্দ্র বলিল, ‘আমি কি এতই অপরাধ! আমার সমক্ষে এত বড়ো স্পর্ধা কী করিয়া তাহার মনে হইল। আমি ছাড়া এখন তাহার আর কে আছে।’

ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ মনে পড়িল—বিহারী। হঠাৎ এক দুর্ভর্তের স্ত্রী তাহার বস্তুর সমস্ত রক্তপ্রবাহ যেন শুরু হইয়া গেল। ‘বিহারীর উপরেই বিনোদিনী নির্ভর স্থাপন করিয়া আছে—আমি তাহার উপলক্ষ্য-মাত্র, আমি তাহার সোপান, তাহার পা রাখিবার, পদে পদে পদাঘাত করিবার স্থান। সেই সাহসেই আমার প্রতি এত অবজ্ঞা।’

মহেন্দ্রের সন্দেহ হইল, বিহারীর সহিত বিনোদিনীর চিঠিপত্র চলিতেছে এবং বিনোদিনী তাহার কাছ হইতে কোনো আশ্বাস পাইয়াছে।

তখনই মহেন্দ্র বিহারীর বাড়ির দিকে চলিল। যখন বিহারীর ঘরে গিয়া ঘা দিল তখন রাতি আর বড়ো অধিক নাই। অনেক ধাক্কা পর দেহারা ভিতর হইতে স্বৰ্ণা খুলিয়া দিয়া কহিল, ‘বাবুদি বাড়ি নাই।’

মহেন্দ্র চমকিয়া উঠিল। ভাবিল, ‘আমি যখন নির্বোধের মতো রাষ্ট্রায় রাষ্ট্রায় চুটিয়া বেড়াইতেছি, বিহারী সেই অবকাশে বিনোদিনীর কাছে গেছে। এইভাবেই বিনোদিনী আমাকে এত দ্বন্দ্ব এমন নির্ভয় ভাবে অপমান করিয়াছে, এবং আমিও তাড়িৎ গম্ভীর মতো চুটিয়া চমকিয়া আসিয়াছি।’

মহেন্দ্র তাহার পুরাতন পরিচিত বেহারাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভদ্দু, বাবু কখন বাহির হইয়া গেছেন।"

ভদ্দু কহিল, "সে আশু চার-পাঁচ দিন হইয়া গেছে। তিনি পশ্চিমে কোথায় বেড়াইতে গেছেন।"

শুনিয়া মহেন্দ্র বাঁচিয়া গেল। তাহার মনে হইল, 'এইবার একটু শুইয়া আরামে ঘুমাई, আর সমস্ত রাত ঘুমিয়া বেড়াইতে পারি না।'

বলিয়া উপরে উঠিয়া বিহারীর ঘরে কোচের উপর শুইয়া তৎক্ষণাৎ ঘুমাইয়া পড়িল।

মহেন্দ্র যে রাতে বিহারীর ঘরে আসিয়া উপস্থিত করিয়াছিল, তাহার পরদিনই বিহারী কোথায় বাইতে হইবে কিছুই স্থির না করিয়া পশ্চিমে চলিয়া গেছে। বিহারী ভাবিল, এখানে থাকিলে পূর্ববঙ্গের সহিত সংসর্গ কোন্-এক দিন এমন বীভৎস হইয়া উঠিবে যে, তাহার পর চিরজীবন অতৃপ্তাপের কারণ থাকিয়া যাইবে।

পরদিন মহেন্দ্র খপন উঠিল তখন বেলা এগারোটা। উঠিয়াই সন্ধ্যাপর টিপাইয়ের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। বেবিল বিনোদিনীর হস্তাক্ষরে বিহারীর নামে এক পদ পাথরের কাগজ-চাপা লিখা চাপা রহিয়াছে। তাড়াতাড়ি তাহা তুলিয়া লইয়া দেখিল, পদ এখনও খোলা হয় নাই। প্রবাসী বিহারীর মস্ত তাহা অপেক্ষা করিয়া আছে। কম্পিত হস্তে মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি তাহা খুলিয়া পড়িতে লাগিল। এই চিঠিই বিনোদিনী তাহারের গ্রাম হইতে বিহারীকে লিখিয়াছিল এবং ইহার কোনো অবার সে পায় নাই।

চিঠির প্রত্যেক অক্ষর মহেন্দ্রকে চঞ্চল করিতে লাগিল। বাল্যকাল হইতে বরাদ্দ বিহারী মহেন্দ্রের অন্তরালেই পড়িয়া ছিল। অদ্যতঃ মেহ-প্রেম সম্বন্ধে মহেন্দ্র-সেবতার স্তব নির্দোষই তাহার ভাষা সূচিত। আর মহেন্দ্র স্বয়ং প্রার্থী এবং বিহারী বিদূষ, তবু মহেন্দ্রকে যেখিয়া বিনোদিনী

এই অৱশিষ্ট বিহাৰীকেই বৰণ কৰিলে ! মহেন্দ্ৰও বিনোদিনীৰ দুই-চাৰিখানা চিঠি পাইয়াছে, কিন্তু বিহাৰীৰ এ চিঠিৰ কাছে তাহা নিতান্ত হুত্ৰিম, তাহা নিৰ্বোধকে ভুলাইবাৰ শৃংখলা ।

নতুন ঠিকানা জানাইবাৰ জন্তু গ্ৰামেৰ ডাকঘৰে মহেন্দ্ৰকে পাঠাইতে বিনোদিনীৰ ব্যগ্ৰতা মহেন্দ্ৰেৰ মনে পড়িলে এবং তাহাৰ কাৰণ সে বুকিতে পাৰিলে । বিনোদিনী তাহাৰ সমস্ত মন গ্ৰাণ দিয়া বিহাৰীৰ চিঠিৰ উত্তৰ পাইবাৰ জন্তু পথ চাহিয়া বসিয়া আছে ।

পূৰ্বপ্ৰথা-মত মনিব না থাকিলেও ভৰু বেহাৰা মহেন্দ্ৰকে চা এবং বাজাৰ হইতে জলধাবাৰ আনিয়া খাওয়াইল । মহেন্দ্ৰ প্ৰান ভুলিয়া গেল । উত্তপ্ত বালুকাৰ উপৰ দিয়া পথিক যেমন দ্ৰুত পদে চলে, মহেন্দ্ৰ সেইৰূপ অগ্নে অগ্নে বিনোদিনীৰ জ্বালাকৰ চিঠিৰ উপৰ দ্ৰুত চোখ বুলাইতে লাগিল । মহেন্দ্ৰ পণ কবিতো লাগিল, বিনোদিনীৰ সন্নে আৰ কিছুতেই দেখা কৰিবে না । কিন্তু তাহাৰ মনে হইল, আৰ দুই-এক দিন চিঠিৰ জবাব না পাইলে বিনোদিনী বিহাৰীৰ বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং তখন সমস্ত অবস্থা জানিতে পাৰিয়া সাবনা লাভ কৰিবে । সে সম্ভাবনা তাহাৰ কাছে অসহ্য বোধ হইল ।

তখন চিঠিখানা পকেটে কৰিয়া মহেন্দ্ৰ সন্ধ্যাৰ কিছু পূৰ্বে পটলভাট্টাৰ বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল ।

মহেন্দ্ৰেৰ দ্বান অবস্থায় বিনোদিনীৰ মনে পয়া হইল ; সে বুকিতে পাৰিলে, মহেন্দ্ৰ কাল ৱায়ে হয়তো পথে পথে মনিস্থাৰ খাপন কৰিয়াছে । দ্বিভাষা কৰিলে, “কাল ৱায়ে বাড়ি যাও নাই ?”

মহেন্দ্ৰ কহিল, “না ।”

বিনোদিনী ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, “আৰ এখনও হোমাব খাওয়া হয় নি নাকি ?”

বলিয়া সেৱাপ্ৰদায়ণ বিনোদিনী তৎক্ষণাত্ তাহাৰ আয়োজন

করিতে উদ্যত হইল।

মহেন্দ্র কহিল, “থাক্ থাক্, আমি খাইয়া আসিরাছি।”

বিনোদিনী। কোথায় খাইরাছ।

মহেন্দ্র। বিহারীদের বাড়িতে।

মহেন্দ্রের দৃষ্টি বিনোদিনীর মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। দুর্ভিক্ষ-
নিরন্তর থাকিয়া আশ্রয়-সংগ্রহ করিয়া বিনোদিনী বিজ্ঞানী কহিল,
“বিহারী-ঠাকুরপো ভালো আছেন তো?”

মহেন্দ্র কহিল, “ভালোই আছে। বিহারী যে পশ্চিমে চলিয়া গেল।”

মহেন্দ্র এমন ভাবে বলিল, যেন বিহারী আত্মই বণনা হইয়াছে।

বিনোদিনীর মুখ আর-একবার পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। পুনর্বার আশ্র-
সংগ্রহ করিয়া সে কহিল, “এমন চকল লোকও তো দেখি নাই।—
আমানের সমস্ত খবর পাইয়াছেন বুঝি? ঠাকুরপো খুব কি রাগ
করিয়াছেন।”

মহেন্দ্র। তা না হইলে এই অসহ্য গরমের সময় কি বাহ্য শয়
করিয়া পশ্চিমে বেড়াইতে যায়।

বিনোদিনী। আমার কথা কিছু বলিলেন না কি।

মহেন্দ্র। বলিবার আর কী আছে। এই লগ বিহারীর চিঠি।

বলিয়া চিঠিখানা বিনোদিনীর হাতে দিয়া মহেন্দ্র তীব্র দৃষ্টিতে
তাহার মুখের ভাব নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি চিঠি লইয়া দেখিল, খোলা চিঠি—মেঝার
উপরে তাহারই হস্তাক্ষরে বিহারীর নাম লেখা। মেঝার হইতে বাহির
করিয়া দেখিল, তাহারই লেখা সেই চিঠি। উন্টাইয়া-পান্টাইয়া কোথাও
বিহারীর লেখা সবাব কিছুই দেখিতে পাইল না।

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বিনোদিনী ~~কহিল~~ বিজ্ঞানী কহিল,
“চিঠিখানা তুমি পড়িয়া

বিনোদিনীর মুখের ভাব দেখিয়া মহেন্দ্রের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। সে বসু করিয়া মিথ্যা কথা কহিল, “না।”

বিনোদিনী চিঠিখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া, পুনরায় তাহা কুটিকুটি করিয়া, জানালার বাহিরে ফেলিয়া দিল।

মহেন্দ্র কহিল, “আমি বাড়ি যাইতেছি।”

বিনোদিনী তাহার কোনো উত্তর দিল না।

মহেন্দ্র। তুমি যেমন ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছ আমি তাহাই করিব। সাত দিন আমি বাড়িতে থাকিব। কলেজে আসিবার সময় প্রত্যহ একবার এগানকার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া থেমির হাতে দিয়া যাইব। দেখা করিয়া তোমাকে বিদ্রক্ত করিব না।

বিনোদিনী মহেন্দ্রের কোনো কথা শুনিতে পাইল কিনা কে জানে, কিন্তু কোনো উত্তর করিল না—খোলা জানালার বাহিরে অন্ধকার আকাশে চাহিয়া রহিল।

মহেন্দ্র তাহার জিনিসপত্র লইয়া বাহির হইয়া গেল।

বিনোদিনী শূন্তগৃহে অনেক কণ আঙ্গঠের মতো বসিয়া থাকিয়া অবশেষে নিজেকে যেন প্রাণপণ বলে মচেতন করিবার জন্য বস্তুর কাপড় ছিঁড়িয়া আপনাকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করিতে লাগিল।

থেমি শব্দ শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া আসিয়া কহিল, “বউঠাকরুন, করিতেছ কী।”

“তুই যা এগান থেকে” বলিয়া গর্জন করিয়া উঠিয়া বিনোদিনী থেমিকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল। তাহার পর সমস্ত দ্বার বন্ধ করিয়া, হুই হাত নুঁচা করিয়া, মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া, বাপাহত ভক্তর মতো আত্মহত্রে দাঁড়িতে লাগিল। এইরূপে বিনোদিনী নিজেকে বিনষ্ট পরিশ্রান্ত করিয়া নুহিতের মতো মৃত বাতায়নের তলে সমস্ত রাতি পড়িয়া বহিল।

প্রাতঃকালে স্বর্গলোক গৃহে প্রবেশ করিতেই তাহার হঠাৎ মনে
হইল, বিহারী যদি না গিয়া থাকে, মহেন্দ্র যদি বিনোদিনীকে হুলাইবার
অন্ত নিখা বলিয়া থাকে। তৎক্ষণাৎ খেলিকে ডাকিয়া কহিল, “খেলি, তুমি
এখনই যা—বিহারী-ঠাকুরদাসের বাড়ি গিয়া তাঁহাদের বলব লইয়া আস।”

খেলি ঘণ্টাপানেক পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, “বিহারীবাবুর বাড়ির
সমস্ত জানালা-দরজা বন্ধ। দরজায় যা দিতে ভিতর হইতে বেহারা বলিল,
বাবু বাড়িতে নাই, তিনি পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছেন।”

বিনোদিনীর মনে আশ্রয় সন্দেহের কোনোই কারণ বহিল না।

৪২

রাতেই মহেন্দ্র শয্যা ছাড়িয়া গেছে শুনিয়া বাদলস্বামী যদুব প্রভি অত্যন্ত
রাগ করিলেন। মনে করিলেন, আশার লাহনাতেই মহেন্দ্র চলিয়া গেছে।
বাদলস্বামী আশাকে দ্বিভাঙ্গা করিলেন, “মহেন্দ্র কাল রাতে চলিয়া গেল
কেন।”

আশা হুম্ব মিচু করিয়া বলিল, “জানি না মা।”

বাদলস্বামী ভাবিলেন, এটাও অভিমানের কথা। বিরক্ত হইয়া কহিলেন,
“তুমি জান না তো কে জানিবে। তাহাকে কিছু বলিয়াছিলে?”

আশা কেবলমাত্র বলিল, “না।”

বাদলস্বামী বিগ্নান করিলেন না। এ কি কখনও সম্ভব হইত।

দ্বিভাঙ্গা করিলেন, “কাল মহিন কখন গেল।”

আশা সংকুচিত হইয়া কহিল, “জানি না।”

বাদলস্বামী অত্যন্ত রাগিয়া উঠিয়া কহিলেন, “তুমি কিফে জান না!
কিচি হুলী! তোমার সমস্ত চাকাকি।”

আশারই আচরণে ও স্বভাবস্বার্থেই যে মহেন্দ্র গৃহত্যাগি হইয়াছে, এ
মত ও বাদলস্বামী তাঁর পরে যোগদান করিয়া গিলেন। আশা মতনতকে সেই

ভাবনা বহন করিয়া নিম্নের ঘরে গিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে মনে মনে ভাবিল, 'কেন যে আমাকে আমার স্বামী একদিন ভালোবাসিয়াছিলেন তাহা আমি জানি না, এবং কেনন করিয়া যে তাঁহার ভালোবাসা ফিরিয়া পাইব তাহাও আমি বলিতে পারি না।' যে লোক ভালোবাসে তাহাকে কেনন করিয়া খুশি করিতে হয় তাহা হৃদয় আপনি বলিয়া দেয়; কিন্তু যে ভালোবাসে না তাহার মন কী করিয়া পাইতে হয় আশা তাহার কী জানে! যে লোক অতর্কে ভালোবাসে তাহার নিকট হইতে লোহাগ লইতে যাওয়ার মতো এমন নিরতিশয় লজ্জাকর চেষ্টা সে কেনন করিয়া করিবে!

মধ্যাকালে বাড়ির দৈবজ্ঞ-ঠাকুর এবং তাঁহার ভগিনী আচার্য-ঠাকরন আসিয়াছেন। ছেলের গ্রহশাস্তির জন্য রাজলক্ষ্মী ইহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। রাজলক্ষ্মী একবার হউমার কোম্পী এবং হাত দেগিবার জন্য দৈবজ্ঞকে অহরোশ করিলেন এবং সেই উপলক্ষ্যে আশাকে উপস্থিত করিলেন। পরের কাছে নিম্নের ছুঁতগা-আলোচনার সংকোচে একান্ত কুণ্ঠিত হইয়া আশা কোনোমতে তাহার হাত বাহির করিয়া বসিয়াচে, এমন সময় রাজলক্ষ্মী তাঁহার ঘরের পার্শ্বস্থ দীপহীন বারান্দা দিয়া ঘূহু ছুতার শব্দ পাইলেন—কে যেন গোপনে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। রাজলক্ষ্মী ডাকিলেন, "কে ও।"

প্রথমে সাজা পাইলেন না। তাহার পর আবার ডাকিলেন, "কে যাদ গো।"

তখন নিরুত্তরে মহেশ্বর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

আশা খুশি হইবে কি, মহেশ্বরের লজ্জা দেখিয়া লজ্জায় তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল। মহেশ্বরে এখন নিম্নের বাড়িতেও চোরের মতো প্রবেশ করিতে হয়। দৈবজ্ঞ এবং আচার্য-ঠাকরন বসিয়া আছেন বলিয়া তাহার আরও লজ্জা হইল। সনৎ পৃথিবীর কাছে নিম্নের স্থানীয় ভৃত্য যে লজ্জা,

ইহাই আশার ছাখের চেয়েও যেন বেশি হইয়া উঠিয়াছে। স্বামিনী যখন
মুহু যবে বউকে বলিলেন “বউমা, পার্বতীকে বলিয়া নাও, মহিনের খাবার
ওহাইয়া আনে” তখন আশা কহিল, “না, আমিই আনিতেছি।”

বাড়ীর দাসদাসীদের দৃষ্টি হইতেও সে মহেন্দ্রকে ঢাকিয়া বাধিতে চায়।

এ দিকে আচার্য ও তাঁহার ভগিনীকে দেখিয়া মহেন্দ্র যখন মনে অসহ্য
রাগ করিল। তাহার মাতা ও স্ত্রী বৈদ্যসহায়ে তাহাকে বশ করিবার জন্য
এই অশিক্ষিত নৃত্যের সহিত নির্মল ভাবে মজবুত করিতেছে, ইহা
মহেন্দ্রের অসহ্য বোধ হইল। ইহার উপর যখন আচার্য-ঠাকরন কর্তব্যে
অতিরিক্ত মধুমাতা মেহরসের সকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “ভালো
আছ তো বাবা?” তখন মহেন্দ্র আর বলিয়া থাকিতে পারিল না। ক্রন্দ-
প্রবের কোনো উত্তর না দিয়া কহিল, “মা, আমি একবার উপরে
যাইতেছি।”

মা ডাকিলেন মহেন্দ্র নুনি শয়নগৃহে গিয়লে নধর সঙ্গে কথাবার্তা করিতে
চায়। অত্যন্ত দুশি হইয়া তাড়াতাড়ি বদনশালায় নিজে গিয়া মাথাত
কহিলেন, “যাও যাও, তুমি একবার শীত উপরে যাও, মহিনের বৃত্তি কী
সরকার আছে।”

আশা ছুফুফুকে সমগ্রকাল পরস্পরে উপরে গেল। শাত্তির কথা
সে মনে করিয়াছিল, মহেন্দ্র বৃত্তি তাহাকে ডাকিয়াছে। কিন্তু যতই মন
কোনো মহেন্দ্র হঠাৎ চুপিতে পারিল না, চুপিব্য পূর্বে মাথা অঙ্গদারে
যারের অশ্রুমালা মহেন্দ্রকে দেখিতে লাগিল।

মহেন্দ্র তখন অত্যন্ত শূন্যমনে নোচের বিজানায় গিয়া তাড়িয়াই যেন
সিয়া কড়িকাঠ পর্যালোচনা করিতেছিল। এই তো সেই মহেন্দ্র, সেই মনট,
কিন্তু কী পরিবর্তন! এই ক্রম শয়নশয়নিক একদিন মহেন্দ্র স্বর্ণ করিয়া
হুনিয়াছিল—মাতা কেন সেই আনন্দবৃত্তি-কৃত্তিকার ঘরটিকে মনস্ত
অপমান করিতেছে? এই দিকে... না যদি, তবে ও

শব্দায় আর বসিয়ে না নহে! এখানে আসিয়াও যদি মনে না পড়ে সেই-সমস্ত পরিপূর্ণ গভীর রাত্রি, সেই-সমস্ত স্থনিবিড় মধ্যাহ্ন, আত্মহারা কর্ম-বিশ্রুত ঘনবর্ষার দিন, দক্ষিণবায়ুকম্পিত বগন্তের বিহ্বল মধ্যাহ্ন, সেই অনন্ত অসীম অসংখ্য অনির্বচনীয় কথাগুলি, তবে এ বাড়িতে অত্ন অনেক ঘর আছে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র ঘরটিতে আন এক নূর্ত ও নহে।

আশা অন্ধকারে দাঁড়াইয়া যতই মহেস্তকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল ততই তাহার মনে হইতে লাগিল, মহেস্ত এইমাত্র সেই বিনোদিনীর কাছ হইতে আসিতেছে, তাহার অঙ্গে সেই বিনোদিনীর স্পর্শ, তাহার চোখে সেই বিনোদিনীর মূর্তি, কানে সেই বিনোদিনীর কণ্ঠস্বর, মনে সেই বিনোদিনীর বাসনা একেবারে লিপ্ত জড়িত হইয়া আছে। এই মহেস্তকে আশা কেমন করিয়া পবিত্র ভক্তি দিবে, কেমন করিয়া একাগ্রমনে বলিবে 'এসো আমার অনন্তপরায়ণ হৃদয়ের মধ্যে এসো—আমার অটলনিষ্ঠ সতী-প্রেমের শুভ্র শতদলেব উপর তোমার চরণ-ছায়া রাখো'। সে তাহার মাসির উপদেশ, পুরাণের কথা, শাস্ত্রের অহুশাসন কিছুই মানিতে পারিল না—এই দাম্পত্যবর্গচ্যুত মহেস্তকে সে আর মনের মধ্যে দেবতা বলিয়া অতুল করিল না, সে আশা বিনোদিনীর বলকপারাবারের মধ্যে তাহার হৃদয়দেবতাকে বিসর্জন দিল। সেই প্রেমশূন্য রাত্রির অন্ধকারে তাহার কানের মধ্যে, নুকের মধ্যে, মস্তিষ্কের মধ্যে, তাহার সর্বদেহ রক্তস্রোতের মধ্যে, তাহার চারি দিকের সমস্ত সংসারে, তাহার আকাশের নক্ষত্রে, তাহার প্রাচীরবেষ্টিত নিভৃত ছাদটিতে, তাহার শয়নগৃহের পরিত্যক্ত বিবহাশয্যাতে একটি ভয়ানক গভীর ব্যাকুলতার সঙ্গে বিসর্জনের ব্যস্ত বাহিতে লাগিল।

বিনোদিনীর মহেস্ত যেন আশার গর্ভে পরপুরুষ, যেন পরপুরুষেরও যদিও, এমন লজ্জার বিষয় যেন অতি-বড়ো অপরিচিত ও নহে। সে কোনোমতেই ঘরে প্রবেশ করিতে পারিল না।

ইহা হইয়া আশার চক্ষে চেয়েও যেন বেশি হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীনতম ধর্ম
মুহুরের দউকে বলিলেন “বউমা, পার্বতীকে বলিগা মাও, মহিনের খাশার
ওড়াইয়া আনেন” তখন আশা কহিল, “মা, আমিই আনিতেছি।”

বাড়ীর দামবাসীদের দৃষ্টি হইতেও সে মহেন্দ্রকে চাকিয়া থাকিতে চায়।

এ দিকে আচার্য ও তাঁহার ভগিনীকে দেখিয়া মহেন্দ্র মনে মনে অত্যন্ত
রাগ করিল। তাহার মাতা ও স্বী বৈদ্যসহায়ে তাহাকে ধর করিবার জন্য
এই অশিক্ষিত নৃত্যের সহিত নির্ভর ভাবে বড়বর করিতেছে, ইহা
মহেন্দ্রের অসহ্য বোধ হইল। ইহার উপর যখন আচার্য-ঠাকরন কঠোর
অতিরিক্ত মনুনাথা দেহবলের দ্বারা কহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “ভালো
আছ তো বাবা?” তখন মহেন্দ্র আর সন্দিগ্ধ থাকিতে পারিল না; দুঃখ-
প্রবোধ কোনো উত্তর না দিয়া কহিল, “মা, আমি একবার উপরে
বাইতেছি।”

না ভাবিলেন মহেন্দ্র বুদ্ধি শমনগৃহে দিয়লে বধুর সঙ্গে কথাবার্তা করিতে
চায়। অত্যন্ত গুণি হইয়া তাড়াতাড়ি ব্রহ্মশাসাধ নিজে গিয়া আশাকে
কহিলেন, “মাও মাও, তুমি একবার কী উপরে যাও, মহিনের বুদ্ধি কী
দরকার আছে।”

আশা ছুতছুতকে সমস্তকোচ পরক্ষণে উপরে গেল। পাণ্ডুর কথা
সে মনে করিয়াছিল, মহেন্দ্র বুদ্ধি তাহাকে তাকিয়াছে। কিন্তু ঘরের মধ্যে
কোনো মাতাই হঠাৎ চুপিত পারিল না, চুপিতার পূর্বে আশা দরবার
দ্বারের অগ্রদ্বারে মহেন্দ্রকে দেখিতে লাগিল।

মহেন্দ্র তখন অত্যন্ত মূগ্ধভাবে নীচের বিজানায় পড়িয়া তাকিয়াই থৈ
দিয়া কড়িকাঠ পর্যালোচনা করিতেছিল। এই যে সেই মহেন্দ্র, সেট মাই,
কিন্তু কী পরিবর্তন! এই মুহূর্ত শমনমন্দির একদিন মহেন্দ্র স্বর্গ করিয়া
প্রদানতিল—আর কেন সেই আনন্দকরিত-পরিচয় করিলেন মহেন্দ্র
“সম্মান করিতেছে। এই সন্ত, এই বিবাহ, এই চাকর্য যদি, যখন ও

শয্যায় আর বসিযো না মহেন্দ্র! এখানে আসিয়াও যদি মনে না পড়ে সেই-সমস্ত পরিপূর্ণ গভীর রাত্রি, সেই-সমস্ত হ্রনিবিড মধ্যাহ্ন, আত্মহারা কর্ম-বিশুদ্ধ ঘনবর্ষার দিন, দক্ষিণবায়ুকম্পিত বসন্তের বিহ্বল সন্ধ্যা, সেই অনন্ত অসীম অসংখ্য অনির্বচনীয় কথাগুলি, তবে এ বাড়িতে অল্প অনেক ঘর আছে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র ঘরটিতে আর এক মুহূর্তও নহে।

আশা অন্ধকারে দাঁড়াইয়া যতই মহেন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল ততই তাহাব মনে হইতে লাগিল, মহেন্দ্র এইমাত্র সেই বিনোদিনীর কাছ হইতে আসিতেছে, তাহার অঙ্গে সেই বিনোদিনীর স্পর্শ, তাহার চোখে সেই বিনোদিনীর মূর্তি, কানে সেই বিনোদিনীর কণ্ঠস্বর, মনে সেই বিনোদিনীর বাসনা একেবারে লিপ্ত জড়িত হইয়া আছে। এই মহেন্দ্রকে আশা কেমন করিয়া পবিত্র ভক্তি দিবে, কেমন করিয়া একাগ্রমনে বলিবে 'এসো আমার অনন্তপরায়ণ হৃদয়ের মধ্যে এসো—আমার অটলনিষ্ঠ সতী-প্রেমের শুষ্ক শতদলের উপর তোমার চরণ-ছায়া রাখো'। সে তাহার মাসির উপদেশ, পুরাণের কথা, শাস্ত্রের অহুশাসন কিছুই মানিতে পারিল না—এই দাম্পত্যস্বর্গচ্যুত মহেন্দ্রকে সে আব মনের মধ্যে দেবতা বলিয়া মূহূর্ত করিল না, সে আজ বিনোদিনীর কলঙ্কপায়াবারের মধ্যে তাহার হৃদয়দেবতাকে বিসর্জন দিল। সেই প্রেমশূন্য রাত্রির অন্ধকারে তাহার কানের মধ্যে, বুকের মধ্যে, মস্তিষ্কের মধ্যে, তাহার সর্বদেহে বস্ত্রদ্রোহের মধ্যে, তাহার চারি বিকেব সমস্ত সংসারে, তাহার আকাশের নক্ষত্রে, তাহার প্রাচীরদেহিত নিভৃত ছায়াটিতে, তাহার শয়নগৃহের পরিত্যক্ত বিরহশয্যাতে একটি ভদ্রানক গম্ভীর ব্যাকুলতার সঙ্গে বিসর্জনের বাস্তব বাস্তব লাগিল।

বিনোদিনীর মহেন্দ্র যেন আশার পক্ষে পরপুরুষ, যেন পরপুরুষেরও অধিক, এমন লজ্জার বিষয় যেন অতি-বড়ো অপরিচিতও নহে। সে কোনোরূপেই ঘরে প্রবেশ করিতে পারিল না।

এক সময় কড়িকাঠ হইতে মহেশ্বরের অস্ত্রমনস্ক দৃষ্টি সমুদ্রের সোমসো
 দিকে নামিয়া আসিল। তাহার দৃষ্টি অহসরণ করিষ্ঠা আশা দেখিল, সমুদ্রের
 সেখানে মহেশ্বরের ছবির পার্বেই আশার একখানি ফোটাগ্রাফ কুসমানো
 বহিয়াছে। ইচ্ছা হইল, সেখানি আঁচল লিয়া খাণিখা দেখে, টানিয়া
 ছিঁড়িয়া লইয়া আসে। অভ্যাসবশত কেন যে সেটা চোখে পড়ে নাই,
 কেন সে যে এতদিন সেটা নামাইয়া কেনিয়া দেহ নাই, তাহাই মনে করিয়া
 সে আপনাকে দিক্কার দিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, যেন মহেশ্ব
 মনে মনে হাসিতেছে এবং তাহার হৃদয়ের আশ্রমে যে দিনোন্নিয় দৃষ্টি
 প্রতিপন্ন সেও যেন তাহার ভোড়া কৃষ্ণর ভিতর হইতে এই ফোটা-
 গ্রাফটান প্রতি সহস্র কটাক্ষপাত করিতেছে।

অবশেষে বিরক্তিপীড়িত মহেশ্বরের দৃষ্টি ছেদাল হইতে নামিয়া আসিল।
 আশা আপনাত মূৰ্খতা খুড়াইবার জন্য আত্মকাল মজার সময় কাসকর্ম ও
 শাওড়ির সেবা হইতে অবকাশ পাইলেই অনেক রাতি পর্যন্ত নির্ভয়ে
 অধ্যয়ন করিত। তাহার সেই অধ্যয়নের খাতাপত্রইগুলি ঘরের এক ধারে
 গোছানো ছিল। দর্শ্য মহেশ্বর অনস্র ভাবে তাহার একখানি খাতা টানিয়া
 লইয়া পুনিয়া দেখিতে লাগিল। আশার ইচ্ছা করিল, চীৎকার বধিয়া
 ছুটিয়া সেখানি কাড়িয়া লইয়া আসে। তাহার কাঁচা হাতের অঙ্গবগুলির
 প্রতি মহেশ্বরের হৃদয়হীন বিক্রমদৃষ্টি কখনা করিয়া সে আর এক হুর্ভাগ
 পাকাইতে পারিল না। ক্রমশঃ নীচে চলিয়া গেল—পদশব্দ গোপন
 করিবার চেষ্টাও রহিল না।

মহেশ্বরের আহার সমস্তই প্রস্তুত হইয়াছিল। বাতাসখানি মনে করিতে-
 ছিলেন, মহেশ্বর দইমাত্র সঙ্গে বহুস্তালাশে প্রবৃত্ত আছে, বৌবৎস দ্বাংস
 লইয়া গিয়া নাকপানে তৎ দিতে তাহার প্রবৃত্তি হইতেছিল না। আপাত
 নীচে আসিতে দেখিয়া তিনি ভোজনকালে আহার লইয়া মহেশ্বরের খবর
 নিলেন। মহেশ্বর খাইতে উঠিয়া দায় আশা ঘরের মধ্যে ছুটিয়া গিয়া দ্বিতের

ছবিখানা ছিঁড়িয়া লইয়া ছাদের প্রাচীর ডিঙাইয়া ফেলিয়া দিল, এবং তাহার খাতাপত্রগুলি ভাঙাভাঙি ভুলিয়া লইয়া গেল।

আহারান্তে মহেন্দ্র শয়নগৃহে আসিয়া বসিল। রাজলক্ষ্মী বধূকে কাছাকাছি কোথাও খুঁজিয়া পাইলেন না। অবশেষে একতলায় বন্ধনশালায় আসিয়া দেখিলেন, আশা তাঁহার দ্বন্দ্ব দুধ জাল দিতেছে। কোনো আবশ্যক ছিল না। কারণ, যে দাসী রাজলক্ষ্মীর বাজের দুধ প্রতিদিন জাল দিয়া থাকে সে নিকটেই ছিল এবং আশার এই অকারণ উৎসাহে আপত্তি প্রকাশ করিতেছিল; বিগত জলের দ্বারা পূরণ করিয়া দুধের যে অংশটুকু সে হরণ করিত সেটুকু আজ ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনায় সে মনে মনে ব্যাকুল হইতেছিল।

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “এ কী বউমা, এখানে কেন। যাও, উপরে যাও।”

আশা উপরে গিয়া তাহার শাতভির ঘর আশ্রয় করিল। রাজলক্ষ্মী বধূর ব্যবহারে বিরক্ত হইলেন। ভাবিলেন, ‘যদি বা মহেন্দ্র মায়াবিনীর মায়া কাটাইয়া ক্ষণকালের দ্বন্দ্ব বাড়ি আসিল, বউ বাগাবাগি মান-অভিনান করিয়া আবার তাহাকে বাড়িছাড়া করিবার চেষ্টায় আছে। বিনোদিনীর ফাঁদে মহেন্দ্র যে ধরা পড়িল, সে তো আশারই দোষ। পুরুষ-নাট্য তো দৃষ্টান্তই বিপথে বাইবার দ্বন্দ্ব প্রস্তুত, দ্বীর কর্তব্য তাহাকে চলে বলে কৌশলে সিঁচা পথে রাখা।’

রাজলক্ষ্মী তাঁর ভৎসনার স্বরে কহিলেন, “তোমার এ কী বকম ব্যবহার বউমা! তোমার ভাগ্যক্রমে স্বামী যদি ঘরে আসিলেন, তুমি মুখ ধাঁড়িগানা করিয়া অমন কোণে কোণে লুকাইয়া বেড়াইতেছ কেন।”

আশা নিজেই অপরাধিনী জান করিয়া অকুশলচিত্তে উপরে চলিয়া গেল এবং মনকে দ্বিধা করিবার অবকাশমাত্র না দিয়া এক নিম্নানে ঘরের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইল। দণ্ডটা বাড়িয়া গেছে। মহেন্দ্র ঠিক সেই সময় বিধানায় সম্মুখে দাঁড়াইয়া অনাবশ্যক দীর্ঘকাল ধরিয়া চিহ্নিতমুখে মশারি

কোথাকার সেই মাদ্রাবিনী ভাইনিটাকে লইয়া কত দিনই বা নাহয়
ছুলিয়া থাকিবে।’

মা তাড়াতাড়ি কহিলেন, “তা, বেশ ভো নহিন।”

বলিয়া তখনই চাবি বাহির করিয়া কত ঘর খুলিয়া কাড়াকাড়ার
ধুমধাম সাধাইয়া গিলেন।—‘বউ, ও বউ, বউ কোথায় গেল!’ অনেক
মডানে বাড়ির এক কোণ হইতে সংকুচিতা বহুকে বাহির করিয়া থানা
হইল।—‘একটা সাক জাভিন বাহির করিয়া মাও; এ ঘরে টেবিল নাই,
এখানে একটা টেবিল পাতিয়া দিতে হইবে; এ আলো তো এখানে
চলিবে না, উপর হইতে ল্যাম্পটা পাঠাইয়া দাও।’ এইরূপে উত্তরে
নিদিয়া এই বাড়িটির বাসাবিদ্যাহের সস্ত্র স্ত্রপূর্ণায় ঘরে বিদ্যুত বাত্যান
প্রস্তুত করিয়া দিলেন। মহেন্দ্র সেবাসাধিগণের প্রক্তি ক্রমশঃপন্য না
করিয়া গম্ভীরমুখে খাতাপত্র বহি লইয়া ঘরে বসিল এবং সময়েই লেখনার
অপব্যয় না করিয়া তৎক্ষণাৎ পড়িতে আরম্ভ করিল।

মধ্যাহ্নে ন্যায় আহ্বারের পর মহেন্দ্র পুনরায় পড়িতে বসিয়া গেল। সে
উপরে তাহার পঢ়নঘরে গইবে কি নীচে গইবে, তাহা কেহ বুঝিতে
পারিল না। রায়লক্ষী বহু ঘরে আশাকে আড়ঠে পুতুলটির মতো মাটাইয়া
কহিলেন, “খাও তো বউনা, নহিনকে গিজাসা করিয়া এসো, তাহাও
বিছানায় কি উপরে হইবে।”

এ প্রকারে আশার পা কিছুন্তই সড়িল না, সে নীরবে নবদুঃখ
শাড়াইয়া বহিল। কষ্টে রায়লক্ষী তাহাকে তীব্র তর্কনয়ন করিতে
লাগিলেন। আশা বহু কষ্টে ধীরে ধীরে ঘরের কাছ গেল, কিছুন্তই
আদ অগ্রসর হইতে পারিল না। রায়লক্ষী দূর হইতে বহু এই ব্যবহার
সেখিয়া বাত্যান্য প্রায়ে শাড়াইয়া ক্রুদ্ধ হইত করিতে লাগিলেন। আশা
মরিয়া হইয়া ঘরের মধ্যে ছুটিয়া পড়িল। মহেন্দ্র পড়ার পড়নক ভনিয়া
বই হইতে হাণা না খুলিয়া বহিল, “এখনও আমার জেরি আছে—আবার

কাল ভোরে উঠিয়া পড়িতে হইবে—আমি এইখানেই শুইব ।”

কী লজ্জা ! আশা কি মহেন্দ্রকে উপরেব ঘরে শুইতে যাইবার জন্ত নাথিতে আসিয়াছিল ।

ঘর হইতে সে বাহির হইতেই রাজলক্ষ্মী বিরক্তির ঘরে দ্বিজাশা করিলেন, “কী, হইল কী ।”

আশা কহিল, “তিনি এখন পড়িতেছেন, নীচেই শুইবেন ।”

বলিয়া সে নিজের অপমানিত শয়নগৃহে আসিয়া প্রবেশ করিল । কোথাও তাহার স্থখ নাই—সমস্ত পৃথিবী সর্বত্রই যেন মধ্যাহ্নের মর-ভূতলের মতো তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে ।

খানিক দ্বায়ে আশার শয়নগৃহেব রুদ্ধ দ্বারে ঘা পড়িল, “বউ, বউ, মরজা খোলো ।”

আশা তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া দিল । রাজলক্ষ্মী তাঁহার হাঁপানি লইয়া সিঁড়িতে উঠিয়া কটে নিখাস লইতেছিলেন । ঘরে প্রবেশ করিয়াই তিনি বিছানায় বসিয়া পড়িলেন ও বাৎশক্তি ফিরিয়া আসিতেই ভাঙা গলায় কহিলেন, “বউ, তোমার রকম কী । উপরে আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়াছ যে ! এখন কি এইরকম রাগারাগি করিবার সময় ! এত দুঃখেও তোমার ঘটে বুদ্ধি আসিল না । যাও, নীচে যাও ।”

আশা মুহু ঘরে কহিল, “তিনি একলা থাকিবেন বলিয়াছেন ।”

রাজলক্ষ্মী । একলা থাকিবে বলিলেই হইল ! রাগের মুখে সে কী কথা বলিয়াছে, তাই শুনিয়া অমনি বাকিয়া বসিতে হইবে ! এত অভিনামী হইলে চলে না । যাও, শীঘ্র যাও ।

দুঃখের দিনে বধূর কাছে শান্তির আর লজ্জা নাই । তাঁহার হাতে যে-কিছু উপায় আছে তাহাই নিয়া মহেন্দ্রকে কোনোনতে বাধিতেই হইবে ।

আবেগের সহিত কথা কহিতে কহিতে রাজলক্ষ্মীর পুনরায় অত্যন্ত

দাসকণ্ঠে হইল। কতকটা সংবরণ করিয়া তিনি উঠিলেন। আশাও বিবর্তিত
না করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া নীচে চলিল। বাচলক্ষীকে আশা তাঁহার
শরনঘরে বিছানায় বসাইয়া, ডাকিয়া-বাসিন্দ্ৰাণি পিঠের কাছে ঠিক
করিয়া নিতে লাগিল। বাচলক্ষী কহিলেন, “থাক, বউমা, থাক। তুমিও
ডাকিয়া মাও। তুমি যাও, আর দেখি করিয়ে না।”

আশা এবার আর বিছানায় কহিল না। পাণ্ডুর খবর হইতে দ্বিষ্ট
হইয়া একেবারে মহেশ্বরের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। মহেশ্বরের সন্মুখ
টেবিলের উপর থোলা বই পড়িয়া আছে—সে টেবিলের উপর দুই পা
তুলিয়া দ্বিষ্টা চৌকির উপর নাখা রাখিয়া একমনে কী ভাবিতেছিল।
পশ্চাতে পদমূল শুনিয়া একেবারে চমকিয়া উঠিয়া দ্বিষ্টা ডাকিল।
যেন কাহার ধ্যানে নিমগ্ন ছিল—হঠাৎ ভ্রম হইয়াছিল, সেই বৃত্তি
আসিয়াছে। আশাকে দেখিয়া মহেশ্বর সংবৃত হইয়া পা নামাইয়া থোলা
বইটা কোলে টানিয়া লইল।

মহেশ্বর আজ মনে মনে আশঙ্কিত হইল। আদ্যকাল হো আশা এমন
অসংকোচে তাহার সন্মুখ আসে না, সৈবৎ তাহাদের উভয়ের সাক্ষাৎ
হইলে সে তখনই চলিয়া যায়। আজ এত বারের এমন সংঘর্ষ সে যে
তাহার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল, এ বড়ো বিস্ময়কর। মহেশ্বর তাহার
বই হইতে মুখ না তুলিয়াই বসিল, “আশার আজ চলিয়া যাইবার লক্ষণ
নহে। আশা মহেশ্বরের সন্মুখের দ্বিষ্ট ভাবে আসিয়া পড়িয়াছিল। তখন মহেশ্বর
আর পড়িবায় ভাব করিতে পারিল না, মুখ তুলিয়া চাহিল। আশা
হৃৎকণ্ঠে বলে কহিল, “নার ঝগামি বাড়িয়াছে, তুমি একবার তাহাকে
দেখিলে ভালো হয়।”

মহেশ্বর। তিনি কোথায় আছেন?

আশা। তাঁহার কোথায় ঘরেই আছেন, ঘুমাইতে পারিতেছেন না।

মহেশ্বর। তখন চলো, তাহাকে দেখিয়া আসি গে।

অনেক দিনের পরে আশার সঙ্গে এইটুকু কথা কহিয়া মহেন্দ্র যেন অনেকটা হাল্কা বোধ করিল। নীরবতা যেন চূর্ণেচূর্ণ দুর্গপ্রাচীরের মতো খ্রীপুক্ষের মাঝখানে কালো ছায়া কেলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, মহেন্দ্রের তরফ হইতে তাহা ভাঙিবার কোনো অঙ্গ ছিল না, এমন সময় আশা স্বহস্তে কেয়ার একটি ছোটো দ্বার খুলিয়া দিল।

রাজলক্ষ্মীর দ্বারের বাহিরে আশা দাঁড়াইয়া রহিল, মহেন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিল। মহেন্দ্রকে অসময়ে ঘরে আসিতে দেখিয়া রাজলক্ষ্মী ভীত হইলেন; ডাবিলেন, বুঝি বা আশার সঙ্গে রাগারাগি করিয়া আবার সে বিদায় লইতে আসিয়াছে। কহিলেন, “মহিন, এখনও ঘুমাস নাই?”

মহেন্দ্র কহিল, “না, তোমার সেই ইপ্সানি কি বাড়িয়াছে।”

এত দিন পরে এই প্রশ্ন শুনিয়া মার মনে বড়ো অভিমান ঘন্নিল। বুঝিলেন, বউ গিয়া বলাতেই আজ মহিন মার খবর লইতে আসিয়াছে। এই অভিমানের আবেগে তাঁহার বক্ষ আরও আন্দোলিত হইয়া উঠিল— কষ্টে শব্দ উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, “বা, তুই শুতে যা। আমার ও কিছুই না।”

মহেন্দ্র। না মা, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা ভালো, এ যানো উপেক্ষা করিবার জিনিস নহে।

মহেন্দ্র জানিত, তাহার মাতার স্বপ্নিঙের দুর্বলতা আছে। এই কারণে এবং মাতার মুগ্ধতার লক্ষণ দেখিয়া সে উন্মত্ত অতৃপ্ত করিল।

না কহিলেন, “পরীক্ষা করিবার দরকার নাই, আমার এ যানো মারিবার নহে।”

মহেন্দ্র কহিল, “আজ্ঞা, আর বাতের মতো একটা ঘুমের গুপ্ত আনাইয়া দিতেছি, কাল ভালো করিয়া দেখা যাইবে।”

রাজলক্ষ্মী। তের গুপ্ত খাইয়াছি, গুপ্ত আমার কিছু হয় না। যাও মহিন, অনেক বাত হইয়াছে, তুমি ঘুমাও।

মহেন্দ্র । তুমি একটু দূর হইলেই আমি যাইব ।

তখন অভিমানিনী বাতলস্বী বারের অশ্রুবাণবর্ষিনী হৃৎক মনোম
করিয়া বলিলেন, “বউ, কেন তুমি এই বাত্রে মহেন্দ্রকে বিবর্ত করিয়া
ভক্ত এখানে আনিয়াছ ।”

বলিতে বলিতে তাঁহার দামকষ্ট আরও বাড়িয়া উঠিল ।

তখন আশা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দূর শব্দে দৃঢ় স্বরে মহেন্দ্রকে
কহিল, “হাও, তুমি শুইতে যাও, আমি দার কাছে থাকিব ।”

মহেন্দ্র মাথাকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া কহিল, “আমি একটা গল্প
আনায়েতে পাঠাইলান । শিশিতে দুই লাগ থাকিবে—এক লাগ বাগড়াইয়া
যদি ধূম না আসে, তবে এক ঘণ্টা পরে আর-এক লাগ বাগড়াইয়া যিহা ।
বাত্রে বাড়িলে আমাকে খবর দিতে তুমিহা না ।”

এই বলিয়া মহেন্দ্র নিজেই ঘরে ফিবিয়া গেল । আশা আর তাহার
কাছে যে দৃষ্টিতে দেখা দিল, এ ঘেন মহেন্দ্রের পক্ষে নূতন । এ আশার
মনো সংকোচ নাই, পীনতা নাই ; এই আশা নিজেই অধিকারের মনো
নিভে অধিকৃত, সেটুকুর ভুল মহেন্দ্রের নিকটে সে ডিকাগ্রাধিনী নহে ।
নিজেই স্বীকে মহেন্দ্র উপেক্ষা করিয়াছে, কিন্তু বাড়ির দপ্তর প্রতি তাহার
গদন ভঙ্গিল ।

আশা তাঁহার প্রতি বহুবৎস মহেন্দ্রকে ডাকিয়া আনিয়াছে, ইচ্ছায়
বাতলস্বী মনে মনে গুনি হইলেন । হৃৎক বলিলেন, “বউনা, তোমাকে
শুধে পাঠাইলান, তুমি আগার মহেন্দ্রকে টানিয়া আনিবে কেন ।”

আশা তাহার উত্তর না দিয়া পাশা হাতে তাঁহার পদাঘে ঘিয়া
বাতাস করিতে লাগিল ।

বাতলস্বী কহিলেন, “হাও বউনা, তবে যাও ।”

আশা দূর স্বরে কহিল, “আমাকে এইখানে বলিতে বলিয়া গেছেন ।”

আশা আনিব, মহেন্দ্র বাতাসে গেলে তাহাকে নিবেগ করিয়া গেল ।

এ খবরে রাজলক্ষী খুশি হইবেন ।

৪৪

রাজলক্ষী যখন স্পষ্টই দেখিলেন আশা মহেন্দ্রের মন বাঁধিতে পারিতেছে না, তখন তাঁহার মনে হইল, ‘অন্তত আমার ব্যাঘা উপলক্ষ্য করিয়া ও যদি মহেন্দ্রকে থাকিতে হয় সেও ভালো ।’ তাঁহার ভয় হইতে লাগিল, পাছে তাঁহার অস্থখ একেবারে সারিয়া যায় । আশাকে ভাঁড়াইয়া ওষুধ তিনি ফেলিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন ।

অশ্রুমনস্ক মহেন্দ্র বড়ো-একটা খেয়াল করিত না । কিন্তু আশা দেখিতে পাইত, রাজলক্ষীর রোগ কিছুই কমিতেছে না, বরঞ্চ যেন বাড়িতেছে । আশা ভাবিত, মহেন্দ্র যথেষ্ট যত্ন ও চিন্তা করিয়া ওষুধ নির্বাচন করিতেছে না—মহেন্দ্রের মন এতই উদ্ভ্রান্ত যে, মাতার পীড়া ও তাহাকে চেতাঁইয়া তুলিতে পারিতেছে না । মহেন্দ্রের এত বড়ো দুর্গতিতে আশা তাহাকে মনে মনে দিক্কার না দিয়া থাকিতে পারিল না । এক দিকে নষ্ট হইলে মানুষ কি সকল দিকেই এমনি করিয়া নষ্ট হয় ।

একদিন সন্ধ্যাকালে রোগের কষ্টের সময় রাজলক্ষীর বিহারীকে মনে পড়িয়া গেল । কত দিন বিহারী আসে নাই তাহার ঠিক নাই । আশাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বউনা, বিহারী এখন কোথায় আছে জান ?”

আশা বুদ্ধিতে পারিল, চিরকাল রোগতাপের সময় বিহারীই মার সেবা করিয়া আসিয়াছে । তাই কষ্টের সময় বিহারীকেই মাতার মনে পড়িতেছে । হায়, এই সংসারের অটল নির্ভর সেই চিরকালের বিহারী ও দূর হইল । বিহারী-ঠাকুরপো থাকিলে এই দুঃসময়ে মার যত্ন হইত—ইহার নতো তিনি স্বপ্নদ্রষ্ট্রী নহেন । আশার দ্রব্ধ হইতে দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল ।

রাজলক্ষী । বিহারীর সঙ্গে নহিন বুদ্ধি ঝগড়া করিয়াছে ? বউ

অত্যাধ কষ্টসাধ্য বটে। তাহার নতুন এমন দিতাকালী বহু নহিলে
আর কেহ নাই।

বলিতে বলিতে তাঁহার চুই চক্ষুর কোণে অশ্রুধারা চলে।

এক একে আশার অনেক কথা মনে পড়িল। অল্প মূল আশাকে
যথাসময়ে মতক্ করিবার ক্ষমতা বিহারী কত কালে কত চেষ্টা করিয়াছে
এবং সেই চেষ্টার ফল সে জনস্ব আশার অশ্রিত হইয়া উঠিয়াছে, সেই
কথা মনে করিয়া আশা আশা মনে মনে নিজেই তাঁর ভাবে অশ্রুধারা
করিতে লাগিল। একমাত্র হৃদয়কে লাভিত করিয়া একমাত্র পথে সে
বলে টানিয়া লয়, বিদ্যাতা সেই কৃত্রিম দুর্ভিক্ষে কেন না শান্তি বিধান।
ভয়ঙ্কর বিহারী যে নিবাস ফেলিয়া এ ঘর হইতে বিদায় হইয়া গেছে,
সে নিবাস কি এ ঘরকে লাগিবে না।

আশার অনেক কথা চিন্তিতমূলে দ্বিধা থাকিয়া আশ্রয়স্থী হইয়া গিয়া
উঠিলেন, "বউমা, বিহারী যদি থাকিত তবে এই দুদিনে সে আমাদের
বক্ষা করিতে পারিত—এতদূর পথ গড়াইতে পারিত না।"

আশা নিশ্চয় হইয়া ভাবিতে লাগিল। আশ্রয়স্থী নিবাস ফেলিয়া
বলিলেন, "সে যদি থবর পায়ে আমার কানো হইতামে, তবে সে না
আসিয়া থাকিতে পারিবে না।"

আশা বুঝিল, আশ্রয়স্থীর ইচ্ছা বিহারী এই থবরটা পায়। বিহারীর
অজ্ঞানে তিনি আশ্রয়স্থী একবারে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছেন।

ঘরের আসনে নিবাসিয়া বিদ্যা মহেন্দ্র মোহনজী আশ্রয়স্থীর কাছে হুপ
করিয়া পাঠাইয়া দিল। পড়িতে আর ভালো লাগে না। ঘরে কোনো
স্বপ্ন নাই। তাহার পুনরাবৃত্তি তাহারের স্ত্রী মহেন্দ্রজীর স্ত্রী বউ
হইয়া গেলে তাহারিগত পথের নতুন অন্যায় ফেলিয়া দেওয়া যাক
না, আশার শ্রমফলের নতুন অন্যায় তাহারিগত এতদূর করা যাক না—
তাহারের সেই অত্যাধ আশ্রয়স্থী মহেন্দ্র অশ্রু ভাবে নতুন এত

চাপিয়া থাকে। নাব সম্মুখে যাইতে মহেন্দ্ৰের ইচ্ছা হইল না—তিনি হঠাৎ মহেন্দ্ৰকে কাছে আসিতে দেখিলেই এমন একটা শঙ্কিত উদ্বেগের সহিত তাহার মুখের দিকে চান যে, মহেন্দ্ৰকে তাহা আঘাত করে। আশা কোনো উপলক্ষ্যে কাছে আসিলে তাহার সঙ্গে কথা কহাও কঠিন হয়, চুপ করিয়া থাকাও কষ্টকর হইয়া উঠে। এমন করিয়া দিন আর কাটিতে চাহে না। মহেন্দ্ৰ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, অসুত মাত দিন সে বিনোদিনীর সঙ্গে একেবারেই দেখা করিবে না। আরও দুই দিন বাকি আছে—কেমন করিয়া সে দুই দিন কাটিবে।

মহেন্দ্ৰ পশ্চাতে পদশব্দ শুনিল। নুঝিল, আশা ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। যেন শুনিতে পায় নাই, এই ভান করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আশা সে ভানটুকু বুঝিতে পারিল, তবু ঘর হইতে চলিয়া গেল না। পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কহিল, “একটা কথা আছে, সেইটে বলিয়াই আমি যাইতেছি।”

মহেন্দ্ৰ কিনিয়া কহিল, “যাইতে হইলে কেন, একটু বোসোই-না।”

আশা এই ভদ্রতাটুকুতে কান না দিয়া স্থির দাঁড়াইয়া কহিল, “বিহারী-ঠাকুরপোকে মার অল্পখের সবর মেওয়া উচিত।”

বিহারীর নাম শুনিয়াই মহেন্দ্ৰের গভীর হৃদয়দ্বেষে যা পড়িল। নিজেকে একটুখানি সামসাইয়া লইয়া কহিল, “কেন উচিত। আমার চিকিৎসায় বৃদ্ধি বিশ্বাস হয় না।”

মহেন্দ্ৰ মাতার চিকিৎসায় যথোচিত যত্ন করিতেছে না, এই ভৎসনায় আশার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া ছিল, তাই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল, “কই, মার ব্যামো হো কিছুই ভালো হয় নাই, দিনে দিনে আরও যেন বাড়িয়া উঠিতেছে।”

এই সাধারণ কথাটার ভিতরকার উদ্ভাপ মহেন্দ্ৰ বুঝিতে পারিল। এমন গুরু ভৎসনা আশা আর কখনোই মহেন্দ্ৰকে করে নাই। মহেন্দ্ৰ

নিজেৰ অহংকাৰে আবৃত হৈয়া বিবিত্ত বিহঙ্গমৰ সহিত কহিল, “তোমাৰ কাছে ভাৰুৱাৰি শিশিহে হৈবে বেগিহেহি !”

আশা এই বিহঙ্গমে তাহাৰ পুৰীকৃত বেগ্নাৰ উপরে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত আঘাত পাইল ; তাহাৰ উপরে ঘৰ অক্ষকাৰ ছিল, তাই সেই জিবকোষে নিৰুদ্ভৱ আশা আত অসংকোচে উদ্বীণ তেমেৰ সহিত বলিয়া উঠিল, “ভাৰুৱাৰি না শেগ, মাকে যত কৰা শিশিতে পায় ।”

আশাৰ কাছে এমন ঘণাব পাইয়া মহেশ্বৰেৰ বিহঙ্গমেৰ সীমা বহিল না । এই অনচাত্ত তীব্র বাফে মহেশ্ব নিঃশব্দ হইয়া উঠিল । কহিল, “তোমাৰে বিহাৱী-ঠাকুৰপোকে কেন এটো বাফিতে আদিত নিমেষ কৰিবাছি, তাহা তো তুমি জান—আশাৰ ভাৰুকে অদগ কৰিবাছ বুলি !”

আশা হাত পৰে ঘৰ হইতে চলিয়া গেল । লক্ষ্যৰ কণ্ঠ যেন তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া গেল । লক্ষ্য তাহাৰ নিজেৰ ভৃত্য নহে । অশ্বৰাম যে ব্যক্তি মগ্ন হৈয়া আছে, সে এমন অচাত্ত অশব্দৰ মূলে উজাগৰ কৰিতে পায় ! এত বড়ো নিৰ্ভীৰতাকে পৰ্বতপ্ৰমাণ লক্ষ্য সিদ্ধাও ঢাক দাও না ।

আশা চলিয়া গেলেই মহেশ্ব নিজেৰ সম্পূৰ্ণ পদাভ্যৰ অতঃপৰ কৰিতে পাৱিল । আশা যে কোনো কাণে কোনো অৰ্থহাৰেই মহেশ্বকে এমন দিক্‌কাৰ কৰিতে পায় তাহা মহেশ্ব কল্পনাও কৰিতে পায় না । মহেশ্ব দেখিল, খেপানে তাহাৰ সিংহাসন চিল সেখানে সে হুপাৰ লুটাইহেছে । এই সিন পৰে তাহাৰ আশঙ্কা হইল, পাছে আশাৰ বেগ্না গুণায় পৰিগত হয় ।

ও নিচে বিহঙ্গমীৰ কথা মনে আসিতেই বিনোদিনী মগ্নে চিহ্ন তাহাকে অধীৰ কৰিয়া বুলিল । বিহাৱী পশ্চিম হইতে ডিবিহাৰে কি না কে জানে । ইতিমধ্যে বিনোদিনী তাহাৰ বিকানা আনিহেও পায়, বিনোদিনীৰ মূৰে বিহাৱীৰ লেখা হওতাও অদৃষ্ট নহে । মহেশ্বৰ আৰ পৰিজ্ঞা বকা হও না ।

ব্রাহ্মে রাজলক্ষ্মীর বক্ষের কষ্ট বাড়িল, তিনি আর থাকিতে না পারিয়া নিজেই মহেন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কষ্টে বাক্য উচ্চারণ করিয়া কহিলেন, “মহিন, বিহারীকে আমার বড়ো দেবিতে ইচ্ছা হয়, অনেক দিন সে আসে নাই।”

আশা শান্তিকে বাতাস করিতেছিল। সে মুখ নিচু করিয়া রহিল। মহেন্দ্র কহিল, “সে এখানে নাই, পশ্চিমে কোথায় চলিয়া গেছে।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “আমার মন বলিতেছে, সে এখানেই আছে, কেবল তোর উপর অভিমান করিয়া আসিতেছে না। আমার মাথা খা, কাল একবার তুই তাহার বাড়িতে যাস।”

মহেন্দ্র কহিল, “আচ্ছা যাব।”

আজ সকলেই বিহারীকে ডাকিতেছে। মহেন্দ্র নিজেকে বিশ্বের পরিত্যক্ত বলিয়া বোধ করিল।

৪৫

পরদিন প্রত্যুষেই মহেন্দ্র বিহারীর বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল। বেগিল, ঘরের কাছে অনেকগুলো গোরুর গাড়িতে ভৃত্যগণ আসবাব বোঝাই করিতেছে। ভজুকে মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, “ব্যাপারখানা কী।” ভজু কহিল, “বাবু বালিতে গঙ্গার ধারে একটি বাগান লইয়াছেন, সেইখানে বিনিসপত্র চলিয়াছে।” মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, “বাবু বাড়িতে আছেন না কি।” ভজু কহিল, “তিনি দুই দিন মাত্র কলিকাতায় থাকিয়া কাল বাগানে চলিয়া গেছেন।”

তিনি মহেন্দ্রের মন আশ্রয় পূর্ণ হইয়া গেল। সে অতৃপ্ত ছিল, ইতিমধ্যে বিনোদিনী ও বিহারীতে যে দেখা হইয়াছে, ইহাতে তাহার মনে কোনো সংশয় রহিল না। সে কল্পনাশূন্য বেগিল, বিনোদিনীর দাসার সম্বন্ধেও এতকাল গোরুর গাড়ি বোঝাই হইতেছে। তাহার দৃষ্টি বোম

হইল, 'এইচকুট' নির্দোষ আনাকে বিনোদিনী বাবা হইতে বৃদ্ধ
বাখিয়াছিল।'

দুর্ভাগ্যবান দিনে না করিয়া মহেন্দ্র তাহার গাড়িতে চড়িয়া কোচ-
মানকে হাঁকাটোতে কহিল। ঘোড়া খণ্ডে কৃত চলিতেছে না বসিতা বংশ
নাগে মাঝে কোচমানকে গানি দিল। গগির মধ্যে সেই বাগায় বাগের
সদৃশে পৌড়িয়া বেলিল, সেখানে বাগায় কোনো আয়োজন নাই। কব
হইল, পাছে সে কার্য পূর্বেই সমাধা চইয়া থাকে। যোগে বাবে আহার
করিল। ভিতর চইতে বৃদ্ধ চাকর বহরা খুসিয়া বিবাহ মাত্র মহেন্দ্র বিজ্ঞপ্তি
করিল, "সব পবন ভালো হো?"

সে কহিল, "আজ্ঞা হাঁ, ভালো বৈদিক।"

মহেন্দ্র উপরে গিয়া দেখিল, বিনোদিনী আনে গিয়াছে। তাহার নির্জন
শয়নমণ্ডে প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্র বিনোদিনীর গহবরে-পাবন্য শব্দ্যার উপর
লুটাইয়া পড়িল—সেই কোমল আত্মরসকে দুই প্রসারিত হস্তে বন্ধের কাছে
আবরণ করিল এবং তাহাকে জাগ করিয়া তাহার উপরে মুখ রাখিয়া
বসিতে লাগিল, 'নিদ্রা! নিদ্রা!'

এইরূপে স্বপ্নমোক্ষাস উদ্ভূত করিয়া শব্দ্য হইতে উঠিয়া মহেন্দ্র অদীত
ভাবে বিনোদিনীর প্রতীকায় কহিতে লাগিল। যবেক মধ্যে পাচতাবি কহিতে
কহিতে দেখিল, একখানা পাখা পবনের কাগজ নীচের বিছানায় পোতা
পড়িয়া আছে। সমর কাটাঁইবার চক্রে কহকটা পক্ষমন্ডল হ'বে সেখানে।
খুসিয়া কইয়া, সেখানে জোখ পড়িল, মহেন্দ্র সেখানেই বিহারীর নাম
দেখিতে পাইল। এক দুর্ভাগ্য তাহার সমস্ত মন বহুবেদে কাগজের সেই
তাম্রাটোতে স্থগিতা পড়িল। একজন মহাপ্রবক নিশিহেতে, অত্র বেগমের
কহিছ সেবানিগন কহ হইয়া পড়িলে তাহাঙ্গের বিনোদিনী চিকিৎসা ও
সেবার অত্র বিহারী ব্যক্তিগত গভীর ধারে একটি বাগান গঠিত—
সেখানে এককালে পাচজনকে আশ্রয় দিবার ব্যস্তাবস্থা হইয়াছে, ইত্যাদি।

বিনোদিনী এই খবরটা পড়িয়াছে, পড়িয়া তাহার কিরূপ ভাব হইল? নিশ্চয় তাহার মনটা সেই দিকে পালাই-পালাই করিতেছে। শুধু সেজ্ঞা নহে, মহেন্দ্ৰের মন এই কারণে আবণ্ড ছটফট করিতে লাগিল যে, বিহারীর এই সংকল্পে তাহার প্রতি বিনোদিনীর ভক্তি অলপ বাড়িয়া উঠিবে। বিহারীকে মহেন্দ্ৰ মনে মনে ‘হাদ্যাগ’ বলিল, বিহারীর এই কাছটাকে ‘ছদ্মগ’ বলিয়া অভিহিত করিল, কহিল, ‘লোকের হিতকারী হইয়া উঠিবার ছদ্মগ বিহারীর ছেনেবেলা হইতেই আছে।’ মহেন্দ্ৰ নিজেকে বিহারীর তুলনায় একান্ত অকপট অকৃত্রিম বলিয়া বাহবা দিবার চেষ্টা করিল; কহিল, ‘ঐদার্য ও আত্মত্যাগেব হৃদয়ে মৃতলোক তুলাইবার চেষ্টাকে আমি ঘৃণা করি।’ কিন্তু হার, এই পরমনিশ্চেষ্ট অকৃত্রিমতার নাহাদ্যা লোকে অর্থাৎ বিশেষ কোনো একটি লোক হয়তো বৃকিবে না। মহেন্দ্ৰের মনে হইতে লাগিল, বিহারী যেন তাহার উপরে এও একটা চাল চালিয়াছে।

বিনোদিনীর পদশব্দ শুনিয়া মহেন্দ্ৰ তাতাতাড়ি কাগজখানা মুড়িয়া তাহার উপরে চাপিয়া বসিল। স্নাত বিনোদিনী ঘরে প্রবেশ করিলে মহেন্দ্ৰ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বিম্বিত হইয়া উঠিল। তাহার কী-এক অপক্লপ পরিবর্তন হইয়াছে। সে যেন এই কয় দিন আগুন জালিয়া তপস্তা করিতেছিল। তাহার শরীর ক্লশ হইয়া গেছে, এবং সেই ক্লশতা ভেদ করিয়া তাহার পাণ্ডুর মুখে একটি দীপ্তি বাহির হইতেছে।

বিনোদিনী বিহারীর পদের আশা ত্যাগ করিয়াছে। নিজের প্রতি বিহারীর নিরতিশয় অবজ্ঞা কল্পনা করিয়া সে অহোরাত্রি নিঃশব্দে দগ্ন হইতেছিল। এই দাহ হইতে নিরুত্তি পাইবার কোনো পথ তাহার কাছে ছিল না। বিহারী যেন তাহাকেই তিরস্কার করিয়া পশ্চিমে চলিয়া গেছে—তাহার নাগাল পাইবার কোনো উপায় বিনোদিনীর হাতে নাই। কর্দমমাগে নিদ্রাসা বিনোদিনী কর্ণের অভাবে এই সূত্র বাদ্য নথ্যে

যেন তদনুযায়ী হইয়া উঠিতেছিল—তাহার মনস্ত উন্নত তাহার নিজকে
 কতবিস্তৃত করিয়া আঘাত করিতেছিল। তাহার মনস্ত ভাবী জীবনের
 এত প্রেমহীন কর্মহীন আনন্দহীন বাসার মধ্যে, এই কক্ষ গদির মত
 চিরকালের জন্য আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া তাহার বিশ্রামী প্রকৃতি আত্ম-
 তীত অন্তঃকরণ বিকছে যেন আকাশে মাথা ঝুঁকিবার স্বার্থ চেয়ে বসিতে
 ছিল। যে দূত মহোদয় বিনোদিনীর মনস্ত মুক্তির পথ চাখি নিব হইতে
 রক্ত করিয়া তাহার জীবনকে এমন সংকীর্ণ করিয়া ফুঁটিয়াছে, তাহার
 প্রতি বিনোদিনীর ঘৃণা ও বিদ্বেষের সীমা রহিল না। বিনোদিনী মুক্তিতে
 পান্ধিয়াছিল, সেট মহোদয়কে সে কিছুতেই আর ঘুরে ঘেঁষিয়া রাখিতে
 পারিবে না। এই কুহ বাসার মহোদয় তাহার কাছে ঘেঁষিয়া সন্মুখ
 আসিয়া বসিল—প্রতিদিন অসম্ভব আকর্ষণে তিসে তিসে তাহার দিকে
 অধিকতর আগ্রহের হইতে থাকিবে—এই অস্বপ্নে, এই সমাজদ্রষ্ট্র জীবনের
 পঙ্কজবাস্তব ঘৃণা এবং অসন্তুষ্টির মধ্যে যে প্রাত্যহিক লড়াই হইতে থাকিবে,
 তাহা অত্যন্ত বীভৎস। বিনোদিনী বহুতে বসেচোয় মাটি ফুঁটিয়া মহোদয়ের
 মনস্তের অস্বপ্নময় হইতে এই-বে একটা মোহমগ্নতা মোলুপতার প্রেক্ষাপট
 সন্নিবেশকে বাহির করিয়াছে, ইহার পুরুপাশ হইতে সে নিজেকে কেন্দ্র
 করিয়া বক্ষা করিবে। একে বিনোদিনীর স্বাধীন জগৎ, তাহাতে এই কুহ
 আবদ্ধ গালা, তাহাতে মহোদয়ের বাসনা-তরঙ্গের অসংরুদ্ধ অভিযাত—ইহা
 করিয়াও বিনোদিনীর মনস্ত চিত্ত আতঙ্কে পীড়িত হইয়া উঠে।
 জীবন ইহার বদান্তি কোথায়। কবে সে এই-সমস্ত হইতে বাহির হইতে
 পারিবে।

বিনোদিনীর সেট কক্ষ পাণ্ডুর মূগ দেখিয়া মহোদয়ের মন উৎসাহ
 ফলিয়া উঠিল। তাহার দি এমন কোনো শক্তি নাই, বাহা-বাহা সে
 বিহারীও চিন্তা হইতে এই ভগবতীকে কলসুপক উপাধি দি
 পারে। উৎসাহ সেমন নেপথ্যবর্গকে এক নিম্নে হেঁচা দিয়া তাহার

হৃদয় অপ্রভেদী পর্বতনীডে উদ্ভীর্ণ করে, তেমনি এমন কি কোনো মেঘপরিবৃত নিখিলবিশ্বত স্থান নাই যেখানে একাকী মহেন্দ্র তাহার এই কোমল হৃদয় শিকারটিকে আপনার বুকের কাছে লুকাইয়া রাখিতে পারে। ঈর্ষার উত্তাপে তাহার ইচ্ছার আগ্রহ চতুর্দণ্ড বাড়িয়া উঠিল। আর কি সে এক মুহূর্তও বিনোদিনীকে চোখের অভ্যন্তর করিতে পারিবে। বিহারীর বিজীষিকাকে অহরহ ঠেকাইয়া রাখিতে হইবে, তাহাকে সূচ্যগ্র-মায় অবকাশ দিতে আর তো মহেন্দ্রের সাহস হইবে না।

বিবহৃতাপে বনগীর সৌন্দর্যকে হৃদুমার করিয়া তোলে, মহেন্দ্র এ কথা সংকৃত কাব্যে পড়িয়াছিল, আজ বিনোদিনীকে দেখিয়া সে তাহা যতই অদ্ভুত করিতে লাগিল ততই সুখমিশ্রিত দুঃখের হৃতীত্র আলোড়নে তাহার হৃদয় একান্ত মগ্নিত হইয়া উঠিল।

বিনোদিনী ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া মহেন্দ্রকে দ্বিচ্ছাসা করিল, “তুমি কি চা খাইয়া আসিয়াছ।”

মহেন্দ্র কহিল, “নাহয় খাইয়া আসিয়াছি, তাই বলিয়া বহুদে আর-এক পেয়ালা দিতে কৃপণতা করিছো না—‘পালা মুখ ভর দে রে’।”

বিনোদিনী বোধ হয় ইচ্ছা করিয়া নিতান্ত নিষ্ঠুর ভাবে মহেন্দ্রের এই উচ্ছ্বাসে হঠাৎ আঘাত দিল; কহিল, “বিহারী-ঠাকুরপো এখন কোথায় আছেন খবর জান?”

মহেন্দ্র নিমেষের মধ্যে বিবর্ণ হইয়া কহিল, “সে তো এখন বলিকাতায় নাই।”

বিনোদিনী। তাহার ঠিকানা কী।

মহেন্দ্র। সে তো কাহাকেও বলিতে চাহে না।

বিনোদিনী। সন্ধান করিয়া কি বর মগ্না যায় না।

মহেন্দ্র। আনায় তো তেমন প্রকৃতি দরকার কিছু দেখি না।

বিনোদিনী। দরকারই কি সব। আশেপাশে বসুন্ধ কি কিছুই নয়।

নরেন্দ্র । বিহারী আমার আশঙ্কবদ্ধ বলে, কিন্তু তোমার মত
তাহার বন্ধু হু দিনের—তবু আগিলে তোমারই যেন জরায়ু খেঁচ
সোধ হইতেছে ।

বিনোদিনী । তাহাই দেখিয়া তোমার মাজ পাওয়া উচিত । বন্ধু
কেমন করিয়া করিতে হয় তাহা তোমার অনন্য বন্ধু কাছে হইলে
শিখিতে পারিলে না ?

নরেন্দ্র । সেমত তত হৃদিত নহি, কিন্তু থাকি দিয়া স্ত্রীলোকের মন
হরণ কেমন করিয়া করিতে হয় সে বিদ্যা তাহার কাছে শিখিলে আর
কাহ্নে লাগিতে পারিত ।

বিনোদিনী । সে বিদ্যা কেমন ইচ্ছা থাকিলেই শেখা যায় না, কদম
ধাকা চাই ।

নরেন্দ্র । ওলন্দেজের ঠিকানা যদি তোমার মনি থাকে তেও করিয়া
লাও, এ ব্যসে তাহার কাছে একবার মন মইয়া আসি, তাহার পরে
কদমতার পরীক্ষা হইবে ।

বিনোদিনী । বন্ধুর ঠিকানা যদি বাহির করিতে না পার, তবে
প্রেমের কথা আমার কাছে উত্থাপন করিয়া না । বিহারী-চাকরপেদে মন
দুনি যেহেতু স্যবহার করিয়াছ, তোমাকে কে বিবাহ করিতে পারে ।

নরেন্দ্র । আমাকে যদি সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিতে, তবে আমাকে এর
অপমান করিতে পারিবে না । আমার ভাগ্যোবাশে সবদে যদি এত
নিঃসন্দেহ না হইতে, তবে যেহেতু আমার এর অঙ্গ হুইত না ।
বিহারী সোধ না মানিবার বিদ্যা অনেক, সে বিদ্যাটা যদি সে এই
হাস্যাত্মক নিদ্রাই হু তবে বন্ধুত্বের কাম করিত ।

“বিহারী যে মাতুল, তাই সে পোক মানিতে পারে না” এই বলিয়া
বিনোদিনী খোলা কুল দিষ্টে কেনিয়া যেমন জাননার কাছে পাঠাইয়া দিত
হেমনি পাঠাইয়া বহিত । নরেন্দ্র হঠাৎ পাঠাইয়া উঠিল দুই বৎ করিয়া

দোষগর্জিত স্বরে কহিল, “কেন তুমি আমাকে বার বার অপমান করিতে সাহস কর। এত অপমানের যে কোনো প্রতিদল পাও না, সে কি তোমার ক্ষমতায় না আমার গুণে। আমাকে যদি পশু বলিয়াই স্থির করিয়া থাক, তবে হিংস্র পশু বলিয়াই জানিও। আমি একেবারে আঘাত করিতে জানি না, এত বড়ো কাপুরুষ নই।”

বলিয়া বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিয়া কণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল— তাহার পর বলিয়া উঠিল, “বিনোদ, এখান হইতে কোথাও চলো। আমরা বাহির হইয়া পড়ি। পশ্চিমে হউক, পাহাড়ে হউক, যেখানে তোমার ইচ্ছা, চলো। এখানে বাঁচিবার স্থান নাই। আমি মরিয়া যাইতেছি।”

বিনোদিনী কহিল, “চলো, এখনই চলো—পশ্চিমে যাই।”

মহেন্দ্র। পশ্চিমে কোথায় যাইবে।

বিনোদিনী। কোথাও নহে। এক জায়গায় দু-দিন থাকিব না— ঘুরিয়া বেড়াইব।

মহেন্দ্র কহিল, “সেই ভালো, আজ রাতেই চলো।”

বিনোদিনী সম্মত হইয়া মহেন্দ্রের জ্ঞাত বন্ধনের উন্মোচন করিতে গেল।

মহেন্দ্র বুকিতে পারিল, বিহারীর খবর বিনোদিনীর চোখে পড়ে নাই। খবরের কাগজে মন দিবার নতো অবধানশক্তি বিনোদিনীর এগন আর নাই। পাছে সৈবাং সে খবর বিনোদিনী জানিতে পারে, সেই উদ্বেগে মহেন্দ্র সমস্ত দিন সতর্ক হইয়া রহিল।

বিহারীর খবর লইয়া মহেন্দ্র কিরিয়া আসিলে, এই স্থির করিয়া বাড়িতে তাহার চণ্ড আহার প্রস্তুত হইয়াছিল। অনেক বেদি বেদিয়া পীড়িত

দ্বাদশশতাব্দী উদ্ভূত হইতে লাগিলেন। সাধারণত যুগ না হওয়াতে তিনি
 অত্যন্ত ক্রাণ্ড ছিলেন, তাহার উপরে মহেশ্বরের অল্প উৎসর্গের প্রাধান্য
 দ্রষ্টে করিতেছে দেখিয়া আশা খবদ গইয়া জািল, মহেশ্বরের বাড়ি
 ফিরিয়া আসিয়াছে। কোচম্যানের কাছে সংবাদ পাওয়া গেল, মহেশ্ব
 বিহারীর বাড়ি হইয়া পটলচাঁটার বাসায় গিয়াছে। তিনিসা দ্বাদশশতাব্দী
 কোমলের দিকে পাণ্ডা ফিরিয়া গুরু হইয়া গইলেন। আশা তাঁহার নিয়মের
 কাছে চিত্তাৰ্পিতের মতো জ্বিয় হইয়া বসিয়া বাতাল করিতে লাগিল।
 অল্প দিন বখাসমনয়ে আশাকে ধাইতে ধাইবার জন্ত দ্বাদশশতাব্দী আস্ত
 করিতেন—আন আর কিছুই বলিলেন না। কাগ দ্বায়ে প্রাণের কঠিন
 পীড়া দেখিয়াও মহেশ্ব স্বপ্ন বিনোদিনীর মোহে হুটিয়া গেল, তখন
 দ্বাদশশতাব্দীর পক্ষে এ সংসারে প্রভু করিবার, ডেঠা করিবার, ইচ্ছা করিবার
 আর কিছুই রহিল না। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, মহেশ্ব তাঁহার
 পীড়াকে সামান্য জ্ঞান করিয়াছে। অত্যাচাৰ্য্য বার যেমন মাকে মাকে যোগ
 দেখা দিয়া গারিয়া গেল, এবারও সেইরূপ একটা বড়িক উপলক্ষ
 খুঁটিয়াছে মনে করিয়া মহেশ্ব নিশ্চিন্ত আছে : কিছ এই আশঙ্কনু
 অহঙ্করণই দ্বাদশশতাব্দীর কাছে বড়ো কঠিন বলিয়া মনে হইল। মহেশ্ব
 প্রেমোদ্বস্ততার কোনো আশঙ্কাকে কোনো কর্তব্যকে মনে স্থান দিতে
 চায় না, তাই সে মাহার কষ্টকে পীড়াকে এতটো লুপ্ত করিয়া লোকাচারে—
 পাচ জননীৰ যোগেশ্বরের ডাচায়ে আশঙ্ক হইয়া গঠিতে হই, তাই সে
 এমন নির্লজ্জ মতো একটু অবকাশ পাইতেই বিনোদিনীর কাছে
 পলায়ন করিয়াছে। যোগ-আযোগের প্রতি দ্বাদশশতাব্দীর আর লেশমাত্র
 উৎসাহ রহিল না—মহেশ্বরের অহঙ্করণ যে সম্ভব, তাহা অসম্ভব
 ইচ্ছাই তিনি প্রমাণ করিতে চাহিলেন।

বেশা হঠাৎ মনে আসা করিল, “আ, তোমার পুত্র ধাইবার সময়
 হইয়াছে।” দ্বাদশশতাব্দী উদ্ভব না দিয়া দুপ করিয়া বহিলেন। আশা পুত্র

আনিবার জন্য উঠিলে তিনি বলিলেন, “ওষু দিতে হইবে না বউমা, তুমি যাও।”

আশা মাতার অভিমান বুঝিতে পারিল—সেই অভিমান সংক্রামক হইয়া তাহার হৃদয়ের আন্দোলনে দ্বিগুণ দোলা দিতেই আশা আর থাকিতে পারিল না, কান্না চাপিতে চাপিতে গুমরিয়া বাদিয়া উঠিল। রাজলক্ষ্মী দীর্ঘে দীর্ঘে আশার দিকে পাশ ফিরিয়া তাহার হাতের উপরে সঙ্কল্প স্নেহে আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে লাগিলেন ; কহিলেন, “বউমা, তোমার বয়স অল্প, এখনও তোমার সুখের মুখ দেখিবার সময় আছে। আমার জন্য তুমি আর বৃথা চেষ্টা করিয়ো না বাছা—আমি তো অনেক দিন বাঁচিয়াছি—মার কী হইবে।”

অনিদ্রা আশার রোদন আরও উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিল, সে মুখের উপর আঁচল চাপিয়া ধরিল।

এইরূপে রোগীর গৃহে নিরানন্দ দিন যন্দ গতিতে কাটিয়া গেল। অভিমানের মধ্যেও এই দুই নারীর ভিতরে ভিতরে আশা ছিল, এমনই বহেন্দ্র আসিবে। শব্দনাক্ষেপে উভয়ের দেহে যে-একটি চমক-মকর হইতেছিল, তাহা উভয়েই বুঝিতে পারিতেছিলেন। ক্রমে দিব্যবসনের আলোক অম্পষ্ট হইয়া আসিল ; কলিকাতার অসুঃপুত্রের মধ্যে সেই গোহুলির যে আভা তাহাতে আলোকে প্রফুল্লতাও নাই, অন্ধকারের আঘরণও নাই—তাহা বিষমকে গুরুভার এবং নৈরাশকে অশ্রুহীন করিয়া তোলে, তাহা কর্ম ও আশ্বাসের বল হরণ করে অর্থ বিক্রম ও বৈরাগ্যের শান্তি আনয়ন করে না। কল্পগৃহের সেই শুষ্ক ক্রীতীন সন্ধ্যায় আশা নিঃশব্দপদে উঠিয়া একটি প্রদীপ জালিয়া ঘরে আনিয়া দিল। রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “বউমা, আলো ভালো লাগিতেছে না, প্রদীপ বাহিরে রাখিয়া দাও।”

আশা প্রদীপ বাহিরে রাখিয়া আসিয়া বসিল। অন্ধকার যখন ঘনতর

হইয়া এই কুহ কলের মধ্যে বাহিরের অনন্ত বাহিরে আনিয়া দিল তখন
আশা রাজসম্মীকে দূর করে দিচ্চাশা করিল, "মা, তাঁহাকে কি এতদূর
খবর দিল ।"

রাজসম্মী দূর করে কহিলেন, "না বউবা, তোমার প্রতি আমার শপথ
বহিল, মহেশ্বকে খবর দিবে না ।"

তিনি আশা পূর হইয়া বহিল ; তাহার আর কামিয়ার দম ছিল না ।
বাহিরে পাঠাইয়া বেহায়া কহিল, "বাবুর কাছ হইতে চিঠি
আসিয়াছে ।"

তিনি মুহূর্তের মধ্যে রাজসম্মীর মনে হইল, মহেশ্বের হঠাৎ দাঁত
একটা-কিছু ব্যাধি হইয়াছে, তাই সে কোনোমতেই আসিয়া না পারিয়া
চিঠি পাঠাইয়াছে ! অতঃপর ও দায় হইয়া কহিলেন, "সেদো হো পটনা
মহিন কী লিখিয়াছে ।"

আশা বাহিরের প্রাণীপের আলোকে কলিঙ্গহস্তে মহেশ্বের চিঠি
পড়িল । মহেশ্ব লিখিয়াছে, কিছুদিন হইতে সে ভালো দেখা করিতেছিল
না, তাই সে পশ্চিমে বেড়াইতে বাইতেছে । মাতার অতঃপর চর
চিন্তার কারণ কিছুই নাই । তাঁহাকে নিশ্চিত বোধিবার অতঃপর সে কখনো
ভাকারকে বলিয়া দিয়াছে । দামে খুশ না হইলে বা মাথা বহিলে কখন কী
করিতে হইবে, তাহাও চিঠির মধ্যে লেখা আছে, এবং কী টিন লম্বা ও
পুড়িকর পণ্য মহেশ্ব ভাকারখানা হইতে আনাটো চিঠির সঙ্গে পাঠাইয়াছে ।
আশাতত গিটিনির ডিকানাৎ মাতার সংখ্যক অবশ্য-অবশ্য আনাটো
চিঠির পুনঃপত্র মধ্যে অবশ্যে আছে ।

এই চিঠি পড়িয়া আশা সন্তুষ্ট হইয়া গেল—পূর্ণা বিবাহের অতঃপর
হৃদয়ে অহিকম করিয়া বহিল । এই নিষ্ঠুর মাথা আকে কেন্দ্র করিয়া
ভরাইবে ।

আশাৎ বিলাস রাজসম্মী কলিঙ্গহস্তে টুপি হইয়া উঠিলেন । কহিলেন,

“বউমা, মহিন কী লিখিয়াছে শীঘ্র আমাকে জনাইয়া যাও।”

বলিতে বলিতে তিনি আগ্রহে বিছানায় উঠিয়া বসিলেন।

আশা তখন ঘরে আসিয়া ধীরে ধীরে সমস্ত চিঠি পড়িয়া জনাইল।
রাজলক্ষী জিজ্ঞাসা করিলেন, “শরীরের কথা মহিন কী লিখিয়াছে,
ওইখানটা আর-এক বার পড়ো তো।”

আশা পুনরায় পড়িল, “কিছুদিন হইতেই আমি ভেতন ভালো বোধ
করিতেছিলাম না, তাই আমি—”

রাজলক্ষী। থাক্ থাক্, আর পড়িতে হইবে না। ভালো বোধ হইবে
কী করিয়া। বুড়ো মা মরেও না, অথচ কেবল ব্যামো লইয়া তাহাকে
জালায়। কেন তুমি মহিনকে আমার অস্থখের কথা খবর দিতে গেলে।
বাড়িতে ছিল, ঘরের কোণে বসিয়া পড়াশুনা করিতেছিল, কাহারও
কোনো এলাকায় ছিল না—মাঝে হইতে মার ব্যামোর কথা পাড়িয়া
তাহাকে ঘরছাড়া করিয়া তোমার কী স্বখ হইল। আমি এখানে মরিয়া
থাকিলে তাহাতে কাহার কী ক্ষতি হইত। এত দুঃখেও তোমার ঘটে
এইটুকু বুদ্ধি আসিল না!

বলিয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িলেন।

বাহিরে মসুম শব্দ শুনা গেল। বেহারা কহিল, “ডাক্তারবাবু আছেন।”

ডাক্তার কাসিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আশা তাড়াতাড়ি
যোমটা টানিয়া পাটের অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিল,
“আপনার কী হইয়াছে বলুন তো।”

রাজলক্ষী ক্রোধের স্বরে কহিলেন, “হইবে আর কী। মানুষকে দি
মহিতে দিবে না। তোমার শুদ্ধ পাইলেই কি অমর হইয়া থাকিব।”

ডাক্তার সান্ত্বনার স্বরে কহিল, “অমর করিতে না পারি, কষ্ট দাহাতে
কবে সে চেষ্টা—”

রাজলক্ষী বলিয়া উঠিলেন, “কষ্টের ভালো চিকিৎসা ছিল এখন

বিনোদ্য পুত্রীয়া মরিত—এখন এ তো দেবম বাসিন্দা নহা। বাও ডাক্তার-
বাবু, তুমি যাও—আমাকে আর দিওরু করিয়ে না, আমি একটা বাসিন্দা
চাই।”

ডাক্তার ভয়ে ভয়ে কহিল, “আগনার নাড়িটা একবার—”

ব্রাহ্মস্বামী অত্যন্ত বিরক্তির বরে কহিলেন, “আমি কহিতেছি, তুমি
যাও। আমার নাড়ি বেশ আছে—এ নাড়ি শীঘ্র ছাড়িয়ে এমন ফল
নাই।”

ডাক্তার অগত্যা ঘরের বাহিরে গিয়া আমাকে ডাকিয়া পাঠাইল।
আমাকে নবীন-ডাক্তার ঘোণের সমস্ত বিবরণ বিজ্ঞাপ্য করিল। উভয়ে
সমস্ত অনিষ্ট গভীর ভাবে বয়েস মনো পুনরাব প্রবেশ করিল। কহিল,
“সেবন, মহেশ্বর আমার উপর বিশেষ করিয়া ভার মিমা গোড়ে। আমাকে
যদি আগনার চিকিৎসা করিতে না কেন, তবে সে মনে কষ্ট পাইবে।”

মহেশ্বর কষ্ট পাইবে, এ কথাটা ব্রাহ্মস্বামীর কাছে উপহাসের মতো
শুনাইল। তিনি কহিলেন, “নহিলেব যত বেশি ডাকিয়ে না। কষ্ট সংসারে
সকলকেই পাঠিতে চর। এ কষ্টে মহেশ্বরে অত্যন্ত বেশি ব্যথা করিয়ে
না। তুমি এখন যাও ডাক্তার। আমাকে একটু ঘুমাতে দাও।”

নবীন-ডাক্তার বুকিল, সোণীকে উত্থাপ করিলে ডাক্তার হটবে না।
দীরে দীরে বাহিরে আনিয়া বাসা কর্তব্য আমাকে উপস্থাপ মিমা গেল।

আশা করে চিকিৎসাই ব্রাহ্মস্বামী কহিলেন, “যাও বাবা, তুমি একটু
বিশ্রাম করো গে। সমস্ত দিন বোড়ার কাছে বসিয়া আছ। হাকব মনে
পাঠাইয়া দাও—পাশের ঘরে বসিয়া থাক।”

আশা ব্রাহ্মস্বামীকে বুদ্ধিত। ইচ্ছা উপহার দেবার অস্বাভাব্য নহে, ইচ্ছা
ব্রাহ্মস্বামী আমাকে—পালন করা ছাড়া আর উপায় নাই। হাকব মনে
পাঠাইয়া মিমা কহিলেন সে নিজেই ঘরে গিয়া শীঘ্রই ফুটিয়ায় পড়িয়া
পড়িল।

সমস্ত দিনের উপবাসে ও কষ্টে তাহার শবীব-মন শ্রান্ত ও অবসন্ন। পাড়ার বাড়িতে সেদিন থাকিয়া থাকিয়া বিবাহের বাস্তব বাঞ্ছিতেছিল। এই সময়ে সানাইয়ে আবার স্বব ধরিল। সেই রাগিণীর আঘাতে রাত্রির সমস্ত অঙ্গকার যেন স্পন্দিত হইয়া আশাকে বারংবার অভিঘাত করিতে লাগিল। তাহার বিবাহরাত্রির প্রত্যেক ক্ষুদ্র ঘটনাটিও সজীব হইয়া রাত্রির আকাশকে স্বপ্নচ্ছবিতে পূর্ণ করিয়া তুলিল; সেদিনকার আলোক, কোলাহল, জনতা; সেদিনকার মালাচন্দন, নববস্ত্র ও হোমধূনের গন্ধ; নবধূর শঙ্খিত লঙ্ঘিত আনন্দিত হৃদয়ের নিগূঢ় কম্পন—সমস্তই স্মৃতির আকারে যতই তাহাকে চারি দিকে আবিষ্ট করিয়া ধরিল, ততই তাহার হৃদয়ের ব্যথা প্রাণ পাইয়া বল করিতে লাগিল। দারুণ দুর্ভিক্ষে ক্ষুধিত বলক যেমন খাওয়ার ক্ষমতা নাতাকে আঘাত করিতে থাকে, তেমনি ভাগ্যত হৃদয়ের স্মৃতি আগনার খাণ্ড চাহিয়া আগার বক্ষে বারংবার সরোদনে করাঘাত করিতে লাগিল। অবসন্ন আশাকে আর পড়িয়া থাকিতে দিল না। দুই হাত জোড় করিয়া দেবতার কাছে প্রার্থনা করিতে গিয়া সংসারে তাহার একমাত্র প্রত্যক্ষ দেবতা মাসিমার পবিত্র স্মৃতি আশার অঙ্গ-বাস্পাচ্ছন্ন হৃদয়ের মধ্যে আবির্ভূত হইল। পুনরায় সংসারের দুঃখ-অশ্রুতে সেই আপসীকে আহ্বান করিয়া আনিবে না, এতদিন ইহাই তাহার প্রতিজ্ঞা ছিল। কিন্তু আজ সে আর কোথাও কোনো উপায় দেখিতে পাইল না—যাছ তাহার চতুর্দিকে ঘনায়িত নিবিড় দুঃখের মধ্যে আর বন্ধুত্ব ছিল না। তাই আজ সে ঘরের মধ্যে আলো জালিয়া কোলের উপর একখানা কাঁচা চিঠির কাগজ রাগিয়া ঘনঘন চোখের দল দৃষ্টিতে মুহিতে চিঠি লিগিতে লাগিল—

শ্রীচরণকমলে—

মাসিমা, তুমি ছাড়া আর আমার আর কেহ নাই; একবার আসিয়া তোমার কোলের মধ্যে এই দুঃখিনীকে টানিয়া লও—নহিলে

আমি কেনন করিয়া বাচিব। আর কী বিধি, জামি না। তোমার
চরণে আমার শতসংস্কারোক্তি প্রধান।

তোমার মোহে

হুনি

৪৭

অরপূর্ণা কান্দে হইতে ফিদিয়া আদিয়া অতি দীর্ঘ দীর্ঘ প্রাণসম্বীৰ বদ
প্রবেশ করিয়া প্রথামপূর্বক তাঁহার পায়ের ধূলা মাখায় ভুগিয়া লইলেন।
মান্থানেন বিদ্রোখদিলেক সবেও অরপূর্ণাকে বেশিয়া আরম্ভ্যৌ বেন
হারানো ঘন ফিদিয়া পাইলেন। জিহবে জিহবে তিনি যে নিম্নের আশা
অগোচরে অরপূর্ণাকে চাহিতেছিলেন, অরপূর্ণাকে পাইয়া তাহা বুঝিতে
পারিলেন। তাঁহার এতদিনের অনেক আশি অনেক মোহ যে কোমল
অরপূর্ণায় অভাবে, অনেক দিনের পর আজ তাহা তাঁহার কাছে হৃৎকণ্ঠে
মতো প্রস্ফটে হইল—দুঃখের মতো তাঁহার সমস্ত বাধিত কবর তাহার
চিরঘন স্থানটি অধিকার করিল। সংস্কারে ভয়ে পূর্ণা এই দুটি সা
বধন বদুভাবে এই পরিমারের সমস্ত প্রবন্ধকে বদন করিয়া লইয়াছিলেন
—পূর্ণায় উৎসব, শোকে দুঃখ, উৎসবে এই সংস্কারে একে ধরা
করিয়াছিলেন—অধনকার সেই চন্দির গন্ধি প্রাণসম্বীৰ ভদ্রকে আশ
দুঃখের মতো আশ্রয় করিয়া লিল। তাহার সঙ্গে প্রবন্ধ অসীমকালে এখানে
দীর্ঘ আদর করিয়াছিলেন—নানা ব্যাঘাতের পর সেই ব্যাঘাতেরই
পরে দুঃখের দিনে তাঁহার পারদর্শিনী হইলেন—অধনকার সমস্ত প্রব-
ন্ধকে, সমস্ত প্রিয় ঘটনায়, এই একদিনের অবশ্যপ্রবন্ধিয়ারে। ব্যাঘাত
মত প্রাণসম্বীৰ হইলেন এ নিম্ন কালে আদর করিয়াছিলেন, সেই সা আশ
কোমল।

অরপূর্ণা বোদ্ধিত্বের পক্ষে করিয়া তাঁহার কলি বদন হইতে

কহিলেন, “দিদি !”

রাজলক্ষী কহিলেন, “মেঘবউ !”

বলিয়া আর তাঁহার কথা বাহির হইল না। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া চল পড়িতে লাগিল। আশা এই দৃশ্য দেখিয়া আর থাকিতে পারিল না, পাশের ঘরে গিয়া মাটিতে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

রাজলক্ষী বা আশার কাছে অন্নপূর্ণা মহেন্দ্রের সহজে কোনো প্রশ্ন পাড়িতে সাহস করিলেন না। সাধুচরণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মামা, মহিন কোথায়।”

তখন সাধুচরণ বিনোদিনী ও মহেন্দ্রের সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিলেন। অন্নপূর্ণা সাধুচরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বিহারীর কী খবর।”

সাধুচরণ কহিলেন, “অনেক দিন তিনি আসেন নাই, তাঁহার খবর ঠিক বলিতে পারি না।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “এক বার বিহারীর বাড়িতে গিয়া তাহার সংবাদ জানিয়া আইস।”

সাধুচরণ কিরিয়া আসিয়া কহিলেন, “তিনি বাড়িতে নাই, বাগিতে গদাধর ধারে বাগানে গিয়াছেন।”

অন্নপূর্ণা নবীন-ডাক্তারকে ডাকিয়া রোগীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। ডাক্তার কহিল, “হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতার সঙ্গে উদরী দেখা গিয়াছে, দ্রুত অকস্মাৎ কখন আসিলে কিছুই বলা যায় না।”

সন্ধ্যার সময় রাজলক্ষীর রোগের কষ্ট যখন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, তখন অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, “দিদি, এক বার নবীন-ডাক্তারকে ডাকাই।”

রাজলক্ষী কহিলেন, “না নেতবউ, নবীন-ডাক্তার আমার কিছুই করিতে পারিবে না।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “তবে কাহাকে তুমি ডাকিতে চাও, বলো।”

বাসন্তী কহিলেন, “একবার বিদ্যাবীকে যদি পদে লাগে তবে” অর্থাৎ
মর।”

অরুণার কন্দের মধ্যে আঘাত লাগিল। সেদিন বৃষ্টি ঝড়ের মধ্যে
বেলায় তিনি ঘরের বাহির হইতে মজারের মধ্যে বিদ্যাবীকে বন্দনায়
সজ্জিত দিল্লী করিয়া দিচ্ছিলেন। সেট দেখিয়া তিনি আর পদে
পারেন নাই। বিদ্যাবী আর কখনোই তাঁহার ঘরে ফিরাই
নাই। বীচীকন আর যে কখনও সেট মনোভাব প্রতিকার
করিতে পারেন, এ কথা তাঁহার মনে ছিল না।

অরুণা এক বার ছাত্তে উপর মহোত্তর বসে
এই ঘরটিই ছিল আনন্দনিকেতন। আর সে ঘরের কোনো
বিদ্যাবীক দিল্লী, মাজার, মনোভাব, ছাত্তে উপর
গাছগাছ কদাইয়া গেছে।

বাসন্তী ছাত্তে গিয়াছেন বুদ্ধি। আশাও দীর্ঘ
করিল। অরুণা তখনো বসে চানিয়া কইয়া
করিলেন। আশা নত দীর্ঘ ছট মাত্র তাঁহার
দীর্ঘ পদে মাথা ঠেকাইল। কহিল, “বাসন্তী,
আমাদের আশাও বসে। আমাকে বসে
কোনা কালে ফিরাইয়া পাবি-
শ্য না। না গো, এমন আর
কি হবে।”

অরুণা সেটামনেই মজিতে
দিল্লী কইয়া পড়িল। অরুণা আশাও
মাথা কোলে উপর
কইলেন, এবং কোনো কথা না
কহিয়া নিবৃত্ত হইয়া
কইলেন।

অরুণার বেহালিকিত মিলে
আশাও দীর্ঘ
কইলেন।

হইল, তাহার অতীষ্ট যেন সিদ্ধপ্রায় হইয়াছে। দেবতা তাহার মতো
মুটকে অবহেলা করিতে পারেন, কিন্তু মাসিমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে
পারেন না।

হৃদয়ের মধ্যে আশ্বাস ও বল পাইয়া আশা অনেক দূর পরে দীর্ঘনিশ্বাস
কেনিয়া উঠিয়া বসিল। কহিল, “মাসিমা, বিহারী-ঠাকুরপোকে এক বার
আসিতে চিঠি লিখিয়া দাও।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “না, চিঠি লেখা হইবে না।”

আশা। তবে তাঁহাকে খবর দিবে কী কবিয়া।

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “কাল আমি বিহারীর সঙ্গে নিজে দেখা করিতে
যাইব।”

৪৮

বিহারী যখন পশ্চিমে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল তখন তাহার মনে হইল,
একটা-কোনো কাজে নিম্নেকে আবদ্ধ না করিলে তাহার আর শান্তি
নাই। সেই মনে করিয়া কলিকাতার দরিদ্র কেরানিদের চিকিৎসা ও
শুশ্রূষার ভার সে গ্রহণ করিয়াছে। গ্রীষ্মকালের ভোবার মাছ যেনন
অন্নভল পাকের মধ্যে কোনোমতে শীর্ণ হইয়া থাকি পাইয়া থাকে, গলি-
নিবাসী অস্বাস্থ্য পরিবারভারগ্রস্ত কেরানির বঞ্চিত জীবন সেইরূপ—সেই
বিবর্ণ ক্লান্ত চুচিয়াগ্রস্ত ভ্রমরগুলীর প্রতি বিহারীর অনেক দিন হইতে
করুণাটী ছিল—তাহানিগকে বিহারী বনের ছায়াটুকু ও গম্বার খোলা
দাওয়া দান করিবার সংকল্প করিল।

বাগিতে বাগান লইয়া চীনে নিদ্রিত সাহায্যে সে মন্দ্র করিয়া ছোটো
ছোটো সূতির তৈরি করাইতে আরম্ভ করিয়া গিল। কিন্তু তাহার মন
শান্ত হইল না। কাজে প্রবৃত্ত হইবার দিন তাহার মতই কাছে আসিতে
লাগিল, ততই তাহার চিত্ত আপন সংকল্প হইতে বিদূষ হইয়া উঠিল।

তাহার মন কেবলই স্থিতি লাগিল, 'এ কাজে কোনো হ্রস্ব নাই, কোনো
হ্রস্ব নাই, কোনো সৌন্দর্য নাই—ইহা কেবল শুধু 'ভাবনাত্মক'।' কখনও
কখনও বিদ্যারীতি কখনও ইতিপূর্বে এমন করিয়া দ্রষ্ট করত নাই।

একদিন ছিল যখন বিদ্যারীতি বিশেষ কিছুই প্রকাশ্যে ছিল না। তাহার
সমূহে যাহা-কিছু উপস্থিত হইত তাহার প্রতিই অনাবাসে সে নিরন্তর
নিরুৎসাহিত থাকিত। এখন তাহার মনে একটা-কী স্থান উপস্থিত
হইয়াছে, আগে তাহাকে নিরুৎসাহিত না করিয়া যত কিছুতেই তাহার
আগতি হয় না। পূর্বকার অধ্যয়নমতে সে ওটা-ওটা নাড়িয়া ফেলে,
পরক্ষণেই সে-সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া নিরুৎসাহিত চায়।

বিদ্যারীতি মধ্যে সে যৌন নিমগ্ন কাহ্নে হস্ত হইয়া ছিল, যাহার কথা
সে কখনও চিন্তা করত না, দিনোন্নিয়ম দোষের কারণে সে অসুস্থ
ভাগিয়া উঠিয়াছে। সত্যোক্ত গুরুত্ব নহে। সে আপন পোষাকের গুণ
সমস্ত গুণটাকে খাতিয়া হেঁচাইয়াছে। এই স্থিতি স্থানটির প্রতি
বিদ্যারীতি পূর্ণপরিচয় ছিল না, ইহাকে নইয়া সে খাতিয়া উঠিয়াছে।
এখন কলিকাতার কী-কীর্ষি যত্নে কেবলমাত্র গঠিত সে কী করিতে।

আমাদের গল্প সমূহে বহিরা চলিয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া অসংখ্য
মীল মেঘ ঘনঘন গাচপালাব উপরে ভাবনামত নির্দিষ্টভাবে আবিষ্কার
হইয়া উঠে; সমস্ত নীতিগত উপস্থিতির সহযোগিতা মধ্যে কোথাও বা
উদ্ভাস ক্রমাগত থাকে, কোথাও বা আগুনের মধ্যে অকৃত্রিম অস্তিত্ব
থাকে। সমস্তের এই সমাধানের মধ্যে যেমনি বিদ্যারীতি পূর্ণ পূর্ণ অস্তিত্ব
তাহার উপরে বা উপস্থিতি করিয়া আকাশের এই নীতিগত অসংখ্য
মধ্যে সে একাকিনী স্থিতি হইয়া আসে, যে তাহার আনন্দিক অসং-
খ্যোক্তিক ক্রমাগত উদ্ভাস করিয়া উঠে, যাহা-কিছু হইতে পারে-
যেদূর্বিলে সমস্ত বিস্তারিত স্থিতিগত গঠিত সে-একভাবে তাহার
দৃষ্টি উপরে অন্তিম পূর্ণ পূর্ণ আনন্দিক অসংখ্য করে।

পূর্বের যে জীবনটা তাহার স্থখে সম্বোধে কাটিয়া গেছে, আজ বিহারী সেই জীবনটাকে পবন ক্ষতি বলিয়া মনে করিতেছে। এমন কত মেঘের সন্ধ্যা, এমন কত পূর্ণিমার রাত্রি আসিয়াছিল, তাহার বিহারীর শূন্য হৃদয়ের দ্বারের কাছে আসিয়া স্বধাপাত্তহস্তে নিঃশব্দে ফিরিয়া গেছে— সেই দুর্ভাগ্য শুভ ক্ষণে কত সংগীত অনারদ্ধ, কত উৎসব অসম্পন্ন হইয়াছে, তাহার আর শেষ নাই। বিহারীর মনে যে-সকল পূর্বস্মৃতি ছিল বিনোদিনী সেদিনকার উত্তম চূষনের রক্তিম আভার দ্বারা সেগুলিকে আজ এমন বিবর্ণ অকিঞ্চিৎকর করিয়া দিয়া গেল। মহেশ্বরের ছায়ায় মতো হইয়া জীবনের অধিকাংশ দিন কেমন করিয়া কাটিয়াছিল। তাহার মধ্যে কী চরিতার্থতা ছিল। প্রেমের বেদনায় সমস্ত জল-স্থল-আকাশের কেন্দ্র-স্থর হইতে যে এমন বাগিণীতে এমন বাঁশি বাজে, তাহা তো অচেতন বিহারী পূর্বে কখনও অহুমান করিতেও পারে নাই। যে বিনোদিনী ছুই বাহতে বেঠন করিয়া এক মুহূর্তে অকস্মাৎ এই অপরূপ সৌন্দর্যলোকে বিহারীকে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে, তাহাকে সে আর কেমন করিয়া ফুলিবে। তাহার দৃষ্টি তাহার আকাঙ্ক্ষা আজ সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার শ্যাকুল ঘননিখাস বিহারীর রক্তশ্রোতকে অহরহ তরঙ্গিত করিয়া ফুলিতেছে এবং তাহার স্পর্শের সুকোমল উত্তাপ বিহারীকে বেঠন করিয়া গুলকাবিষ্ট হৃদয়কে ফুলের মতো ফুটাইয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু, তবু সেই বিনোদিনীর কাছ হইতে বিহারী আজ এমন দূরে যাইয়াছে কেন। তাহার কারণ এই, বিনোদিনী যে সৌন্দর্যসে বিহারীকে অভিধিক্ত করিয়া দিয়াছে, সংসারের মধ্যে বিনোদিনীর সহিত সেই সৌন্দর্যের উপযুক্ত কোনো সম্বন্ধ সে করনা করিতে পারে না। পদকে ফুলিতে গেলে পদ উঠিয়া পড়ে। কী বলিয়া তাহাকে এমন কোথায় স্থাপন করিতে পারে যেখানে হৃদয় বীভৎস হইয়া না উঠে। তাহা ছাড়া মহেশ্বরের সহিত যদি কাড়াকাড়ি বাধিয়া দায়, তবে সমস্ত ব্যাপারটা এতই

ବୁଦ୍ଧିମତ୍ ଆଦାର ଧାରଣ କରିବେ ସେ, ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବନା ବିହାରୀ ଗଜେର ପ୍ରାଣେ ଏ
 ମାନ ମିଳେ ପାରେ ନା । ତାହି ବିହାରୀ ନିକୃତ୍ତ ଗଜାବୀର ବିଷୟାବିଷୟ
 ନାଶପାନେ ତାହାର ସାନୁରୀ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
 ବୁଦ୍ଧେର ଗତୋ ବଦ୍ଧ କରିବେହେ । ପାଠକ ଏବନ କୋଣା କଥାଟି ପାଠ ବାସନ୍ତେ
 ତାହାର ଅନ୍ଧବଦ୍ଧତାକୁ ଛିନ୍ନକିନ୍ନ ହେଉ ବାଦ, ତାହି ସେ ଚିନ୍ତି ନିବିଡ଼ା
 ଦିନୋଦିନୀର କୋଣା ବଦ୍ଧେ ଗଜ ନା ।

ତାହାର ବାସନ୍ତର ଚଳିତ ପ୍ରାଣେ ଧନପୁର୍ଣ୍ଣ ଜାନୁଆରୀର ଡଳାର ଦେଖିବେ
 ପ୍ରକାଶେ ବିହାରୀ ଚୁମ୍ବ କରିବା ପଢ଼ିବା ହିଲ, ବହୁମ ମିତା ବୁଦ୍ଧିର ପାଠକ
 ବାସନ୍ତର କରିବେହେ, ତାହି ସେ ଏବନ ଜାଣେ ଦେଖିବେହେ । କ୍ରମେ ସେ
 ବାସନ୍ତର ଦାହିରେ ଗାସିଲ । ଚାକର ଆସିବା, ଆହାରେର ଆହୋରଣ କରିବେ କି
 ନା ଛିନ୍ନାସା କରିବ, ବିହାରୀ କରିବ, "ଏବନ ବାଦ ।" ଛିନ୍ନିତ ମହା
 ଆସିବା ଦିବେଶ ପରାମର୍ଶର ଗଜ ତାହାକୁ ବାଦ ଦେବେହେ ଆହୋରଣ କରିବ,
 ବିହାରୀ କରିବ, "ଆହ-ଏକଟି ପାଠ ।"

ଏବନ ଗଜ ବିହାରୀ ଗଜା ଚଳିବା ଉପିବା ଦେଖିବ, ବହୁମ ଅଧର୍ମ ।
 ବହୁମ ହେଉ ଉପିବା ପଢ଼ିବ, ତାହି ହେଉ ତାହାର ମା ଗାସିବା ବାସନ୍ତ ବୁଦ୍ଧି
 ନାଆ ଆସିବା ପ୍ରକାଶ କରିବ । ଅଧର୍ମପୁର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣର ଚଳିତ ବହୁ ମିତା ପରାମର୍ଶ
 ବିହାରୀର ନାଆ ଏ ଗା ଅଧର୍ମ କରିବେ । ଅଧର୍ମପୁର୍ଣ୍ଣ ବାଦ କରିବେହେ,
 "ବିହାରୀ, ତୁହି ଏବନ ଗୋଟି ହେଉ ଦେଖିବେହେ ।"

ବିହାରୀ କରିବ, "ବାସନ୍ତର, ହୋଇବ ସେହି ନିବିଡ଼ା ପାଠକର ଗଜ ।"

ଛାନ୍ଦିବା ଅଧର୍ମପୁର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟି ମିତା ବହୁ ବହୁ କରିବା ଗଜ ପଢ଼ିବେହେ ଆସିବା ।

ବିହାରୀ ଗଜ ହେଉ କରିବ, "ବାସନ୍ତର, ହୋଇବ ଏବନ ଗୋଟି ହେଉ ନାହିଁ ?"

ଅଧର୍ମପୁର୍ଣ୍ଣ କରିବେହେ, "ବା, ଏବନ ଗୋଟି ହେଉ ଗଜ ନାହିଁ ?"

ବିହାରୀ କରିବ, "ଗୋଟି ଆସି ବାସନ୍ତର ହୋଇବ କରିବା ନାହିଁ ସେ ।"

ଆମ ଗଜେକ ଛିନ୍ନ ଗଜ ହୋଇବ ବାସନ୍ତର ଗଜା ଗଜ ହୋଇବ ବାସନ୍ତର ଗଜା

খাইয়া বাঁচিব।”

মহেন্দ্র-আশাব মথক্ষে বিহারী কোনো কথাই উত্থাপন করিল না। অন্নপূর্ণা একদিন স্বহস্তে বিহারীব নিকটে সে দিক্‌কার ঘাষ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। অভিমানের সহিত সেই নিষ্ঠুর নিবেদ সে পালন করিল।

আহারান্তে অন্নপূর্ণা কহিলেন, “নৌকা ঘাটেই প্রস্তুত আছে, বিহারী, এখন একবার কলিকাতায় চল।”

বিহারী কহিল, “কলিকাতায় আমার কোন প্রয়োজন।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “দ্বিদিব বড়ো অগ্রথ, তিনি তোকে দেখিতে চাহিয়াছেন।”

তিনিয়া বিহারী চকিত হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, “মহিনন্দ কোথায়।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “সে কলিকাতায় নাই, পশ্চিমে চলিয়া গেছে।”

তিনিয়া মুহূর্তে বিহারীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে চূপ করিয়া রহিল।

অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুই কি সকল কথা জানিস নে।”

বিহারী কহিল, “কতকটা জানি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জানি না।”

তখন অন্নপূর্ণা, বিনোদিনীকে লইয়া মহেন্দ্রের পশ্চিমে পলায়নের বার্তা বলিলেন। বিহারীর চক্ষে তৎক্ষণাৎ জল-স্থল-আকাশের সমস্ত বস্তু বসলাইয়া গেল, তাহার কল্পনাভাণ্ডারের সমস্ত সঞ্চিত বস্তু মুহূর্তে তিক্ত হইয়া উঠিল।—“মায়াবিনী বিনোদিনী কি সেদিনকার সন্ত্যাবেলায় আমাকে লইয়া গেলা করিয়া গেল। তাহার ভালোবাসার আবদানসম্পূর্ণ সনদই ছলনা! সে তাহার গ্রাম ত্যাগ করিয়া নির্গন্ধ ভাবে মহেন্দ্রের সঙ্গে একাধিনী পশ্চিমে চলিয়া গেল। যিক্‌ তাহাকে, এবং যিক্‌ আমাকে যে জানি, হুট, তাহাকে এক মুহূর্তের ক্ষণও বিশ্বাস করিয়াছিলাম।”

হায় বেদাঙ্কুর আঘাতের সড়া, হায় গতহৃদি পূর্ণিমার রাতি,

বিদ্যারী ভাবিতেছিল, হৃদিনী আশার সুখেই শিক সে চাহিলে কী করিয়া। সেইদিন মধ্য যখন সে প্রবেশ করিল, তখন নারদীন সমস্ত বাড়িটার ঘনীভূত বিষাক্ত হাওয়াকে এক মুহূর্তে আঁচুত করিয়া যেতিল। বাড়ির গলিঘাটান ও চাকরদের সুখেই শিক চাহিয়া উন্নয় নিঃশব্দ মনোহের স্তম্ভ লম্বায় বিদ্যারীর নাক্য নত করিয়া দিল। পরিচিত কুতূহলিনীকে সে প্রিয় ভাবে লুকের হাতো কুণ্ডল চিত্রাঙ্গা করিতে পারিল না। অঙ্গাপুরে প্রবেশ করিতেই আবার পা খেল গড়িতে চাহিল না। বিদ্যারীর শব্দে প্রকাশিত ভাবে মনোহ অসহায় আপাতক যে লোক অপমানের মধ্যে নিঃশব্দ করিয়া গেছে, যে অপমানে হীলোকের চামের আশ্রয়টুকু হরণ করিয়া তাহাকে সমস্ত সংসারের সংকীর্ণতম কণা-দুগ্ধি-বর্ণের নাকপানে ঝাঁকু বসাইয়া দেয়, সেই অপমানের অন্যায় প্রকাশ্যেই মনো বিদ্যারী হৃদিত ঘাঘির আশাকে তেবিলে তোলু প্রাণে।

কিন্তু এ-সবল চিন্তার ক সংকোচের আর অংশই বহিল না। অঙ্গাপুরে প্রবেশ করিতেই আশা স্তম্ভ পড়ে আসিয়া বিদ্যারীরে বহিল, "মাকুতপো, একবার দীপ্ত আসিয়া মাকে তেলিয়া দাও, তিনি মতো কী পাইয়েছেন।"

বিদ্যারীর সঙ্গে আশার প্রকাশিত ভাবে এই প্রথম আলাপ। উন্নয় চুতিলে একটিনার সামান্য কষ্টকায় সমস্ত সান্দ্রন উৎসাহিত কইয়া যায়। যাহারা সুখে মাস করিয়াছিল প্রাচলিনীকে হঠাৎ বদলে এসেইবার সংকীর্ণ হাটের উন্নয় একর করিয়া দেয়।

আশার এই সংকোচমীন ব্যাধুস্বভাব বিদ্যারী আশার পাইল। মনোহ আশার সংসারটিকে যে কী করিয়া চিত্রা দেয়, এই পূহ ঘটনা

হইতেই তাহা সে যেন অধিক বুঝিতে পারিল। ছুদিনের তাড়নায় গৃহের যেমন সম্ভ্রা-মৌন্দৰ্ব উপেক্ষিত, গৃহলক্ষ্মীরও তেমন লক্ষ্যের ঐষ্টকু রাখিবারও অবসর ঘুচিয়াছে—ছোটোখাটো আবরণ-অস্ত্রবাল বাছ-বিচার সমস্ত খসিয়া পড়িয়া গেছে—তাহাতে আর ভ্রক্ষেপ করিবার সময় নাই।

বিহারী রাজলক্ষ্মীর ঘরে প্রবেশ করিল। রাজলক্ষ্মী একটা আকস্মিক শ্বাসকষ্ট অনুভব করিয়া বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন—সেটা বেশিগণ স্বামী না হওয়াতে পুনর্বার কতকটা সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন।

বিহারী প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি লইতেই রাজলক্ষ্মী তাহাকে পাশে বসিতে ইদ্রিত করিলেন এবং ধীরে ধীরে কহিলেন, “কেমন আছিস বেহারি। কতদিন তোকে দেখি নাই।”

বিহারী কহিল, “না, তোমার অস্থখ, এ খবর আমাকে কেন জানাইলে না। তাহা হইলে কি আমি এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিতাম।”

রাজলক্ষ্মী মুহূর্ত্তে কহিলেন, “সে কি আর আমি জানি না বাছ। তোকে পেটে ধরি নাই বটে, কিন্তু ভগতে তোর চেয়ে আমার আপনার আর কি কেহ আছে।”

বলিতে বলিতে তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বিহারী তাতাতাড়ি উঠিয়া ঘরের কুলুদিতে গুৰুপত্রে শিশি-কোটাগুলি পরীক্ষা করিবার ছলে আশ্রয়সংবরণের চেষ্টা করিল। ফিদিয়া আসিয়া সে যখন রাজলক্ষ্মীর নাভি দেখিতে উত্তত হইল রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “আমার নাভির খবর থাক—জিজ্ঞাসা করি, তুই এমন রোগা হইয়া গেছিস কেন বেহারি।”

বলিয়া রাজলক্ষ্মী তাঁহার কৃশ হস্ত তুলিয়া বিহারীর কণ্ঠায় হাত বুলাইয়া দেখিলেন।

বিহারী কহিল, “তোমার হাতের মাছের ঝোল না খাইলে আমার এ হাড় কিছুতেই ঢাকিবে না। তুমি শীঘ্র-শীঘ্র মারিয়া ধরো না, আমি

उत्तमं द्वाविंशत् सारोक्षणं अत्रिदा शशि ।"

दादमहो ज्ञान दामि दामिदा यदितेन, "दयाम नयाम धामादहन न
दाछा—दिष्ट दामाद नद।"

বলিয়া বিহাঙ্গী হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, “বেহাঙ্গি, তুমি যত
 মনে নিয়ে আছ, ততোধিক সেবিবার লোক বেহু নাই। ও বেহুই, তোমরা
 এবার বেহাঙ্গির একটী দিকে লিখে দাও—কল্যাণ-না, শাস্ত্রের বেহাঙ্গি
 কেমন হইয়া গেছে।”

ଅନ୍ତର୍ଗତ କରିଲେ, “ତୁମି ଆଦିଆ ଶ୍ରୀ ଗିରି । ଏ ହୋ ଯୋଗୀ
କାମ, ତୁମି ଅନ୍ତର୍ଗତ କରିଲେ, ଆନନ୍ଦା ଶବ୍ଦେ ଯୋଗ ବିଦ୍ୟା ଆନନ୍ଦା କରିବ ।”

ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ, "ସାନାର ଆଦି ମଦ୍ୟ ହେବ ନା ବେଳକଟି, ବେଳାଟି
 ହାତ ଯୋଗାଡ଼ରେ ଉପକ୍ରମ କରିବ—ଓହାଟେ ଶ୍ରମୀ କରିବେ, ଆମି ଓହାଟେ ନା
 ଶ୍ରମୀ କରିବେ ପାରିବେ ନା—କିନ୍ତୁ ଓହାଟେ ଓହାଟେ କରିବେ ।"

दक्षिण विदेशीय भाषाएं टीकाएं मजिन इव दूलाहेरा मिलन ।

ଆମା ଆମ ଯେ ବାବିରେ ପାଲେ ଗା—ବାବିରେ ଗା ବାବିରେ ଗା
ମେଳ । ଅଗ୍ରମୁଖୀ ଅଗ୍ରମୁଖୀ ଗାବି ଗାବି ଗାବି ଗାବି ଗାବି ଗାବି
ବାବିରେ ।

১৮৮১-৮২ খ্রিঃ বঙ্গাব্দে ১১শে চৈত্র, ১২৯৮
 ১৮৮১-৮২ খ্রিঃ বঙ্গাব্দে ১১শে চৈত্র, ১২৯৮

ଆଜ୍ଞା ଦତ୍ତ ପ୍ରଭୃତି କବିମାନେ କହିଲେ, "ସେବାଦିତ୍ତ ଆଦ୍ୟାଦି ୨୨
ନାୟକା କବିମାନେ ହେ ।"

[illegible]

କଳିଙ୍ଗ ବିଦାତ୍ତ ବଂଶୀୟ ଗଜବଂଶ ଆକାର ଗଜବଂଶ ବିଷୟ ଗ୍ରନ୍ଥମ୍ ।

আশা আজ আর লজ্জা পাইল না। সে স্নেহের সহিত দ্বিতহাস্তে বিহারীর পরিহাস গ্রহণ করিল। বিহারী এ সংসারের কতখানি আশা তাহা আগে সম্পূর্ণ জানিত না—অনেক সময় তাহাকে অনাবশ্যক আগন্তুক মনে করিয়া অবজ্ঞা করিয়াছে, অনেক সময় বিহারীর প্রতি বিনুখ ভাব তাহার আচরণে স্পষ্টে পরিষ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। সেই অহুতাপের দিক্‌কারে আজ বিহারীর প্রতি তাহার শ্রদ্ধা এবং করুণা সবেগে ধাবিত হইয়াছে।

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “মেঘবউ, বাহুনঠাকুরের কর্ম নয়, বামাটা তোমায় নিজে দেখাইয়া দিতে হইবে—আনাদের এই বাঙাল ছেলে একরাশ ঝাল নহিলে খাইতে পারে না।”

বিহারী। তোমার মা ছিলেন বিক্রমপুরের মেয়ে, তুমি নদীদ্বা ছেলার ডল্লমস্থানকে বাঙাল বল ? এ তো আমার সহ্য হয় না।

ইহা লইয়া অনেক পরিহাস হইল, এবং অনেক দিন পরে মহেন্দ্রের বাড়ির বিবাদভার যেন লধু হইয়া আসিল।

কিন্তু এত কথাবার্তার মধ্যে কোনো পক্ষ হইতে কেহ মহেন্দ্রের নাম উচ্চারণ করিল না। পূর্বে বিহারীর সঙ্গে মহেন্দ্রের কথা লইয়াই রাজলক্ষ্মীর একমাত্র কথা ছিল। তাহা লইয়া মহেন্দ্র নিজে তাহার মাতাকে অনেক বার পরিহাস করিয়াছে। আজ সেই রাজলক্ষ্মীর মুখে মহেন্দ্রের নাম এক বারও না শুনিয়া বিহারী মনে মনে স্তম্ভিত হইল।

রাজলক্ষ্মীর একটু নিঃশব্দে হইতেই বিহারী বাহিরে আসিয়া অন্নপূর্ণাকে কহিল, “নার ব্যামো তো সহ্য নহে।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “সে তো স্পষ্টই দেখা দাড়াইতেছে।”

বলিয়া অন্নপূর্ণা তাঁহার ঘরের জানালার কাছে বসিয়া পড়িলেন।

অনেক গগ চূপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, “একবার মহিনকে ডাকিয়া আনিবি না বেহারী ? আর তো বেশি কথা উচিত হয় না।”

বিহারী কিছুক্ষণ নিশ্চব্দে থাকিয়া করিল, “তুমি যেমন আশ্রয়
করিলে আমি তাহাই করিব। তাহার চিকানা দেহ কি জানে।”

অনুপূৰ্ণ। ঠিক জানে না, তুমিই জানে। হঠাৎ। বিহারী, আর-
একটা কথা তোকে কাছে বলি। আমার মূখের নিকটে আস। বিনোদিনী
চাও হঠাৎ মনে পড়েছে যদি উদ্ধার করিতে না পারিল, তবে সে আর
পাঠিবে না। তাহার মূখ দেখিলেই বুঝিতে পারিবি, তায় কৃষ্ণ চক্ষু
ধাক্কিহাটে।

বিহারী মনে মনে ‘শ্রী হামি হামি’ ডাকিল, ‘পথে উদ্ধার
আনি করিতে বাইব—তগবান, আমার উদ্ধার কে করিলে।’ করিল,
“বিনোদিনীর আশ্রয় হইবে চিকিৎসার ভর মনে পড়েছে বৈকি। হামি
পারিব, এমন নয় আমি কি আমি কাকীনা ৭ মার বাজারে সে হামি
নাথ হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু আমার সে যে মিথিষে না, তাহা ভেদ
করিয়া বলিব।”

এমন সময় হামিবলনা আশা রাখার আশ্রয়না যেমনটা মিয়া হীর
বীথে তাহার মামিয়ার পায়ে কাঁচ আশ্রয় বলিল। সে হামি
হামিবলীর দীর্ঘ সময়ে বিহারীর সঙ্গে অনুপূৰ্ণ আশ্রয়না চিকিৎসে,
তাই কেহনেকার মিত্র চিকিৎসে আশ্রয়। পথিহা। আমার মূখ
চক্ষুর নীচের মিত্রা দেখিয়া বিহারীর মনে এক অনুভব করিবে
হইল। শোকে তাহা দীর্ঘমতে অনিচ্ছিত হইয়া এই কলি হমি
মূখের কেহনেকার মিত্র একটা অনুভব হামি
আশ্রয়না মিত্রা মনে, সে মনে হামি
সময় হামি মিত্র হইয়াছে।

বিহারী মহেন্দ্ৰের ব্যাধি গিয়া খবর পাইল যে, তাহাদের এলাহাবাদ-
শাখার সহিত মহেন্দ্ৰ অল্পদিন হইতে লেনাদেনা আরম্ভ করিয়াছে।

৫০

ঠেশনে আসিয়া বিনোদিনী একেবারে ইন্টার-মিডিয়েট ক্লাসে মেয়েদের
গাড়িতে চড়িয়া বসিল। মহেন্দ্ৰ কহিল, “ও কী কর, আমি তোমার ভগ্নে
সেবে ও ক্লাসের টিকিট কিনিতেছি।”

বিনোদিনী কহিল, “দরকার কী, এখানে আমি বেশ থাকিব।”

মহেন্দ্ৰ আশ্চর্য হইল। বিনোদিনী স্বভাবতই শৌখিন ছিল। পূর্বে
দারিদ্র্যের কোনো লক্ষণ তাহার কাছে প্রীতিকর ছিল না, নিজের
সাংসারিক দৈহিক সে নিজের পক্ষে অপমানকর বলিয়াই মনে করিত।
মহেন্দ্ৰ এটুকু বুঝিয়াছিল যে, মহেন্দ্ৰের ঘরের অল্পস্ব সম্বলতা, নিলাস-
উপকরণ এবং সাধারণের কাছে ধনী বলিয়া তাহাদের গৌরব, এক কালে
বিনোদিনীর মনকে আকর্ষণ করিয়াছিল। সে যে অনায়াসেই এই ধন-
সম্পদ, এই-সকল আরাম ও গৌরবের ঈশ্বরী হইতে পারিত, সেই কল্পনায়
তাহার মনকে একান্ত উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। আর যখন মহেন্দ্ৰের
উপর প্রচণ্ডলাভ করিবার সময় হইল, না চাহিয়াও সে যখন মহেন্দ্ৰের
সমস্ত ধনসম্পদ নিজের ভোগে আনিতে পারে, তখন কেন সে এমন অসহ
উপেকার সহিত একান্ত উচ্ছতভাবে কষ্টকর লজ্জাকর দীনতা খাঁদার
করিয়া লইতেছে। মহেন্দ্ৰের প্রতি নিজের নির্ভরকে সে যথাসম্ভব
সংকুচিত করিয়া রাখিতে চায়। যে উন্নত মহেন্দ্ৰ বিনোদিনীকে তাহার
স্বাভাবিক আশ্রয় হইতে চিরদ্বীবনের ঘত্ন দূরত করিয়াছে, সেই মহেন্দ্ৰের
হাত হইতে সে এমন কিছুই চাহে না যাহা তাহার এই সর্বনাশের
ন্যায়রূপ গণ্য হইতে পারে। মহেন্দ্ৰের ঘরে যখন বিনোদিনী ছিল তখন
তাহার আচরণে বৈধব্যভবের কাঠিত বড়ো-একটা ছিল না, কিন্তু এতদিন

বিহারী কিছুক্ষণ নিরুত্তরে থাকিয়া কহিল, “তুমি যেমন আবেশ করিবে আমি তাহাই করিব। তাহার ঠিকানা কেহ কি জানে।”

অম্পূর্ণা। ঠিক জানে না, খুঁজিয়া লইতে হইবে। বিহারি, মাদ-একটা কথা তোমার কাছে বলি। আশার মুখের দিকে চাস। বিনোদিনীর হাত হইতে মহেশ্বকে যদি উদ্ধার করিতে না পারিস, তবে সে আর বাঁচিবে না। তাহার মুখ দেখিলেই বুকিতে পারিবি, তার হৃদে মহাযাধ বাজিয়াছে।

বিহারী মনে মনে তীব্র হাসি হাসিয়া ভাবিল, ‘পরকে উদ্ধার আমি করিতে যাইব—ডগবান, আমার উদ্ধার কে করিবে।’ কহিল, “বিনোদিনীর আকর্ষণ হইতে চিরকালের মত মহেশ্বকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিব, এমন মহ আমি কি জানি কাকীনা? মার ক্যামোতে সে হু-গ্নি শান্ত হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু আবার সে যে ফিবিবে না, তাহা কেমন করিয়া বলিব।”

এমন সময় মলিনবসনা আশা মাথায় আখধানা ঘোমটা দিয়া ধীরে ধীরে তাহার মাসিমার পায়ের কাছে আসিয়া বসিল। সে জানিত রাজলক্ষীর পীড়া সবচেয়ে বিহারীর সঙ্গে অম্পূর্ণার আলোচনা চলিতেছে, তাই ঐশ্বর্য্যকোষ সহিত গুনিতে আসিল। পতিব্রতা আশার মুখে নিরন্তর দুঃখের নীরব মহিমা দেখিয়া বিহারীর মনে এক অপূর্ব ভক্তির সঞ্চার হইল। শ্যেঙ্কের তপ্ত তীর্থভ্রমে অতিদীর্ঘ হইয়া এই তরুণী রমণী প্রাচীন যুগের দেবীদের ছায় একটি অচকল মর্যাদা লাভ করিয়াছে—সে এখন আর সানাতা নারী নহে, সে যেন দারুণ দুঃখে পুরাণযনিতা সাধীসহ সমান বদন প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিহারী আশার সহিত রাজলক্ষীর পদ্য ৫ ঐক্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া যখন আশাকে বিলাস করিল তখন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অম্পূর্ণাকে কহিল, “মহেশ্বকে আমি উদ্ধার করিব।”

বিহারী মহেন্দ্রের ব্যাকে গিয়া খবর পাইল যে, তাহাদের এলাহাবাদ-
শাখার সহিত মহেন্দ্র অল্পদিন হইতে লেনাদেনা আব্রস্ত করিয়াছে।

৫০

ঠেগানে আসিয়া বিনোদিনী একেবারে ইন্টার-মিডিয়েট ক্লাসে মেয়েদের
গাড়িতে চড়িয়া বসিল। মহেন্দ্র কহিল, “ও কী কর, আমি তোমার স্নাত্তে
সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কিনিতেছি।”

বিনোদিনী কহিল, “দরকার কী, এখানে আমি বেশ থাকিব।”

মহেন্দ্র আশ্চর্য হইল। বিনোদিনী স্বভাবতই শৌখিন ছিল। পূর্বে
মারিত্রের কোনো লক্ষণ তাহার কাছে প্রীতিকর ছিল না; নিজের
সাংসারিক দৈন্ত সে নিজের পক্ষে অপমানকর বলিয়াই মনে করিত।
মহেন্দ্র এটুকু বুঝিয়াছিল যে, মহেন্দ্রের ঘরের অল্পস্ব সম্ভলতা, বিলাস-
উপকরণ এবং সাধারণের কাছে ধনী বলিয়া তাহাদের গৌরব, এক কালে
বিনোদিনীর মনকে আকর্ষণ করিয়াছিল। সে যে অনায়াসেই এই ধন-
সম্পদ, এই-সকল আশ্রয় ও গৌরবের ঈশ্বরী হইতে পারিত, সেই কল্পনায়
তাহার মনকে একান্ত উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। আর যখন মহেন্দ্রের
উপর প্রভুত্বলাভ করিবার সময় হইল, না চাহিয়াও সে যখন মহেন্দ্রের
সমস্ত ধনসম্পদ নিজের ভোগে আনিতে পারে, তখন কেন সে এমন অসহ্য
উপেক্ষার সহিত একান্ত উচ্ছিন্নভাবে কষ্টকর লজ্জাকর দীনতা স্বীকার
করিয়া লইতেছে। মহেন্দ্রের প্রতি নিজের নির্ভরকে সে যথাসম্ভব
সংকুচিত করিয়া রাখিতে চায়। যে উদ্বস্ত মহেন্দ্র বিনোদিনীকে তাহার
যাচাৰিক আশ্রয় হইতে চিরজীবনের জন্য চ্যুত করিয়াছে, সেই মহেন্দ্রের
হাত হইতে সে এমন কিছুই চাহে না বাহা তাহার এই সর্বনাশের
হুম্ব্যবরূপ গণ্য হইতে পারে। মহেন্দ্রের ঘরে যখন বিনোদিনী ছিল তখন
তাহার আচরণে বৈধব্যভ্রমের কাঠি বড়ো-একটা ছিল না, কিন্তু এতদিন

পরে সে আপনাকে সর্বপ্রকার ভোগ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। এখন সে এক বেলা খায়, মোটা কাপড় পরে, তাহার সেই অনর্গল-উৎসারিত হাস্যপরিহাসই বা গেল কোথায়। এখন সে এমন স্বর, এমন আদৃষ্ট, এমন হৃদয়, এমন ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে যে, মহেশ্বর তাহাকে সামান্য একটা কথাও জোর করিয়া বলিতে সাহস পায় না। মহেশ্বর অক্ষয় চইয়া, অশীৰ্ব হইয়া, জুহু হইয়া, কেবলই ভাবিতে লাগিল, 'বিনোদিনী আমাকে এত চেষ্টায় দুর্লভ বলের মতো এত উচ্চশাখা হইতে পাড়িয়া লইল, তাহার পরে আনন্দ না করিয়া আত্ম মার্জিতে ফেলিয়া দিতছে কেন।'

মহেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "কোথাকার চিকিৎসা করিব বলে।"

বিনোদিনী কহিল, "পশ্চিম দিকে যেখানে খুঁশি চলো, কাল সকালে যেখানে গাড়ি থাবিবে নামিয়া পড়িব।"

এমনতরো ভ্রমণ মহেশ্বরের কাছে লোভনীয় নহে। আদ্যাত্ম তাহার পক্ষে কষ্টকর। বড়ো পহরে গিয়া ভালোয়না আশ্রয় না পাইলে মহেশ্বরের বড়ো দুশকিল। সে খুঁজিয়া-পাতিয়া করিয়া-কর্মিয়া লইবার লোক নহে। তাই অত্যন্ত ক্লান্ত বিবক মনে মহেশ্বর গাড়িতে উঠিল। এ দিকে মনে কেবলই ভয় হইতে লাগিল, পাছে বিনোদিনী তাহাকে না জানাইয়াই কোথাও নামিয়া পড়ে।

বিনোদিনী এইরূপ শনিগ্রহের মতো ঘুরিতে এক মহেশ্বরে ঘুরাইতে লাগিল—কোথাও তাহাকে বিদ্রোহ ছিল না। বিনোদিনী অতি ক্লান্ত লোককে আপন করিয়া লইতে পারে; অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে গাড়ির সহযোগীদের সহিত বকুসহাশন করিয়া লইত। যেখানে খাইবার ইচ্ছা সেখানকার শব্দ শব্দ লইত, বাত্ৰিশালার আশ্রয় লইত এবং যেখানে বাচা-বিচ্ছ বেগিবার আছে ছুটিয়া গুটিয়া বকুসহাশে ফেলিয়া বইত। মহেশ্বর বিনোদিনীর কাছে নিজের অনাবশ্যকীয় প্রতিদিন আপনাকে

হতমান বোধ করিতে লাগিল। টিকিট কিনিয়া দেওয়া ছাড়া তাহার কোনো কাজ ছিল না, বাকি সময়টা তাহার প্রবৃত্তি তাহাকে ও সে আপন প্রবৃত্তিকে দংশন করিতে থাকিত। প্রথম প্রথম কিছুদিন সে বিনোদিনীর সঙ্গে সঙ্গে পথে পথে ফিরিয়াছিল, কিন্তু ক্রমে তাহা অসহ হইয়া উঠিল। তখন মহেন্দ্র আহারাদি কবিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিত, বিনোদিনী সমস্ত দিন ঘুরিয়া বেড়াইত। মাতুলস্নেহলালিত মহেন্দ্র যে এমন করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িতে পারে তাহা কেহ কল্পনাও করিত না।

একদিন এলাহাবাদ স্টেশনে দুই জনে গাড়ির জন্ত অপেক্ষা করিতে-ছিল। কোনো আকস্মিক কারণে ট্রেন আসিতে বিলম্ব হইতেছে। ইতি-মধ্যে অজ্ঞাত গাড়ি যত আনিতেছে ও যাইতেছে, বিনোদিনী তাহার যাত্রীদের ভালো করিয়া নিবীক্ষণ করিয়া দেখিতেছে। পশ্চিমে ঘুরিতে ঘুরিতে চারি দিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে সে হঠাৎ কাহারও দেখা পাইবে, এই বোধ করি তাহার আশা। অস্বস্ত, রুদ্ধ গলির মধ্যে জনহীন গৃহে নিশ্চল উত্তমে নিজেকে প্রত্যাহ চাপিয়া মারার চেয়ে এই নিত্যসন্ধান-পরতার মধ্যে, এই উন্মুক্ত পথের জনকোলাহলের মধ্যে শান্তি আছে।

হঠাৎ এক সময়ে স্টেশনে একটি কাঁচের বাস্তের উপর বিনোদিনীর দৃষ্টি পড়িতেই সে চমকিয়া উঠিল। এই পোস্ট আপিসের বাস্তের মধ্যে, যে-সকল লোকের উদ্দেশ্য পাওয়া যায় নাই তাহাদের পত্র প্রদর্শিত হইয়া থাকে। সেই বাস্তে সজ্জিত একগানি পত্রের উপরে বিনোদিনী বিহারীর নাম দেখিতে পাইল। বিহারীলাল নামটি অসাধারণ নহে; পত্রের বিহারীই যে বিনোদিনীর অভীষ্ট বিহারী, এ কথা মনে করিবার কোনো হেতু ছিল না—তবু বিহারীর পুরা নাম দেখিয়া সেই একটিনাত্র বিহারী চাড়া দাব-কোনো বিহারীর কথা তাহার মনে সন্দেহ হইল না। পত্রে লিপিত ঠিকানাটি সে বুঝ করিয়া লইল। অত্যন্ত অপ্রসন্নভাবে মহেন্দ্র একটা বেঞ্চের উপর বসিয়া ছিল; বিনোদিনী সেখানে আসিয়া কহিল, “কিছুদিন

এলাহাবাদেই থাকিব।”

বিনোদিনী নিজেই ইচ্ছানুসারে নবহস্তকে চানাইতেছে, অথচ তাহার সূচিত অল্প ক্রমকে খোঁচামাত্র দিতেছে না, ইহাতে নবহস্তের পৌরুষাভিমান প্রতিফলিত হইয়া তাহার ক্রম বিস্তারী হইয়া উঠিতেছিল। এলাহাবাদে কিছুদিন থাকিয়া জিরাইতে গাইলে সে বাচিয়া যায়—কিন্তু ইচ্ছার অঙ্গুল হইলেও বিনোদিনীর বেদাগমারে সন্ততি দিতে তাহার মন হঠাৎ বাঁকিয়া দাড়াইল। সে রাগ করিয়া কহিল, “বখন বাহির হইয়াছি তখন ঘাইবই। কিরিতে পারিব না।”

বিনোদিনী কহিল, “আমি ঘাইব না।”

নবহস্ত কহিল, “তবে তুমি একলা থাকো, আমি চলিলাম।”

বিনোদিনী কহিল, “সেই ভালো।” বলিয়া বিরক্তিমাত্র না করিয়া ইদিকে নুটে ডাকিয়া স্টেশন ছাড়িয়া চলিল।

নবহস্ত পুরুষের কর্তৃত্ব-অধিকার লইয়া অস্বস্তিক্রমে যেকোন বসিয়া রহিল। যতদূর বিনোদিনীকে দেখা গেল ততদূর সে দূর হইয়া থাকিল। বখন বিনোদিনী একবারও পশ্চাতে না ফিরিয়া বাহির হইয়া গেল, তখন সে তাড়াতাড়ি নুটের মাধ্যমে বাস-বিছানা চাপাইয়া তাহার অঙ্গসংগ করিল। বাহিরে আসিয়া দেখিল, বিনোদিনী একখানি গাড়ি অধিকার করিয়া বসিয়াছে। নবহস্ত কোনো কথা না বলিয়া গাড়ির মাধ্যমে মাল চাপাইয়া কোচখায়ে চড়িয়া বসিল। নিজের অসংকোচ পর্ব করিয়া গাড়ির চিত্তরে বিনোদিনীর সম্মুখে বসিতে তাহার আর সুখ রহিল না।

কিন্তু গাড়ি তো চলিয়াছেই। এক ঘণ্টা হইয়া গেল, তখন নবহস্তের বাড়ি চাড়াইয়া চলা নার্শে আসিয়া পড়িল। গাড়োয়ানকে প্রহর করিতে নবহস্তের লাল করিতে লাগিল; কারণ, পাছে গাড়োয়ান মন করে ভিতরকার সীলোকটিই কর্তৃপক্ষ, কোথাও ঘাইতে হইলে তা’ও সে এই অনাবশ্যক পুরুষটার সঙ্গে পরামর্শও করে নাই। নবহস্ত কষ্টে অচিন্তন মন

মনে পরিতাপ করিয়া স্তম্ভভাবে কোচবাগ্জে বসিয়া রহিল ।

গাড়ি নির্জনে যমুনার ধারে একটি সম্ভ্রান্ত বাগানের মধ্যে আসিয়া থামিল । মহেন্দ্র আশ্চর্য হইয়া গেল । এ কাহার বাগান, এ বাগানের ঠিকানা বিনোদিনী কেমন করিয়া জানিল ।

বাড়ি বন্ধ ছিল । হাঁকাহাঁকি করিতে বৃদ্ধ বৃন্দক বাহির হইয়া আসিল । সে কহিল, “বাড়িওয়ালা ধনী, অবিক দূরে থাকেন না—তাঁহার অসুস্থতা লইয়া আসিলেই এ বাড়িতে বাস করিতে দিতে পারি ।”

বিনোদিনী মহেন্দ্রের মুখের দিকে এক বার চাহিল । মহেন্দ্র এই মনোরম বাড়িটি দেখিয়া লুপ্ত হইয়াছিল ; দীর্ঘকাল পরে কিছুদিন স্থিতির সম্ভাবনায় সে প্রফুল্ল হইল ; বিনোদিনীকে কহিল, “তবে চলো, সেই ধর্মীর গুণানে যাই, তুমি বাহিরে গাড়িতে অপেক্ষা করিবে, আমি ভিতরে গিয়া ভাড়া ঠিক করিয়া আসিব ।”

বিনোদিনী কহিল, “আমি আর ঘুরিতে পারিব না—তুমি যাও, আমি ততক্ষণ এখানে বিশ্রাম করি । ভয়ের কোনো কারণ দেখি না ।”

মহেন্দ্র গাড়ি লইয়া চলিয়া গেল । বিনোদিনী বৃদ্ধা ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া তাহার ছেলেপুলের কথা জিজ্ঞাসা করিল, তাহার কে, কোথায় চাকরি করে, তাহার নেয়েদের কোথায় বিবাহ হইয়াছে । তাহার স্বীয় মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া করুণ স্বরে কহিল, “আহা, তোনার তো বড়ো কষ্ট । এই বয়সে তুমি সংসারে একলা পড়িয়া গেছ । তোমাকে লেখিবার কেহ নাই !”

তাহার পরে কথায় কথায় বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিল, “বিহারীদাস এখানে ছিলেন না ?”

বৃদ্ধ কহিল, “হাঁ, কিছুদিন ছিলেন তো বটে । নাথি কি তাঁহাকে ডেনেন ।”

বিনোদিনী কহিল, “তিনি আনন্দের আত্মীয় হন ।”

বিনোদিনী বুকের কাছে বিহারীর বিবরণ ও বর্ণনা যাচাই করে, তাহাতে আর মনে কোনো সন্দেহ রহিল না। বুড়াকে দিয়া ঘর খুঁটাইয়া কোন ঘরে বিহারী ভইত, কোন ঘর তাহার বসিবার ছিল, তাহা সবই জানিয়া লইল। তাহার যাওয়াত পর হইতে ঘরগুলি যে বন্ধ ছিল তাহাতে মনে হইল, যেন দেখানে অদৃশ্য বিহারীর সন্ধান সমস্ত ঘর ভরিয়া জমা হইয়া আছে, তাওয়ায় যেন তাঁরা উড়াইয়া লটয়া যাঁইতে পারে নাই। বিনোদিনী তাহা জানের মধ্যে দ্রুত পূর্ণ করিয়া গ্রহণ করিল, বুক বাতালে সর্বাপেক্ষে স্পর্শ করিল। কিন্তু বিহারী যে কোথায় গেছে, সে সন্ধান পাওয়া গেল না। হয়তো সে কিরিতেও পারে—কিন্তু কিছুই জানা নাই। বুড় তাহার প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়া আশিয়া বসিলে, বিনোদিনীকে এরূপ আশ্বাস দিল।

আগাম ভাড়া দিয়া আসের অচমতি লটয়া মহেশ্বর কিরিয়া আসিল।

৫১

হিমালয়পথর যে যমুনাকে তুষারকৃত অক্ষয় স্রসখারা নিতেছে, কত কালের কবিতা মিলিয়া গেই যমুনার মধ্যে যে কবিতায়োত জালিয়াছেন তাহাও অক্ষয়। ইহার কলঙ্গনির মধ্যে কত বিচিত্র চন্দ্র স্পন্দিত এবং ইহার তরঙ্গলীলায় কত কালের পুলাফোঙ্কসিত ভাবাবেগ উদ্বেগিত হইয়া উঠিতেছে।

এদোনে সেই যমুনাতীরে মহেশ্বর আসিয়া বসন বসিল তখন ঘনীভূত প্রেমের আবেশ তাহার মুখিতে, তাহার নিবাসে, তাহার নিদ্রায়, তাহার অস্তিত্বের মধ্যে প্রগাঢ় মোহমগ্নপ্রবাহ সঞ্চার করিয়া দিল। আকাশে যুধাভক্তিরপেয় বর্ণনীলা বেলনার মূর্ছনায় আলোককৃত সংসীতে সংসৃত হইয়া উঠিল।

বিশীর্ণ নির্জন শালুহাটে বিচিত্র বর্ণকুটাম্ব জিন দীরে দীরে অবদান

হইয়া গেল। মহেন্দ্র চক্ষু অর্ধেক মূদ্রিত করিয়া কাব্যলোক হইতে গোখর-
খুলি-জালের মধ্যে বৃন্দাবনের খেছদের গোষ্ঠে প্রত্যাবর্তনের হাথারব
ওনিতে পাইল।

বর্গার মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। অপরিচিত স্থানের
অন্ধকার কেবল কৃষ্ণবর্ণের আবরণমাত্র নহে, তাহা বিচিত্র রহস্তে
পরিপূর্ণ। তাহার মধ্য দিয়া যেটুকু আভা যেটুকু আকৃতি দেখিতে পাওয়া
যায় তাহা অজ্ঞাত অহুচ্চারিত ভাষার কথা কহে। পরপারবর্তী বালুকার
অখুঁট পাণ্ডুরতা, নিম্নরঙ্গ জলের মসীকৃষ্ণ কালিমা, বাগানে ঘনপল্লব
বিপুল নিম্ববৃক্ষের পুঞ্জীভূত শুদ্ধতা, তরুহীন ম্লান ধূসর তটের বন্ধিন রেখা,
সমস্ত সেই আঘাট-সম্ভার অন্ধকারে বিনিশ্চ অনিদিষ্ট অপরিখুঁট আকারে
মিলিত হইয়া মহেন্দ্রকে চারি দিকে বেঁটন করিয়া ধরিল।

পদাবলীর বর্ষাভিসার মহেন্দ্রের মনে পড়িল। অভিসারিকা বাহির
হইয়াছে। যমুনার ওই তটপ্রান্তে সে একাকিনী আসিয়া পাড়াইয়াছে।
পার হইবে কেমন করিয়া। ‘ওগো, পার করো গো, পার করো’—
মহেন্দ্রের নুকের মধ্যে এই ডাক আসিয়া পৌছিতেছে, ‘ওগো, পার করো।’

নদীর পরপারে অন্ধকারে সেই অভিসারিণী বহু দূরে; তবু মহেন্দ্র
তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল। তাহার কাল নাই, তাহার বয়স নাই, সে
চিরদমন গোপবালা; কিন্তু তবু মহেন্দ্র তাহাকে চিনিল—সে এই
দিনোদিনী। সমস্ত বিরহ, সমস্ত বেদনা, সমস্ত যৌবনভার লইয়া তখনকার
কাল হইতে সে অভিসারে যাত্রা করিয়া, কত গান কত ছন্দের মধ্য দিয়া
এখনকার কালের ভীবে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে—আজিকার এই জনহীন
যমুনাতটের উপরকার আকাশে তাহারই কর্ণধর শুনা যাইতেছে। ‘ওগো,
পার করো গো।’ পেয়ানৌকার ছত্র সে এই অন্ধকারে আর কত কাল
এমন একলা পাড়াইয়া থাকিবে—‘ওগো, পার করো।’

নেসের এক প্রান্ত অসম্পাদিত হইয়া কৃষ্ণপঙ্খের তৃতীয়ার চাঁদ দেখা

ছিল। জ্যোৎস্নার মায়ায় সেই নদী ও নদীতীর, সেই আকাশ ও আকাশের সীমান্ত, পৃথিবীর অনেক বাহিরে চলিয়া গেল। মর্তের কোনো বন্ধন রহিল না। কালের সমস্ত ধারাবাহিকতা ছিঁড়িয়া গেল—অতীত-কালের সমস্ত ইতিহাস লুপ্ত, ভবিষ্যৎকালের সমস্ত কল্যাণ দৃষ্টিহীন; শুধু এই বসন্তসারাদ্বারা বিতর্কিত বর্তমানটুকু, যখনই এ যমুনাতটের মধ্যে মহেশ্বর ও বিনোদিনীকে লইয়া বিবাহবিধানের বাহিরে চিরস্থায়ী।

মহেশ্বর মাতাল হইয়া উঠিল। বিনোদিনী যে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলে, জ্যোৎস্নারাত্রির এই নির্জন বর্গধণ্ডকে লক্ষ্যরূপে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিলে না, ইহা সে কখনো করিতে পারিল না। তৎকথ্য উঠিয়া সে বিনোদিনীকে খুঁজিতে বাড়ির দিকে চলিয়া গেল।

শব্দগুহে আসিয়া দেখিল, ঘর ফুলের গছে পূর্ণ। উন্মুক্ত জানলা-দরজা দিয়া জ্যোৎস্নার আলো শুভ্র বিজ্ঞানার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। বিনোদিনী বাগান হইতে ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া খোঁপাছ পরিচোছে, গলায় পরিচোছে, কটিতে বাঁধিয়াছে—ফুলে কুচিত হইয়া সে বসন্তকালের পুষ্পভাবলুপ্তিত লতাটির চার জ্যোৎস্নার বিজ্ঞানার উপরে পড়িয়া আছে।

মহেশ্বরের মোহ দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। সে অসহন কর্তে বলিয়া উঠিল, “বিনোদ, আমি যমুনার পারে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিলাম, তুমি যে এখানে অপেক্ষা করিয়া আছ, আকাশের ঠাণ্ডা আনাকে সেই সংসার ছিল, তাই আমি চলিয়া আসিলাম।”

এই কথা বলিয়া মহেশ্বর বিজ্ঞানার বসিবার ঘর ছাড়িয়া দিল।

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি চকিত হইয়া উঠিল। ক্ষিপণ্য প্রদর্শিত করিয়া বলিল, “হাও হাও, তুমি এ বিজ্ঞানার বসিয়া না।”

কথাপালের নৌকা চড়ায় ঠেকিয়া গেল—মহেশ্বর দ্রষ্ট হইয়া পাড়াইল। অনেক কণ্ঠস্বরের দ্বন্দ্বিতা কথা বাহির হইল না। পাছে মহেশ্বর নিশেপ না মানে, এইজন্য বিনোদিনী স্বহস্ত ছাড়িয়া আসিয়া পাড়াইল।

মহেন্দ্ৰ কহিল, “তবে তুমি কাহার জন্ত সাজিয়াছ। কাহার জন্ত অপেক্ষা করিতেছ।”

বিনোদিনী আপনার বুক চাপিয়া ধরিয়া কহিল, “মাহার জন্ত সাজিয়াছি, সে আমার অন্তরের ভিতরে আছে।”

মহেন্দ্ৰ কহিল, “সে কে। সে বিহারী?”

বিনোদিনী কহিল, “তাহার নাম তুমি মুখে উচ্চারণ করিয়ো না।”

মহেন্দ্ৰ। তাহারই জন্ত তুমি পশ্চিমে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ?

বিনোদিনী। তাহারই জন্ত।

মহেন্দ্ৰ। তাহারই জন্ত তুমি এখানে অপেক্ষা করিয়া আছ?

বিনোদিনী। তাহারই জন্ত।

মহেন্দ্ৰ। তাহার ঠিকানা জানিয়াছ?

বিনোদিনী। জানি না, কিন্তু যেমন করিয়া হউক জানিবই।

মহেন্দ্ৰ। কোনোমতেই জানিতে দিব না।

বিনোদিনী। না যদি জানিতে দাও, আমার হৃদয় হইতে তাহাকে কোনোমতেই বাহির করিতে পারিবে না।

এই বলিয়া বিনোদিনী চোপ বুজিয়া আপনার হৃদয়ের মধ্যে বিহারীকে এক বার অহুভব করিয়া লইল।

মহেন্দ্ৰ সেই পুষ্পাভরণা বিরহবিধুরমূর্তি বিনোদিনীর দ্বারা একই কালে প্রবলবেগে আকৃষ্ট ও প্রত্যাখ্যাত হইয়া হঠাৎ ভীষণ হইয়া উঠিল; হুঁট দহ করিয়া কহিল, “ছুরি দিয়া কাটিয়া তোনার বুকের ভিতর হইতে তাহাকে বাহির করিব।”

বিনোদিনী অবিস্মিত মুখে কহিল, “তোনার ভালোবাসার চেয়ে তোনার ছুরি আমার হৃদয়ে সহজে প্রবেশ করিবে।”

মহেন্দ্ৰ। তুমি আমাকে ভয় কর না কেন, এখানে তোনার মনক কে আছে।

বিনোদিনী। তুমি আমার বন্ধক আছে। তোমার নিজের কাছ
হইতে তুমি আমাকে বন্ধা করিবে।

মহেন্দ্র। এইটুকু শ্রদ্ধা, এইটুকু বিশ্বাস, এখনও বাকি আছে!

বিনোদিনী। তা না হইলে আমি আত্মহত্যা করিচা মরিচাম,
তোমার সঙ্গে বাহির হইতাম না।

মহেন্দ্র। কেন মরিগে না—এইটুকু বিশ্বাসের ঝগড়ি আমার গলায়
জড়াইয়া আমাকে বেশবেশায়েরে টানিয়া মারিতেচ কেন। তুমি মরিগে,
কত মঙ্গল হইত ডাবিয়া বেগো।

বিনোদিনী। তাহা আমি, কিম্ব বতসিন দিহারীর আশা আছে
ততদিন আমি মরিতে পারিব না।

মহেন্দ্র। বতসিন তুমি না মরিবে ততদিন আমার প্রত্যাশাও মরিবে
না, আমিও নিষ্কৃতি পাইব না। আমি আম হইতে ভগবানের কাছে
স্বার্থসংকল্পে তোমার মৃত্যু কামনা করি। তুমি আমারও হইয়ো না,
তুমি দিহারীরও হইয়ো না। তুমি যাও। আমাকে ছুটি পাও। আমার
না কাঁদিতেন, আমার স্বামী কাঁদিতেন—ঐহালের অংশ আমাকে হুও
হইতে সম্মত করিতেছে। তুমি না মরিগে, তুমি আমার এবং পুণ্ডরীক
সকলের আশার অতীত না হইলে, আমি ঐহালের চোখের চাপ
মুজাইবার অবসর পাইব না।

এই বলিয়া মহেন্দ্র ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। বিনোদিনী একলা
পড়িয়া আগমনার চারি দিকে যে মোহমাল রচনা করিতেছিল তাহা
সমস্ত ভিঁড়িয়া দিয়া গেল। চূপ করিয়া শাড়াইয়া বিনোদিনী বাহিরের
দিকে চাহিয়া রহিল—আকাশ-ভরা সোণাশ্রী শূন্য করিয়া দিয়া তাহার
সমস্ত স্বপ্নাঙ্গ কোথায় উড়িয়া গেছে। সেই কেন্দ্র-করা বাগান, তাহার
পরে বালুকাতীর, তাহার পরে নদীর কালো অঙ্গ, তাহার পরে ও পায়ে
অশ্রুত্যা, সবই যেন একখানা সূচী মালা কাগজের উপরে পেন্সিলে-

আকা একটি চিত্রমাত্র—সমস্তই নীরস এবং নিরর্থক ।

মহেন্দ্রকে বিনোদিনী কিরূপ প্রবলবেগে আকর্ষণ করিয়াছে, প্রচণ্ড
ঝড়ের মতো কিরূপ সমস্ত শিকড়-মুগ্ধ তাহাকে উৎপাটিত করিয়াছে,
যাহ তাহা অসম্ভব করিয়া তাহার হৃদয় আরও যেন অশান্ত হইয়া উঠিল।
তাহার তো এই-সমস্ত শক্তিই বহিয়াছে, তবে কেন বিহারী পূর্ণিমা
রাত্রির উদ্বেলিত সমুদ্রের জায় তাহার সম্মুখে আসিয়া ভাঙিয়া পড়ে না।
কেন একটা অনাবশ্যক ভালোবাসার প্রবল অভিঘাত প্রত্যহ তাহার
ধ্যানেব মধ্যে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িতেছে। আব-একটা আগন্তুক রোদন
বারবার আসিয়া তাহার অহরেব রোদনকে কেন পরিপূর্ণ অবকাশ
দিতেছে না। এই-যে একটা প্রকাণ্ড আন্দোলনকে সে জাগাটয়া
ভুলিয়াছে, ইহাকে লইয়া সমস্ত জীবন সে কী করিবে। এখন ইহাকে
শাস্ত করিবে কী উপায়ে।

আজ যে-সমস্ত ফুলের মালায় সে নিজেকে ভূষিত করিয়াছিল তাহাদ্বারা
উপরে মহেন্দ্রের মুগ্ধ দৃষ্টি পড়িয়াছিল জানিয়া সমস্ত টানিয়া ছিঁড়িয়া
বেলিল। তাহার সমস্ত শক্তি বৃথা, চেষ্টা বৃথা, জীবন বৃথা—এই কানন,
এই জ্যোৎস্না, এই ঘনুনাভট, এই অপূর্বরম্য পৃথিবী, সমস্তই বৃথা।

এত ব্যর্থতা, তবু যে যেখানে সে সেপানেই দাঁড়াইয়া আছে—ভ্রগতে
বিছুরই লেশমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। তবু কাল খুব উঠিবে এবং সংসার
তাহার কুহতম কাজটুকু পর্যন্ত ভুলিবে না—এবং অবিস্মিত বিহারী
যেন দূরে ছিল তেমনি দূরে থাকিয়া ব্রাহ্মণ-বাসকে তাহার বোমো-
দনের নূতন পাঠ অভ্যাস করাইবে।

বিনোদিনীর চক্ষু মাটিয়া অশ্রু বাহির হইয়া পড়িল। সে তাহার
সমস্ত বল ■ আকর্ষণ লইয়া কোন্ পাথরকে ঠেলিতেছে। তাহার হৃদয়
মুগ্ধ হাসিয়া গেল, কিন্তু তাহার অদৃষ্ট স্বচ্যগ্রপরিমাণ সদিয়া বসিল না।

মহেন্দ্ৰ তখনই শয্যাভাগ করিয়া উঠিয়া মূৰ ধুইয়া বিনোদিনীর সহিত দেখা করিতে গেল। গিয়া দেখিল, তাহার ঘর বন্ধ। ঘাটে আঘাত দিয়া কহিল, “ঘুমাইতেছ কি।”

বিনোদিনী কহিল, “না। তুমি এখন বাও।”

মহেন্দ্ৰ কহিল, “তোমার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে; আমি বেশিজন থাকিব না।”

বিনোদিনী কহিল, “কথা আর আমি উনিতে পারি না—তুমি বাও, আমাকে আর বিরক্ত করিয়ো না, আমাকে একলা থাকিতে দাও।”

অন্ত কোনো সময় হইলে এই প্রত্যাখ্যানে মহেন্দ্ৰের আবেগ আরও বাড়িয়া উঠিত। কিন্তু আজ তাহার অত্যন্ত দুঃখাবস্থা হইল। সে ভাবিল, ‘এই সামান্য এক স্বীকৃতির কাছে আমি নিজেকে এতই হীন করিয়াছি যে, আমাকে যখন-তখন এমনতরো অবজ্ঞাভাৱে দূর করিয়া দিবার অধিকার ইহার ভগ্নিরাছে। সে অধিকার ইহার স্বাভাবিক অধিকার নহে। আমিই তাহা ইহাকে দিয়া ইহার গর্ব-এমন অস্বাভাবিক বাড়াইয়া দিয়াছি।’ এই লাহনার পরে মহেন্দ্ৰ নিজের মধ্যে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বত্ব করিবার চেষ্টা করিল। সে কহিল, ‘যদি ভয়ী হইব; ইহার বচন আমি ছেদন করিয়া দিয়া চলিয়া যাইব।’

আহায়াসে মহেন্দ্ৰ টাকা উঠাইয়া মানিবার চেষ্টা ব্যাৰ্কে চলিয়া গেল। টাকা উঠাইয়া আসার ভয় ও দার ভয় কিছু ভালো মতন তিনি কিনিবে বলিয়া সে এলাহাবাদের লোকানে ঘুরিতে লাগিল।

আবার একবার বিনোদিনীর ঘাটে আঘাত পড়িল। প্রথমে সে বিবদ্ধ হইয়া কোনো উত্তর করিল না; তাহার পরে আবার দার দার আঘাত করিতেই বিনোদিনী অসহ্য বোনে সবলে ঘর খুলিয়া কহিল, “কেন তুমি আমাকে দার দার বিরক্ত করিতে আগিতেছ।”

কথা শেষ না হইতেই বিনোদিনী দেখিল, সিংহাণী পাঠাইয়া আছে।

যবের মধ্যে মহেন্দ্র আছে কি না, দেখিবার জন্য বিহারী এক বাব ভিতরে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, শয়নঘরে শুক ফুল এবং ছিন্ন মালা ছড়ানো। তাহার মন নিমেষের মধ্যেই প্রবলবেগে বিমূখ হইয়া গেল। বিহারী যখন দূরে ছিল তখন বিনোদিনীর জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহজনক চিত্র যে তাহার মনে উদয় হইয়া নাই তাহা নহে, কিন্তু কল্পনাব লীলা সে চিত্রকে ঢাকিয়াও একটি উজ্জ্বল নোহিনীচ্ছবি পাড় করাইয়া- ছিল। বিহারী যখন বাগানে প্রবেশ করিতেছিল তখন তাহার হৃৎকম্প হইতেছিল—পাছে কল্পনাপ্রতিমার অকস্মাৎ আঘাত লাগে এইজন্য তাহার চিত্ত সংকুচিত হইতেছিল। বিহারী বিনোদিনীর শয়নগৃহের দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইবানাত্রে সেই আঘাতটাই লাগিল।

দূরে থাকিয়া বিহারী এক সময় মনে করিয়াছিল, সে আপনার প্রেমাভিষেকে বিনোদিনীর জীবনের সমস্ত পবিত্রতা অন্যায়সে শোত করিয়া লইতে পারিবে। কাছে আসিয়া দেখিল, তাহা সহ্য নহে ; মনের মধ্যে কল্পনার বেদনা আগিল কই। হঠাৎ ঘৃণার তরঙ্গ উঠিয়া তাহাকে অভিহৃত করিয়া দিল। বিনোদিনীকে বিহারী অত্যন্ত মলিন দেখিল।

এক মুহূর্তেই বিহারী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া “মহেন্দ্র” “মহেন্দ্র” করিয়া ডাকিল।

এই অপমান পাইয়া বিনোদিনী নম্র মুক্ত স্বরে কহিল, “মহেন্দ্র নাই, মহেন্দ্র শহরে গেছে।”

বিহারী চলিয়া যাইতে উদ্বৃত্ত হইলে বিনোদিনী কহিল, “বিহারী-ঠাহুরপো, তোমার পায়ে ধরি, একটুখানি তোমাকে বসিতে হইবে।”

বিহারী কোনো দিনতি শুনিবে না মনে করিয়াছিল, একেবারে এই দ্বার দূর হইতে এখনই নিজেই দূরে লইয়া যাইবে স্থির করিয়াছিল, কিন্তু বিনোদিনীর করুণ অশ্রুদধর শুনিবানাত্রে করুণাকলের চণ্ড তাহার পা যেন আঁদ উঠিল না।

বিনোদিনী কহিল, “আমি যদি তুমি বিবুধ হইয়া এমন করিয়া চলিয়া যাও, তবে আমি তোমারই শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি মরিব।”

বিহারী তখন ক্রিষ্ণা পাড়াইয়া কহিল, “বিনোদিনী, তোমার জীবনের সঙ্গে আনাকে তুমি জড়াইবার চেষ্টা করিতেছ কেন। আমি তোমার কী করিয়াছি। আমি তো কখনও তোমার পথে পাড়াই নাই, তোমার স্বপ্নরূপে হস্তক্ষেপ করি নাই।”

বিনোদিনী কহিল, “তুমি আমার কতখানি অধিকার করিয়াছ তাহা একবার তোমাকে জানাইয়াছি—তুমি বিশ্বাস কর নাই। তবু আন আমার তোমার বিদ্রাবের মুখে সেই কথাই জানাইতেছি। তুমি তো আমাকে না বলিয়া জানাইবার, লাজ করিয়া জানাইবার, সময় পাও নাই। তুমি আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়াছ, তবু আমি তোমার পা ধরিয়া বলিতেছি, আমি তোমাকে—”

বিহারী বাধা দিয়া কহিল, “সে কথা আর বলিয়ে না, মুখে আনিয়ো না। সে কথা বিশ্বাস করিবার জো নাই।”

বিনোদিনী। সে কথা ইতর লোকে বিশ্বাস করিতে পারে না, কিন্তু তুমি করিলে। সেইজন্য এক বার আমি তোমাকে বলিতে বলিতেছি।

বিহারী। আমি বিশ্বাস করি বা না করি, তাহাতে কী আসে যায়। তোমার জীবন যেমন চলিতেছে তেমনি চলিলে তো।

বিনোদিনী। আমি আনি তোমার ইহাতে কিছুই আগিয়ে-যাইলে না। আমার ভাগ্য এমন যে, তোমার সম্মানগ্রহণ করিয়া তোমার পাশে পাড়াইবার আমার কোনো উপায় নাই। চিরকাল হোনা হইলে আমাকে সুখেই থাকিতে হইবে। আমার বন হোনার কাছে এই পাবিটুকু বেখান ছাড়িয়ে পারে না যে, আমি দেখানে থাকি আমাকে তুমি একটুকু নাশ্বরের সঙ্গে তুলিলে। আমি আনি, আমার উপরে তোমার স্নেহ একটু শ্রদ্ধা অপ্রিয়াছিল, সেইটুকু আমার এতদূর সঞ্চয় করিয়া রাখি।

সেইজন্য আমার সব কথা তোমাকে শুনিতে হইবে। আমি হাতজোড়
করিয়া বলিতেছি ঠাকুরপো, একটুখানি বোলো।

“আচ্ছা চলো” বলিয়া বিহারী এখান হইতে অল্প কোথাও যাইতে
উচ্ছত হইল।

বিনোদিনী কহিল, “ঠাকুরপো, যাহা মনে করিতেছ তাহা নহে।
এ যবে কোনো কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই। তুমি এই ঘরে একদিন শয়ন
করিয়াছিলে—এ ঘর তোমার জন্মই উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছি, ওই
ফুলগুলা তোমারই পূজা করিয়া আত্ম শুকাইয়া পড়িয়া আছে। এই
ঘরেই তোমাকে বসিতে হইবে।”

শুনিয়া বিহারীর চিন্তে পুলকের সঞ্চার হইল। ঘরের মধ্যে সে প্রবেশ
করিল। বিনোদিনী দুই হাত দিয়া তাহাকে থাট দেখাইয়া দিল।
বিহারী থাটে গিয়া বসিল, বিনোদিনী ভূমিতলে তাহার পায়ে কাচ
উপবেশন করিল। বিহারী ব্যত হইয়া উঠিতেই বিনোদিনী কহিল,
“ঠাকুরপো, তুমি বোলো। আমার নাখা থাও, উঠিয়ো না। আমি
তোমার পায়ে কাচ বসিবারও যোগ্য নই, তুমি দয়া করিয়াই সেখানে
স্থান দিয়াছ। দূরে থাকিলেও এই অধিকাবটুকু আমি রাখিব।”

এই বলিয়া বিনোদিনী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পরে
হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া কহিল, “তোমার পাঙ্গা হইয়াছে ঠাকুরপো?”

বিহারী কহিল, “শেষন হইতে খাইয়া আসিয়াছি।”

বিনোদিনী। আমি গ্রাম হইতে তোমাকে যে চিঠিখানি লিখিয়া-
ছিলাম, তাহা খুলিয়া, কোনো জবাব না দিয়া, নহেছের হাত দিয়া
আমাকে ফিরাইয়া পাঠাইলে কেন।

বিহারী। সে চিঠি তো আমি পাই নাই।

বিনোদিনী। এবারে নহেছের সঙ্গে বলিকাতায় কি তোমার লেপা
হইয়াছিল।

বিহারী । তোমাকে গ্রামে পৌছাইয়া দিবার পরদিন মহেশ্বরের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, তাহার পরেই আমি পশ্চিমে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম, তাহার সঙ্গে আর দেখা হয় নাই ।

বিনোদিনী । তাহার পূর্বে আর-এক দিন আমার চিঠি পড়িয়া উত্তর না দিয়া ফিরাইয়া পাঠাইয়াছিলেন ?

বিহারী । না, এমন কখনোই হয় নাই ।

বিনোদিনী ব্যস্তিত হইয়া বলিয়া রহিল । তাহার পরে দীর্ঘনিবাস ফেলিয়া করিল, “সমস্ত বুঝিলাম । এখন আমার সব কথা তোমাকে বলি । যদি বিশ্বাস কর তো ভাগ্য মানিব, যদি না কর তো তোমাকে সোয় দিল না ; আমাকে বিশ্বাস করা কঠিন ।”

বিহারীর চক্ষু তখন আর্দ্র হইয়া গেছে । এই শুদ্ধিভাষনটা বিনোদিনীর পূজাকে সে কোনোনতেই অপমান করিতে পারিল না । সে কহিল, “বোণান, তোমাকে কোনো কথাই বলিতে হইবে না, কিছু না । তুমি আমি তোমাকে বিশ্বাস করিতেছি । আমি তোমায় ভুগা করিতে পারি না । তুমি আর-একটি কথাও বলিয়ে না ।”

তুমি বিনোদিনীর চোখ দিয়া জন পড়িতে লাগিল, সে বিহারীর পায়ের ধূলা মাখায় তুমিয়া লইল । কহিল, “সব কথা না বলিলে আমি বাচিব না । একটু দৈব ধরিয়া শুনিতে হইবে—তুমি আমাকে যে আশ্রয় করিয়াছিলে, তাহাই আমি নিরোপায় করিয়া লইলাম । যদিও তুমি আমাকে পরহীনুও লেখ নাই, তবু আমি আমার সেই গ্রামে সোজব উপহাস ও নিন্দা সহ করিয়া ভীবন কাটাষ্টয়া দিলাম, তোমার সেরে পরিবারে তোমার শাশুকে আমি গ্রহণ করিলাম—কিন্তু বিবাহ তাহাতেও বিবাহ হইলেন । আমি যে পাশ আগাইয়া দুলিয়াছি তাহা আমাকে বিশ্বাসনেও চিকিতে দিল না । মহেশ্ব গ্রামে আসিয়া, আমার খবর খাতি আসিয়া, আমাকে সবলের সহৃদে লাভিত করিল । সে গ্রামে

আর আমার স্থান হইল না। দ্বিতীয় বার তোমার আদেশের ভক্ত তোমাকে অনেক খুঁজিলাম, কোনোমতেই তোমাকে পাইলাম না, মহেন্দ্র আমার খোলা চিঠি তোমার ঘর হইতে ফিরাইয়া লইয়া আমাকে প্রতারণা করিল। বুঝিলাম, তুমি আমাকে একেবারে পবিত্যাগ করিয়াছ। ইহার পরে আমি একেবারেই নষ্ট হইতে পারিতাম—কিন্তু তোমার কী গুণ আছে, তুমি দূরে থাকিয়াও রক্ষা করিতে পার—তোমাকে মনে স্থান দিয়াছি বলিয়াই আমি পবিত্র হইয়াছি—একদিন তুমি আমাকে দূর করিয়া দিয়া নিজের যে পরিচয় দিয়াছ তোমার সেই কঠিন পরিচয়, কঠিন সোনার মতো, কঠিন মানিকের মতো, আমার মনের মধ্যে রহিয়াছে, আমাকে মহামূল্য করিয়াছে। দেব, এই তোমার চরণ ছুঁইয়া বলিতেছি, সে মূল্য নষ্ট হয় নাই।”

বিহারী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বিনোদিনীও ‘মাব কোনো কথা কহিল না। অপরাহ্নের আলোক প্রতিফলনে ম্লান হইয়া আসিতে লাগিল। এমন সময় মহেন্দ্র ঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া বিহারীকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। বিনোদিনীর প্রতি তাহার যে-একটা ঐদামীয় ক্রটিতেছিল ঈর্ষার তাড়নায় তাহা দূর হইবার উপক্রম হইল। বিনোদিনী বিহারীর পাদের কাছে খুঁট হইয়া বসিয়া ‘মাছে দেখিয়া, প্রত্যাখ্যাত মহেন্দ্রের গর্বে মাঘাত লাগিল। বিনোদিনীর সহিত বিহারীর চিঠিপত্র দ্বারা এই দিন ‘খটয়াছে, ইহাতে তাহার আর সন্দেহ রহিল না। এতদিন বিহারী বিমুগ্ধ হইয়া ছিল, এখন সে যদি নিজে আসিয়া ধরা দেয় তবে বিনোদিনীকে ঠেকাইবে কে। মহেন্দ্র বিনোদিনীকে ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু আর-কাহারও হাতে ত্যাগ করিতে পারে না তাহা আত্ম বিহারীকে দেখিয়া বুঝিতে পারিল।

বার্থরোমে তাঁর বিদ্রোহের খবর মহেন্দ্র বিনোদিনীকে কহিল, “এখন তবে রক্তহুনিতে মহেন্দ্রের প্রস্থান, বিহারীর প্রবেশ। দৃষ্টি বৃন্দ—

হাততালি দিতে ছেঁড়া হইতেছে। কিন্তু আশা করি, এই শেষ নয়, ইহার পরে আর-কিছুই ভালো লাগিলে না।”

বিনোদিনীর মুখ বক্সিত হইয়া উঠিল। মহেন্দ্রের আশ্রয় লইতে এখন তাহাকে বাধ্য হইতে হইয়াছে, তখন এ অপমানের উত্তর তাহার আর কিছুই নাই—ব্যাকুল চক্ৰিতে সে কেবল একবার বিহারীর মুখের দিকে চাহিল।

বিহারী পাট হইতে উঠিল; অঘমর হইয়া কহিল, “মহেন্দ্র, তুমি বিনোদিনীকে কাপুবদের মতো অপমান করিও না—তোমার তত্ত্বা যদি তোমাকে নিষেধ না করে, তোমাকে নিষেধ করিবার অধিকার আমার আছে।”

মহেন্দ্র চাসিয়া কহিল, “ইহারই মধ্যে অধিকার দাব্য হইয়া গেছে! আজ তোমার নুতন নামকরণ করা যাক—বিনোববিহারী।”

বিহারী অপমানের নামা চক্ৰিতে লেখিয়া মহেন্দ্রের হাত চাসিয়া ধরিল। কহিল, “মহেন্দ্র, বিনোদিনীকে আমি বিবাহ করিব, তোমাকে ঘানাইলাম, অতএব এখন হইতে সংবত ভাবে কথা কও।”

তিনিয়া মহেন্দ্র বিশ্বাসে নিতক হইয়া গেল, একং বিনোদিনী চমকিয়া উঠিল—কুকের মতো তাহার সমস্ত রক্ত হোলিগাড় করিতে লাগিল।

বিহারী কহিল, “তোমাকে আর-একটি পবন দিবার আছে—তোমার মাতা কল্যাণদ্বারা শ্রদান, তাহার ব্যাচিয়ার কোনো আশা নাই। আমি আর দানের গাড়িতেই বাইব—বিনোদিনীও আমার সঙ্গে যিহিলে।”

বিনোদিনী চমকিয়া উঠিল; কহিল, “নিসিয়ার অগ্রহ?”

বিহারী কহিল, “সাদিব্য অগ্রহ নহে। কখন কী হয় তো দায়না।”

মহেন্দ্র তখন আর-কোনো কথা না বলিয়া ঘর হইতে বারিষ হইয়া গেল।

বিনোদিনী তখন বিহারীকে বলিল, “যে কথা তুমি বলিলে তাহা

তোমার মুখ দিয়া কেমন করিয়া বাহির হইল। এ কি ঠাট্টা ?”

বিহারী কহিল, “না, আমি সত্যই বলিয়াছি, তোমাকে আমি বিবাহ করিব।”

বিনোদিনী। এই পাগিষ্ঠাকে উদ্ধাব করিবান মজ ?

বিহারী। না। আমি তোমাকে ভালোবাসি বলিয়া, শ্রদ্ধা করি বলিয়া।

বিনোদিনী। এই আমাব শেষ পুরস্কার হইয়াছে। এই যেটুকু স্বীকার করিলে, ইহার বেশি আর আমি কিছুই চাই না। পাইলেও তাহা থাকিবে না, ধর্ম বধনও তাহা সহ্য করিবেন না।

বিহারী। কেন করিবেন না।

বিনোদিনী। ছি ছি, এ কথা মনে করিতে লজ্জা হয়। আমি বিধবা, আমি নিমিত্তা, সমস্ত সমাজের কাছে আমি তোমাকে লালিত করিব, এ বধনও হইতেই পারে না। ছি ছি, এ কথা তুমি মুখে আনিয়ো না।

বিহারী। তুমি আমাকে ত্যাগ করিবে ?

বিনোদিনী। ত্যাগ করিবার অধিকার আমার নাই। তুমি গোপনে অনেকের অনেক ভালো কর—তোমার একটা-কোনো প্রতের একটা-কিছু ভাব আমার উপর সমর্পণ করিও, তাহাই বহন করিয়া আমি নিঃশব্দে তোমার সেবিকা বলিয়া গণ্য করিব। কিন্তু ছি ছি, বিধবাকে তুমি বিবাহ করিবে। তোমার ঈর্ষ্যার্থে সব সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু আমি যদি এ কাজ করি, তোমাকে সমাজে নষ্ট করি, তবে ইহদ্বীপনে আমি আর নাখা তুলিতে পারিব না।

বিহারী। কিন্তু বিনোদিনী, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

বিনোদিনী। সেই ভালোবাসার অধিকারে আমি আর একদিনার স্মৃতি প্রকাশ করিব।

বলিয়া বিনোদিনী তুনিষ্ঠ হইয়া বিহারীর পরাঙ্গুলি চুষন করিল।

পাড়ের কাছে বসিয়া কহিল, “পরচন্দ্র তোমাকে পাইবার চেষ্টা আমি উপস্থাপন করিব—এ যত্নে আমার আর-কিছু আশা নাই, প্রাণ্য নাই। আমি অনেক দুঃখ দিয়াছি, অনেক দুঃখ পাইয়াছি, আমার অনেক শিখা হইয়াছে। সে শিখা যদি তুলিতাম, তবে আমি তোমাকে হীন করিয়া আরও হীন হইতাম। কিন্তু তুমি উচ্চ আচর বলিয়াই আত্ম আমি আমার মাথা তুলিতে পারিয়াছি—এ আশ্রয় আমি কুন্দিয়াং করিব না।”

বিহারী গম্ভীরমুখে হৃদয় করিয়া বহিল।

বিনোদিনী হাতছোঁক করিয়া কহিল, “হৃদয় করিয়া না—মান্যকে দিগাহ করিলে তুমি খুশী হইবে না, তোমার গৌরব বাইবে—আমিও সমস্ত গৌরব হারাষ্টব। তুমি চিরদিন নির্লিপ্ত, প্রসন্ন। আরও তুমি তাই থাকো—আমি মৃত্যু থাকিয়া তোমার কর্ম করি। তুমি প্রসন্ন হও, তুমি খুশী হও।”

৫০

মহেন্দ্র তাহার মাতার ঘরে প্রবেশ করিতে বাইতেছে, তখন আশা তাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, “এখন ও ঘরে যাউনো না।”

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, “কেন।”

আশা কহিল, “ডাক্তার বলিয়াছেন, হঠাৎ মাত্র মজা, প্রসঙ্গ হউক, চোখের হউক, একটা কোনো আঘাত লাগিলে বিপদ হইতে পারে।”

মহেন্দ্র কহিল, “আমি একবার আগে আগে তাহার মাথার শিরের কাছে গিয়া দেখিয়া আমি গে—তিনি তের পাউকেন না।”

আশা কহিল, “তিনি মজা অনেক চমকিতা উঠিয়াছেন, তুমি যত চুপিসেই তিনি তের পাউকেন।”

মহেন্দ্র। তবে, এখন তুমি কী করিতে চাও।

আশা। আগে বিহারী-মাতুলেরা আসিয়া একবার দেখিয়া যান—

তিনি যেরূপ পরামর্শ দিবেন তাহাই করিব ।

বলিতে বলিতে বিহারী আসিয়া পড়িল । আশা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল ।

বিহারী । বোঠান, ডাকিয়াছ ? না ভালো আছেন তো ?

আশা বিহারীকে দেখিয়া যেন নির্ভব পাইল । কহিল, “তুমি যাওয়ার পর হইতে না যেন আরও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন । প্রথম দিন তোমাকে না দেখিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘বিহারী কোথায় গেল ।’ আমি বলিলাম, ‘তিনি বিশেষ কাজে গেছেন, বৃহস্পতিবারের মধ্যে ফিরিবার কথা আছে ।’ তাহার পর হইতে তিনি থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠিতেছেন । যুগে কিছুই বলেন না, কিন্তু ভিতবে ভিতবে যেন কাহার অপেক্ষা করিতেছেন । কাল তোমার টেলিগ্রাম পাইয়া জানাইলাম, আজ তুমি আসিবে । শুনিয়া তিনি আজ তোমার স্বস্তি বিশেষ করিয়া থাবার আয়োজন করিতে বলিয়াছেন । তুমি যাহা যাহা ভালোবাস সমস্ত আনিতে দিয়াছেন, সন্তুপের বারান্দায় বসিবার আয়োজন করাইয়াছেন, তিনি ঘর হইতে দেখাইয়া দিবেন । ডাক্তারের নিষেধ কিছুতেই শুনিলেন না । আমাকে এই খানিক পণ হইল ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, ‘বউমী, তুমি নিজের হাতে সমস্ত বসিবে, আমি আজ সন্মানে বসাইয়া বিহারীকে বাগদাইব ।’ ”

শুনিয়া বিহারীর চোখ ছল্ ছল্ করিয়া আসিল । জিজ্ঞাসা করিল, “না আছেন কেমন ।”

আশা কহিল, “তুমি একবার নিজে দেখিবে এসো—আমার তো বোধ হয়, ব্যানো আরও বাড়িয়াছে ।”

তখন বিহারী ঘরে প্রবেশ করিল । বহুদূর বাহিরে দাঁড়াইয়া আশ্চর্য হইয়া গেল । আশা বাড়ির কর্ণাট অনায়াসে গ্রহণ করিয়াছে—সে বহুদূরকে কেমন সহজে ঘরে ঢুকিতে নিষেধ করিল । না করিল গংকোচ,

না করিল অধিন। মহেশ্বের বস আত্ম কতখানি কমিয়া গেছে। সে
অপরায়ী, সে বাহিরে চূপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—নাও ঘরেও চুকিতে
পারিল না।

তাহার পরে ইহাও আশ্চর্য—বিহারীর সঙ্গে আশা কেমন অদৃষ্ট
ভাবে কথাবার্তা করিল। সমস্ত পরামর্শ তাহারই সঙ্গে। সেই আর
সংসারের একমাত্র স্বকল, সকলের ভরসা। তাহার গতিবিধি দেখে,
তাহার উপদেশেই সমস্ত চলিতেছে। নবোক্ত কিছুদিনের চতু যে আশাটি
জাড়িয়া চলিয়া গেছে, ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, সে আশা ঠিক আর
তেমনটি নাই।

বিহারী হয়ে চুকিতেই প্রায়শ্চন্দ্রী তাহার করণ চকু তাহার মুখের
নিকে রাখিয়া কহিলেন, “বিহারী, ফিরিয়া আসিলে ?”

বিহারী কহিল, “হাঁ না, ফিরিয়া আসিলাম।”

প্রায়শ্চন্দ্রী কহিলেন, “তোমার কাজ শেষ হইয়া গেছে ?”

যদিও তাহার মুখের নিকে একাগ্রভাবের চাহিলেন।

বিহারী প্রায়শ্চন্দ্রীকে “হাঁ না, কাজ বসন্তের হইয়াছে, এখন আমার
আর কোনো ভাবনা নাই” বলিয়া একবার বাহিরের দিকে চাহিল।

প্রায়শ্চন্দ্রী। আর বউমা তোমার স্ত্রী নিজেও হাতে খুঁদিলেন, আমি
এখন চাইতে দেখাইয়া দিব। ভাকার ব্যবস্থা করে—কিন্তু আর ব্যবস্থা
কিন্তু চকু বাহা। আমি কি একবার তোমার পাওয়ে দেখিয়া
দাঁড় না।

বিহারী কহিল, “ভাকারের ব্যবস্থা করিয়াও তো কোনো ফল
না—তুমি না দেখাইয়া দিলে চলিলে কেন। ফেলানো হইলে
তোমার বাস্তব ব্যবস্থা আমেরা ভালোবাসিতে বিবাহি—বিয়ে
তো পশ্চিমের ভালোটি খাইয়া অকলি দিয়া দেবে—আত্ম সে তোমার
বাস্তব কোল পাইলে দাঁড়াইয়া দাঁড়বে। আর আমেরা হই চাই ফেল-

বেলাকার মতো রেধারেধি করিয়া থাইব, তোমার বউমা অল্পে ফুলাইতে পারিলে হয়।”

যদিচ রাজলক্ষ্মী বুঝিয়াছিলেন, বিহারী মহেন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, তবু তাহার নাম শুনিতেই তাঁহার হৃদয় স্পন্দিত হইয়া নিবাস ক্ষণকালের জন্ত কঠিন হইয়া উঠিল।

সে ভাবটা কাটিয়া গেলে বিহারী কহিল, “পশ্চিমে গিয়া মহিনদার শরীর অনেকটা ভালো হইয়াছে। আজ পথের অনিঘনে সে একটু স্থান আছে, স্নানাহার কবিলেই সুধরাইয়া উঠিবে।”

রাজলক্ষ্মী তবু মহেন্দ্রের কথা কিছু বলিলেন না। তখন বিহারী কহিল, “মা, মহিনদা বাহিরেই দাঁড়াইয়া আছে, তুমি না ডাকিলে সে তো আসিতে পারিতেছে না।”

রাজলক্ষ্মী কিছু না বলিয়া দরজার দিকে চাহিলেন। চাহিতেই বিহারী ডাকিল, “মহিনদা, এসো।”

মহেন্দ্র ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিল। পাছে স্বপ্নিও হঠাৎ ব্রহ্ম হইয়া যায়, এই ভয়ে রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রের নুগের দিকে তখনই চাহিতে পারিলেন না। চক্ষু অধনিমীলিত করিলেন। মহেন্দ্র বিছানার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চমকিয়া উঠিল, তাহাকে কে যেন মাঝিল।

মহেন্দ্র মাতার পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া পা ধরিয়া পড়িয়া রহিল। বন্ধের স্পন্দনে রাজলক্ষ্মীর সমস্ত শরীর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে অন্নপূর্ণা ধীরে ধীরে কহিলেন, “দাদি, মহিনকে তুমি উঠিতে বলো, নহিলে ও উঠিবে না।”

রাজলক্ষ্মী কষ্টে বাক্যস্মরণ করিয়া কহিলেন, “মহিন, ওঠ।”

মহিনের নাম উচ্চারণ মাত্র অনেক দিন পরে তাঁহার চোখ দিয়া কঁদু কঁদু করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সেই অশ্রু পড়িয়া তাঁহার হৃদয়ের বেদনা লঘু হইয়া আসিল। তখন মহেন্দ্র উঠিয়া, মাটিতে হাঁটু গাড়িয়া,

পাটের উপর বুক গিয়া তাহার দ্বার পাশে আসিয়া বসিল। রানসদী
কটে পাশ ফিরাইয়া ছই হাতে মহেশ্বরের মাথা ধইয়া তাহার মস্তক আশ্রয়
করিলেন, তাহার লগাটি চুষন করিলেন।

মহেশ্বর রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, “না, তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি, আমাকে
মাপ করো।”

বক্ষ শাস্ত হইলে রানসদী কহিলেন, “ও কথা বলিস নে মহিন,
আমি তোকে মাপ না করিয়া কি বাঁচি। বউনা, বউনা কোথায় গেল।”

আশা পাশের ঘরে গিয়া তৈরি করিতেছিল—অমঙ্গল। তাহাকে
জানিয়া আনিলেন।

তখন রানসদী মহেশ্বরে কৃতজ্ঞ হইতে উঠিয়া তাহার খাটে বসিতে
ঈর্ষিত করিলেন। মহেশ্বর খাটে বসিলে রানসদী মহেশ্বরের পার্শ্বে স্থান-
নির্দেশ করিয়া আপাকে কহিলেন, “বউনা, এইখানে তুমি বোসো—আর
আমি একবার তোমাদের দু-মনকে একত্রে বসাইয়া দেখিব, তাহা হইলে
আমার সকল দুঃখ ঘুটিবে। বউনা, আমার কাছে আর লজ্জা কহিবে না,
আর মহিনের পরেও মনের মধ্যে কোনো অভিমান না রাখিয়া এক বার
এইখানে বোসো—আমার চোখ মুছাও না।”

তখন ঘোমটা-মাখার আশা লজ্জার দীর্ঘ দীর্ঘ আসিয়া কলিহংসকে
মহেশ্বরের পাশে গিয়া বসিল। রানসদী প্রবৃত্তে আশার জ্ঞান হার তুলিয়া
ধইয়া মহেশ্বরের জ্ঞান হাতে রাখিয়া চাপিয়া ধরিলেন। কহিলেন, “আমার
এই নাকে হোর হাতে গিয়া গেলাম মহিন—আমার এই কথাটি মনে
রাখিস, তুমি এমন লক্ষী আর কোথাও পাবি নে। নেতবউ, এসো,
ইহাদের একবার আশীর্বাদ করো—হোনার খুলো ইহাদের মরণ হউক।”

অমঙ্গল। সম্মুখে আসিয়া ঠাড়াইয়াই উঠের চোখের ঘরে হাহা
পরতুলি এংগে কহিল। অমঙ্গল। উঠের মস্তক চুষন করিয়া কহিলেন,
“তগবনে কোমলতরু বলাগে করত।”

রাজলক্ষ্মী । বিহারি, এসো বাবা, মহিনকে তুমি এক বার ক্ষমা করো ।

বিহারী তখনই মহেন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই মহেন্দ্র উঠিয়া দৃঢ় বাহ দ্বাৰা বিহারীকে বন্ধে টানিয়া লইয়া কোলাকুলি করিল ।

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “মহিন, আমি তোকে এই আশীর্বাদ করি—
শিশুকাল হইতে বিহারী তোব যেমন বন্ধু ছিল চিরকাল তেমনি বন্ধু
থাক—ইহার চেয়ে তোর সৌভাগ্য আর-কিছু হইতে পারে না ।”

এই বলিয়া রাজলক্ষ্মী অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া নিতরু হইলেন । বিহারী
একটা উত্তেজক ঔষধ তাঁহার মুখের কাছে আনিয়া ধরিতেই রাজলক্ষ্মী
হাত সরাইয়া দিয়া কহিলেন, “সাব ওষুধ না বাবা ! এখন আমি
ভগবানকে স্মরণ করি—তিনি আমাকে আমার সমস্ত সংসারদাহের শেষ
ওষুধ দিবেন । মহিন, তোরা একটুখানি বিশ্বাস কর্ণ গে । বউমা, এইবার
দ্রাঘা চড়াইয়া দাও ।”

সন্ধ্যাবেলায় বিহারী এবং মহেন্দ্র রাজলক্ষ্মীর বিছানার সম্মুখে নীচে
পাত পাড়িয়া থাইতে বসিল । আশাব উপর রাজলক্ষ্মী পরিবেষণের ভার
দিয়াছিলেন, সে পরিবেষণ করিতে লাগিল ।

মহেন্দ্রের বনের মধ্যে অশ্রু উন্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহার মুখে
স্নেহ উঠিতেছিল না । রাজলক্ষ্মী তাহাকে বার বার বলিতে লাগিলেন,
“মহিন, তুই কিছুই খাইতেছিস না কেন । ভালো করিয়া পা, আমি
দেখি ।”

বিহারী কহিল, “জানই তো মা, মহিনলা চিবকাল ওই বকম, কিছুই
খাইতে পারে না । ঘোঠান, ঐ ঘণ্টটা আমাকে আর-একটু দিতে হইবে,
বড়ো চমৎকার হইয়াছে ।”

রাজলক্ষ্মী খুশি হইয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, “আমি জানি, বিহারী
ওই ঘণ্টটা ভালোবাসে । বউমা, ওটুকুতে কী হইবে, আর-একটু বেশি
করিয়া দাও ।”

বিনোদিনী ব্রাহ্মসমাজের পাথের ধূলা মইয়া প্রণাম করিয়া করিয়া,
“আগে তুমি শাপিনীকে মাফ করো শিশিমা, তবে আমি বাইব।”

ব্রাহ্মসমাজী। মাফ করিয়াছি বাছা, মাফ করিয়াছি, আমার পক্ষ
কাহারও উপর আর রাগ নাই।

বিনোদিনীর ডান হাত ধরিয়া তিনি কহিলেন, “বউ, তোমা হইতে
কাহারও দম্ব না হউক, তুমিও ভাগ্যে থাকো।”

বিনোদিনী। তোমার আকীর্ষণ মিথ্যা হইবে না শিশিমা, আমি
তোমার পা ছুঁইয়া বলিতেছি আমি হইতে এ সংসারের দম্ব হইবে না।

অরপূর্ণাকে বিনোদিনী ক্রমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিয়া থাকিতে গেল।
পাইয়া আসিলে পর ব্রাহ্মসমাজী তাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন, “বউ, এখন
তুমি তবে চলিলে?”

বিনোদিনী। শিশিমা, আমি তোমার সেবা করিব। ঈশ্বর মাফো,
আমা হইতে তুমি কোনো অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া না।

ব্রাহ্মসমাজী বিদ্যারীর ঘুঘের দিকে চাহিলেন। বিদ্যারী একটু চিন্তা
করিয়া কহিল, “বোণান পাবুন না, তাহা হইতে ক্ষতি হইবে না।”

ব্রাহ্ম বিদ্যারী বিনোদিনী এবং অরপূর্ণা বিন তিন জনে মিথিয়া ব্রাহ্মসমাজীর
শ্রদ্ধা করিলেন।

এ দিকে আশা সমস্ত ব্রাহ্ম ব্রাহ্মসমাজীর দরে আসে নাই বলিয়া পক্ষের
অসাম্য প্রত্যয়ে উত্তিগ্ন। অরপূর্ণাকে বিদ্যারীর শ্রম অস্বাভাব্য করিয়া
তাহারাই দূর হইয়া কাপড় ছাড়িয়া প্রস্থান হইয়া আসিল। তখনও
অরপূর্ণার একেবারে ধার নাই। ব্রাহ্মসমাজীর ধারের কাছে আশিয়া ধাম
দেখিল তাহাদের আশা অবাক হইয়া গেল। ভাবিল, “একি ঘটনা।”

বিনোদিনী একটি স্পিউট-ল্যান্স, মাগিয়া অল সময় করিতেছে।
বিদ্যারী ধারে ঘুমটোরে পার নাই, তাহা হইতে যত্ন চা টেবিল হইবে।

আশা হইতে দেখিয়া বিনোদিনী উত্তিগ্ন হইয়া কহিল, “আমি আমি

আমার সমস্ত অপরাধ লইয়া তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম—আর কেহ আমাকে দূর করিতে পারিবে না—কিন্তু তুমি যদি বল ‘যাও’ তো আমাকে এখনই যাইতে হইবে।”

আশা কোনো উত্তর করিতে পারিল না—তাহার মন কী বলিতেছে তাও সে যেন ভালো করিয়া বুঝিতে পারিল না, অভিভূত হইয়া রহিল।

বিনোদিনী কহিল, “আমাকে কোনোদিন তুমি মাপ করিতে পারিবে না—সে চেষ্টাও করিও না। কিন্তু আমাকে আর ভয় করিও না। যে কয়দিন পিসিমাঝ দরকাব হইবে সেই ক’টা দিন আমাকে একটুখানি কাজ করিতে দাও, তার পরে আমি চলিয়া যাইব।”

কাল রাজসম্মতী যখন আশার হাত লইয়া মহেন্দ্রের হাতে দিলেন, তখন আশা তাহার মন হইতে সমস্ত অভিমান মুছিয়া ফেলিয়া সম্পূর্ণ ভাবে মহেন্দ্রের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। আজ বিনোদিনীকে সম্মুখে দেখিয়া তাহার পণ্ডিত প্রেমের দাহ আর শান্তি মানিল না। ইহাকে মহেন্দ্র একদিন ভালোবাসিয়াছিল, ইহাকে এখনও হয়তো মনে মনে ভালোবাসে—এ কথা তাহার বুকের ভিতরে ঢেউয়ের মতো ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পবেই মহেন্দ্র জাগিয়া উঠিবে, বিনোদিনীকে দেখিবে—কী জানি কী চক্ষে দেখিবে! কাল রায়ে আশা তাহার সমস্ত সংসারকে নিবন্ধক দেখিয়াছিল—আজ প্রত্যয়ে উঠিয়াই দেখিল, কাঁটাগাছ তাহার ঘরের প্রান্তরেই। সংসারে যথেষ্ট স্থানট সম্বন্ধে সংকীর্ণ, কোথাও তাহাকে সম্পূর্ণ নির্ভয়ে রাখিবার অবকাশ নাই।

ফলস্বরূপ তাহা লইয়া আশা রাজসম্মতীর ঘরে প্রবেশ করিল এবং অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে কহিল, “নাসিমা, তুমি সমস্ত রাত বসিয়া আছ—যাও, উঠে যাও!” অল্পপূর্ণা আশার মুখের দিকে একবার ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। তাহার পরে উঠিতে না গিয়া আশাকে

নিজের ঘরে গিয়ে গেলেন। কহিলেন, “চুনি, যদি হুই হুইতে চাস, তবে সব কথা মনে রাখিস নে। অহকে দেখি করিছা যেটুকু হুখ, হোস মনে রাখিবাব হুখ তাহার চেয়ে ডের বেশি।”

আশা কহিল, “মাগিমা, আমি মনে কিছু পুছিয়া রাখিতে চাই না, আমি হুগিতেই চাই, কিন্তু হুগিতে দেখ না যে।”

অহপূর্ণা। বাছা, তুই ঠিক বলিয়াছিস—উপলক্ষ দেওয়া সহজ, উপায় বলিয়া দেওয়াই শক। তবু আমি তোকে একটা উপায় বলিয়া দিতেছি। যেন কুনিয়াছিস এই ভাবটি অহত বাহিরে প্রাণপণে রক্ষা করিতে হইলে—আগে বাহিরে হুগিতে আরম্ভ করিস, তাহা হইলে ভিতরেও হুগিমি। এ কথা মনে রাখিস চুনি, তুই যদি না হুগিস তবে অহকেও শরণ কড়াইচা রাখিবি। তুই নিজের ইচ্ছায় না পারিস, আমি তোকে আত্মা করিতেছি, তুই বিনোদিনীর সঙ্গে এমন ব্যবহার কর, যেন সে কখনও তোমার কোনো অনিষ্ট করে নাই এবং তাহার দ্বারা তোমার অনিষ্টের কোনো আশঙ্কা নাই।

আশা নহমুগে কহিল, “কী করিতে হইবে, মলো।”

অহপূর্ণা কহিলেন, “বিনোদিনী এখন বিদ্যাদীর গৃহে চা টাইবি করিতেছে। তুই হুখ-চিনি-সেয়াসা সমস্ত গাইচা যা—তইবনে মিলিয়া কাজ কর।”

আশা আশ্চর্যপাণনের দণ্ড উঠিল। অহপূর্ণা কহিলেন, “এটা সহজ—নিজ আমার আর-একটি কথা আছে, সেটা আরও সহজ—সেটো তোকে পালন করিতেই হইবে। নাক-নাফে মনোহের সঙ্গে বিনোদিনীর দেখা হইবেই, তখন তোমার মনে কী হইবে তাহা আমি আমি—সে মনে তুই গোপন কটাক্ষেও মনোহের দ্বারা কিংবা বিনোদিনীর দ্বারা সেবিবার চেয়ানাহন করিস নে। তুই জাটমা দেলেও তোকে অকিঞ্চিৎ থাকিতে হইবে। মনোহর ইচ্ছা আনিবে যে, তুই সহজ করিস না, শোভ

করিস না, তোর মনে ভয় নাই, চিন্তা নাই—জোড় ভাঙিবার পূর্বে যেমন ছিল ঝোড় লাগিয়া আবার ঠিক তেননিই হইয়াছে—ভাঙনের দাগটুকু দিলাইয়া গেছে। মহেন্দ্র কি আর-কেহ তোর মুখ দেখিয়া নিঃশব্দে অপরাণী বলিয়া মনে করিবে না। চুনি, ইহা আমার সহযোগ বা উপদেশ নহে, ইহা তোর মাসিমার আদেশ। আমি যখন কাণী চলিয়া যাইব, আমার এই কথাটি এক দিনের জন্তও ভুলিস নে।”

আশা চায়ে পেরালা প্রভৃতি লইয়া বিনোদিনীর কাছে উপস্থিত হইল। কহিল, “জল কি গরম হইয়াছে? আমি চায়ে দুধ আনিয়াছি।”

বিনোদিনী আশ্চর্য হইয়া আশার মুখের দিকে চাহিল। কহিল, “বিহারীঠাকুরপো বাগান্দার বলিয়া আছেন, চা তুমি তাহার কাছে পাঠাইয়া দাও, আমি ততক্ষণ পিসিমার জন্য মুখ ধুইবার বন্দোবস্ত করিয়া রাখি। তিনি বোধ হয় এখনই উঠিবেন।”

বিনোদিনী চা লইয়া বিহারীর কাছে গেল না। বিহারী ভালোবাসা স্বীকার করিয়া তাহাকে যে অধিকার দিয়াছে, সেই অধিকার স্বৈচ্ছামতে পাঠাইতে তাহার সংকোচ বোধ হইতে লাগিল। অধিকারভাঙের যে মর্দাদা আছে সেই মর্দাদা রক্ষা করিতে হইলে অধিকারপ্রয়োগকে সংযত করিতে হয়। বতটা পাওয়া যায় ততটা লইয়া টানাটানি করা কাঙালকেই গোভা পায়—ভোগকে পর্ব করিলেই সম্পদের স্বার্থ গোয়ন। এখন বিহারী তাহাকে নিজে না ভাবিলে, কোনো-একটা উপলক্ষ্য করিয়া বিনোদিনী তাহার কাছে আর যাইতে পারেন না।

বলিতে-বলিতেই মহেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। আশার দৃকের চিতরুটা যদিও ধড়াস করিয়া উঠিল, তবু সে আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া বাতাবিক স্বরে মহেন্দ্রকে কহিল, “তুমি এত ভোরে উঠিলে যে? পাছে আলো লাগিয়া তোনার ঘুম ভাঙে, তাই আমি ঢানকা-ধরুতা ধব বদ করিয়া আসিয়াছি।”

বিনোদিনীর সম্মুখেই আশাকে এইরূপ সহজ ভাবে কথা কহিতে
 তিনিও মহেশ্বরের দৃকের একটা পাখর যেন নানিয়া গেল। সে আনন্দি-
 চিত্তে কহিল, “না তেমন আছেন তাই লেখিতে আসিয়াছি—না কি
 এখনও ঘুমাইতেছেন।”

আশা কহিল, “হাঁ, তিনি ঘুমাইতেছেন, এখন ঘুমি যাউনো না।
 দিবাগীঠাধরপো গিয়াছেন, তিনি আত্ম অনেকটা ভালো আছেন।
 অনেক দিন পরে কাল তিনি শব্দ হাত ভালো করিয়া ঘুমাইয়াছেন।”

মহেশ্ব নিশ্চিন্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কাকীনা কোথায়।”

আশা তাঁহার দর দেখাইয়া দিল।

আশার এই দৃষ্টি ও সংকম দেখিয়া বিনোদিনীও আশঙ্ক হইয়া
 গেল।

মহেশ্ব প্রাণিল, “কাকীনা।”

অতঃপর্য্যাপ্তিও ভোরে শ্রান করিয়া গইয়া এখন পূনার বসিনে শ্রিত
 করিয়াছিলেন, তবুও তিনি কহিলেন, “মায় মদিন, আয়।”

মহেশ্ব তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, “কাকীনা, আমি শাসিত,
 তোমাদের কাছে আসিতে আমার লক্ষ্য করে।”

অতঃপর্য্যাপ্তিও কহিলেন, “ছি ছি, এ কথা বলি যে মদিন—হেলে দুলা
 লটয়াও দার কোলে আসিয়া যবে।”

মহেশ্ব। কিও আমার এ দুলা কিছুতেই হুহিবে না কাকীনা।

অতঃপর্য্যাপ্তি। হুই-একবার কাহিলেট করিয়া যাউবে। মদিন, ভালোই
 হইয়াছে। নিমেষে ভালো বলিয়া হোর অহংকার ছিল, নিমেষে পরে
 নিবাস হোর বহুই দেখি ছিল, শাসিতের কাছে হোর সেই গহকুট্টে তাহা
 নিষাচে, আর কোনো অন্তি করে নাট।

মহেশ্ব। কাকীনা, এবার তোমাকে আর ছাড়াই দি না, ঘুমি
 নিয়াই আমার এই দুর্গতি হইয়াছে।

অন্নপূর্ণা । আমি থাকিয়া যে দুর্গতি ঠেকাইয়া রাখিতাম সে দুর্গতি একবার ঘটিয়া যাওয়াই ভালো । এখন আব তোম আমাকে কোনো দরকার হইবে না ।

দরজার কাছে আবার ডাক পড়িল, “কাকীমা, আহ্নিকে বসিয়াছ নাকি ।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “না, তুই আয় ।”

বিহারী ঘরে প্রবেশ করিল । এত সকালে মহেন্দ্রকে জাগ্রত দেখিয়া কহিল, “নহিনদা, আজ তোমার জীবনে এই বোধ হয় প্রথম সূর্যোদয় দেখিলে ।”

মহেন্দ্র কহিল, “হা বিহারী, আজ আমার জীবনে প্রথম সূর্যোদয় । বিহারীর বোধ হয় কাকীমার সঙ্গে কোনো পরামর্শ আছে—আমি যাই ।”

বিহারী হাসিয়া কহিল, “তোমাকেও নাহয় ক্যাবিনেটের মিনিষ্টার করিয়া লওয়া গেল । তোমার কাছে আমি তো কখনও কিছু গোপন করি নাই—যদি আপত্তি না কর, আমলও গোপন করিব না ।”

মহেন্দ্র । আমি আপত্তি করিব ! তবে আর দাবি করিতে পারি না বটে । তুমি যদি আমার কাছে কিছু গোপন না কর, তবে আমিও আমার প্রতি আবার শ্রদ্ধা করিতে পারিব ।

আজকাল মহেন্দ্রের সম্মুখে সকল কথা অসংকোচে বলা কঠিন । বিহারীর নুপে রাখিয়া আসিল, তবু সে জোর করিয়া বলিল, “বিনোদিনীকে বিবাহ করিব এমন একটা কথা উঠিয়াছিল, কাকীমার সঙ্গে সেই সম্বন্ধে আমি কথাসার্তা শেষ করিতে আসিয়াছি ।”

মহেন্দ্র একান্ত সংকুচিত হইয়া উঠিল । অন্নপূর্ণা চকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “এ আবার কী কথা বিহারী ।”

মহেন্দ্র প্রবল শক্তি প্রয়োগ করিয়া সংকোচ দূর করিল । কহিল, “বিহারি, এ বিবাহের কোনো প্রয়োজন নাই ।”

অম্পূর্ণা কহিলেন, “এ বিবাহের প্রভাবে কি বিনোদিনীর কোনো
যোগ আছে।”

বিহারী কহিল, “কিছুনাও না।”

অম্পূর্ণা কহিলেন, “সে কি ইহাতে রাতি হইবে।”

মহেন্দ্র বলিয়া উঠিল, “বিনোদিনী কেন রাতি হইবে না কাতীনা।
আমি জানি, সে একদম বিহারীকে ভক্তি করে—এমন আশ্রয় সে কি
ইচ্ছা করিয়া ছাড়িয়া দিতে পারে।”

বিহারী কহিল, “নহিনবা, আমি বিনোদিনীকে বিবাহের প্রণয়
করিয়াছি—সে মজার সঙ্গে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।”

অনিয়া মহেন্দ্র চূপ করিয়া রহিল।

৪৪

ভানোর-মল্লর দুই-তিন দিন রায়লক্ষীর কাতিয়া গেল। একদিন রাতে
ঔদার নৃপ বেশ প্রসন্ন ও যেননা মনস্ত্রান্ত হইল। সেই দিন তিনি
মহেন্দ্রকে ডাকিয়া কহিলেন, “আর আমার বেশিগণ মনঃ মাটে—কিঞ্চ
আমি বড়ো হুশে রহিলাম নহিন, আমার কোনো দুঃখ নাই। দুই বৎসর
ছোটো ছিনি ওখম তোকে লইয়া আমার সে আনন্দ ছিল, যাত্র সেই
আনন্দে আমার বুক ভরিয়া উঠিয়াছে—তুই আমার কোলের চেয়ে,
আমার দুকের ধন—তোমার মনঃ মাটা লইয়া আমি চলিয়া বাইরেছি,
এই আমার বড়ো হুশ।”

বলিয়া রায়লক্ষী মহেন্দ্রের নৃপে গাত্র হাত বুলাইতে লাগিলেন।
মহেন্দ্রের বোন্দন বাধা না মানিয়া উদ্গুদিত হুঁতে লাগিল।

রায়লক্ষী কহিলেন, “কিঞ্চিৎ নে নহিন। লক্ষী বরং রহিল।
বউমাঝে আমার সাধটা গিল। সমুদ্রই আমি গুছাইয়া রাখিয়াছি,
তোমার পরস্পার ভিনিমের কোনো অঁটার হইতে না। আর-একটি কথা

আমি বলি মহিন, আমার মৃত্যুর পূর্বে কাহাকেও জানাস নে—আমার
বাক্সে দু-হাজার টাকাব নোট আছে, তাহা আমি বিনোদিনীকে দিলাম।
সে বিধবা, একাকিনী, ইহার সুখ হইতে তাহার বেশ চলিয়া যাইবে—
কিন্তু মহিন, তাহাকে তোদের সংসারের ভিতরে রাখিস্ নে, তোর প্রতি
আমার এই অমরোধ বহিল।”

বিহারীকে ডাকিয়া রামলক্ষ্মী কহিলেন, “বাবা বিহারি, কাল মহিন
নলিতেছিল, তুই গরিব ভদ্রলোকদেব চিকিৎসার জন্য একটি বাগান
করিয়াছিস—ভগবান তোকে দীর্ঘজীবী করিয়া গরিবের হিত করুন।
আমার বিবাহের সময় আমার খন্তর আনাকে একখানি গ্রাম বোতুক
করিয়াছিলেন, সেই গ্রামখানি আমি তোকে দিলাম, তোর গরিবদের
বাক্সে লাগান, তাহাতে আমার খন্তবের পুণ্য হইবে।”

৫৫

রামলক্ষ্মীর মৃত্যু হইলে পর শ্রাক্ষশেবে মহেন্দ্র কহিল, “ভাই বিহারি,
আমি ডাকারি জানি, তুমি যে কাজ আরম্ভ করিয়াছ আমাকেও তাহার
মধ্যে নাও। চুনি যেহেতু গৃহিণী হইয়াছে সেও তোমার অনেক সহায়তা
করিতে পারিবে। আমরা সকলে সেইখানেই থাকিব।”

বিহারী কহিল, “মহিনদা, ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখো—এ কাজ
কি করার তোমার ভালো লাগিবে। বৈরাগ্যের কনিক উচ্ছ্বাসের মুখে
একটা স্থায়ী ভার গ্রহণ করিয়া বসিগো না।”

মহেন্দ্র কহিল, “বিহারী, তুমিও ভাবিয়া দেখো, যে জীবন আমি
গঠন করিয়াছি তাহাকে লইয়া আনন্দভরে আর উপভোগ করিবার জো
নাই—কর্মের দ্বারা তাহাকে যদি টানিয়া লইয়া না চলি, তবে কোন্ দিন
সে আমাকে টানিয়া অবসাদের মধ্যে ফেলিবে। তোমার কর্মের মধ্যে
আমাকে স্থান দিতেই হইবে।”

সেই কথাই খির হইয়া গেল।

অম্বপূর্ণা ও বিদ্যারী বসিয়া শান্ত বিমোচনের সহিত সেখানেই কথা
আলোচনা করিতেছিলেন। তাঁহাদের পরস্পরের বিলাসের সময় কাছে
আসিয়াছে। বিনোদিনী ঘাতের কাছে আসিয়া কহিল, “কাকীনা, আমি
কি এখানে একটু বসিতে পারি।”

অম্বপূর্ণা কহিলেন, “এসো, এসো বাচা, বোসো।”

বিনোদিনী আসিয়া বসিলে তাহার সহিত দুই-চারিটা কথা কহিয়া
বিদ্যারী দুমিয়ার উপলক্ষ্য করিয়া অম্বপূর্ণা বাগানদ্বার গেলেন।

বিনোদিনী বিদ্যারীকে কহিল, “এখন আমার প্রতি তোমার বাহা
আদেশ, তাহা হলো।”

বিদ্যারী কহিল, “মোঠান, তুমিই হলো, তুমি কী করিতে চাও।”

বিনোদিনী কহিল, “ভনিগান, গবিরদের চিকিৎসার অল্প পণ্ডার
ধারে তুমি একখানি বাগান লটাইছ—আমি সেখানে তোমার কোনো
একটা কাজ করিব। কিছু না হই হো আমি প্রাণিয়া দিতে পারি।”

বিদ্যারী কহিল, “মোঠান, আমি অনেক চাইয়াছি। নামান হাণ্ডানে
আমাদের ভীষনের মাঝে অনেক ভট পড়িয়া গেছে। এখন নিকট বসিয়া
বসিয়া তাহারই একটি একটি এরি নোচন করিবার চিন আসিয়াছে।
পূর্বে সময় পরিহার করিয়া লইতে হইবে। এখন সময় যাহা চাও
তাৎক্ষণিক আর প্রস্তর নিতে পারেন হই না। এ পর্যন্ত যাহা কিছু চাইয়াছে,
যাহা কিছু শ্রম করিয়াছি, তাহার সময় আদর্শ, সময় আদর্শান শ্রম
করিতে না পারিলে ভীষনের সমাপ্তির অল্প প্রস্তর হইতে পারিব না।
যদি সময় অসীমকাল অতীত হইত তবে কসমের একমাত্র হোম
যাহাই আমার ভীষন সম্পূর্ণ হইতে পারিত—এখন হোম হইতে
আমাকে দূরিত হইতেই হইবে। এখন আর যত্নের অল্প ত্রুটি হইবে,
এখন কেবল আমার আমার সময় চাওঁর শ্রমিয়া লটাই হইবে।”

এই সময় অন্নপূর্ণা ঘরে চুকিতেই বিনোদিনী কহিল, “মা, আমাকে তোমার পায়ে স্থান দিতে হইবে। পাগিষ্ঠা বলিয়া আমাকে তুমি ঠেলিয়া না।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “মা, চলো, আমার সঙ্গেই চলো।”

অন্নপূর্ণা ও বিনোদিনীর কান্দিতে বাইবার দিন কোনো সুযোগে বিহারী নিরলে বিনোদিনীর সহিত দেখা করিল। কহিল, “বোঠান, তোমার একটা-কিছু চিহ্ন আমি কাছে রাখিতে চাই।”

বিনোদিনী কহিল, “আমার এমন কী আছে যাহা চিহ্নের মতো কাছে রাখিতে পার ?”

বিহারী লজ্জা ও সংকোচের সহিত কহিল, “ইংরাজের একটা প্রথা আছে, প্রিয়তমের এক গুচ্ছ চুল স্মরণের লক্ষ রাখিয়া দেয়—যদি তুমি—”

বিনোদিনী। ছি ছি, কী ঘৃণা ! আমার চুল লইয়া কী করিবে ! সেট অশুচি মৃতবস্ত্র আমার এমন কিছুই নহে যাহা আমি তোমাকে দিতে পারি। আমি হতভাগিনী তোমার কাছে থাকিতে পারিব না—আমি এমন একটা-কিছু দিতে চাই যাহা আমার হইয়া তোমার কাছ করিবে—বলো, তুমি লইবে ?

বিহারী কহিল, “লইব।”

তখন বিনোদিনী তাহার অবলের শ্রান্ত পুলিশ হাব্বার টাকার হইপানি নোট বিহারীর হাতে দিল।

বিহারী হৃগভীর আবেগের সহিত বিব্রলুপ্তিতে বিনোদিনীর দুপের নিকে চাটিয়া রহিল। থানিক দানে বিহারী কহিল, “আমি কি তোমাকে কিছু দিতে পারিব না ?”

বিনোদিনী কহিল, “তোমার চিহ্ন আমার কাছে আছে, তাহা আমার সঙ্গের ভূষণ—তাহা কেহ কাড়িতে পারিবে না। আমার আর কিছু স্মারক নাই।” বলিয়া সে নিজের হাতের সেট কাটা লগ দেখাইল।

বিহারী আশ্রয় হইয়া রহিল। বিনোদিনী অছিল, “তুমি যান না—
এ হোমারই আশ্রয়—এক এ আশ্রয় হোমারই উপযুক্ত। ইহা এমন
তুমিও জিজ্ঞাসিত পার না।”

মাসিনার উপলক্ষসময়েও আশা বিনোদিনী মধ্যস্থ মনকে নিকট
করিতে পারে নাই। বাহনগতীর সেবার দূই মনে একত্রে কাম করিয়াছে,
কিন্তু আশা এখনই বিনোদিনীকে সেদিক্‌তে তখনই তাহার কুণ্ডল মথো
বাধা লাগিয়াছে—মুখ দিয়া মস্তক বগা বাতির হয় নাই, এবং মাসিনার
চেঁটা তাহাকে গীড়ন করিয়াছে। বিনোদিনীর নিকট হইতে সামান্য
কোনো সেবা গ্রহণ করিতেও তাহার সমর্থ চিত্ত বিমূঢ় হইয়াছে।
বিনোদিনীর সাত্মা পান অনেক সময়ে দিষ্টতার খাতির তাহাকে গ্রহণ
করিতে হইয়াছে, কিন্তু আশায়ে তাহা যেমিয়া দিয়াছে। কিন্তু আশা
বখন বিদায়কাল উপস্থিত হইল, মাসিনা সংসার হইতে দ্বিষ্টীয় পর
চলিয়া যাইতেছেন বলিয়া আশার চক্ষু বন্ধ অন্ধভাবে আঁঠু চইয়া গেল,
তখন সেই সময়ে বিনোদিনীর প্রতি তাহার ককণাও উন্মূঢ় হইল। যে
একবারে চলিয়া যাইতেছে তাহাকে মাপ করিতে পারে না, এমন গভীর
মন অন্নই আছে। আশা বান্ধিত, বিনোদিনী মবেশকে ভালোবাসে,
মবেশকে ভালো না বাসিবেই বা কেন? মবেশকে ভালোবাসা যে কিরণ
অনিবার, আশা তাহার নিমেষ মস্তক চিত্ত হইতেই অগ্নে। নিমেষ
ভালোবাসার সেই যেমন্য বিনোদিনীর প্রতি আশা তাহার মস্তা হইয়া
হইল। বিনোদিনী মবেশকে চিত্তশিল্পের অল্প ছাতিয়া যাইতেছে, তাহার
যে দুবিধ চক্ষ তাহা আশা অতিবিস্তার পক্ষ মস্তক ভালো করিতে
পারে না—মন করিয়া তাহার চক্ষ অন্ধ আছিল, এক কালে যে
বিনোদিনীকে ভালোবাসিয়াছিল, সেই ভালোবাসা তাহাকে অন্ধ করিল।
সে দীর্ঘ শীতের বিনোদিনীর কাছে আসিয়া আশাও ককণাও মস্ত, যেমন
মস্ত, বিদায়ের মস্ত দুই বদে করিল, “নিতি, তুমি চলিলে?”

বিনোদিনী আশার চিবুক ধরিয়া কহিল, “হাঁ বোন, আমার যাইবার সময় আসিয়াছে। এক সময় তুমি আমাকে ভালোবাসিয়াছিলে—এখন যুগের দিনে সেই ভালোবাসার একটুখানি আমার জন্যে বাখিয়ো ভাই, আর-সব তুলিয়া য়েয়ো।”

মহেন্দ্র আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, “বোঠান, মাপ করিয়ো।”

তাহার চোখেব প্রাস্তে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

বিনোদিনী কহিল, “তুমিও মাপ করিয়ো ঠাকুরপো, ভগবান তোমাদের চিরজুখী করুন।”
